



MATRICULATION BENGALI SELECTIONS

080C.U.

369/4

UNIVERSITY OF CALCUTTA

1948

Rs. 2/8/-



MATRICULATION BENGALI SELECTIONS

Matriculation Bengali
Selections

BCU
2132
ed. 8

(Reprint)



080C.u
369/4

UNIVERSITY OF CALCUTTA
1948



1st Edition, 1924—O
Reprint, 1925—Y
2nd Edition, 1925—T
Reprint, 1927—J
3rd Edition, 1928—F
Reprint, 1928—R
„ 1929—T
„ 1930—T
„ 1932—E
„ 1933—O
4th Edition, 1934—Y
Reprint, 1934—Y
„ 1935—Y

4th Edn., Enlarged Reprint, 1936—Ish
5th Edition, 1937—T
Reprint, 1938—Y
„ 1938—T
„ 1939—ZD
Adapted „ 1941—Goa
6th Edition, 1941—ZJ
Reprint, 1941—T
„ 1942—ZF
7th Edition, 1943—ZF
8th Edition, 1944—ZD
Reprint, 1945—ZD
„ 1947—ZD

BCU 2132

147066

PRINTED IN INDIA
PRINTED AND PUBLISHED BY NISHITCHANDRA SEN,
SUPERINTENDENT (OFFG.), CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA

1658 B.T.—January, 1948—M.

সূচীপত্র

[* ভারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত]

গত্যাংশ

রচয়িতা ও বিষয়	যে পুস্তক হইতে গৃহীত	পত্রাঙ্ক
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর		
হিমালয় ব্রহ্মণ	আত্ম-জীবনচরিত	১
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর		
শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা	শকুন্তলা	৫
অক্ষয়কুমার দত্ত		
স্বপ্নদর্শন-বিদ্যাবিষয়ক	চাক্রপাঠ, ৩য় ভাগ	৯
মঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		
পালানমৌ	পালানমৌ	১৬
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		
বাঙ্গালা ভাষা	বঙ্গদর্শন পত্রিকা	২৪
গাওর-সঙ্গমে নবকুমার	কপালকুণ্ডলা	২৮
শিবনাথ শাস্ত্রী		
* বঙ্কিমচন্দ্র	রামতনু নাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ	৩৪
রমেশচন্দ্র দত্ত		
* দিল্লীনগরী	মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত	৩৭

১০

সূচীপত্র—গদ্যাংশ

রচয়িতা ও বিষয়	যে পুস্তক হইতে গৃহীত	পত্রাঙ্ক
যোগীন্দ্রনাথ বসু		
*মধুসূদনের বাল্যকাল	মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত	৪০
অশ্বিনীকুমার দত্ত		
*লোকভর	ভক্তিবোগ	৪৭
অগদীশচন্দ্র বসু		
*ভাগীরথীর উৎস-গহ্বানে	অব্যক্ত	৫১
বিপিনচন্দ্র পাল		
*স্মার আত্মতোষ	বঙ্গবাণী পত্রিকা	৫৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		
*ধোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন	গল্পগুচ্ছ, ১ম খণ্ড	৬০
স্বামী বিবেকানন্দ		
*স্বপ্নেজ খালে	পরিব্রাজক	৬৯
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ		
*প্রতাপাদিত্য	প্রতাপ-আদিত্য	৭২
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী		
*নিয়মের রাজত্ব	জিজ্ঞাসা	৮০
ঐচ্ছিকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়		
*বাকালীর বিশিষ্টতা	সাহিত্য পত্রিকা	৮৫
প্রমথ চৌধুরী		
*মহাশক্তি	ছোটদের বাদিকী	৮৮



যুটীপত্র—গদ্যাংশ

1/0

রচয়িতা ও বিষয়

যে পত্রক হইতে গৃহীত

পত্রাঙ্ক

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

*জন্মভূমি

প্রহাবলী

৯৩

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

*মাটির মহাশয়

নবকথা

৯৬

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

*সমুদ্রবক্ষে সাইক্লোন

শ্রীকান্ত, ২য় পর্ব

১০৫

*মেজদিদি

মেজদিদি

১১১

কাজি ইমদাদুল হক

*আল্‌হান্‌রা

প্রবন্ধমালা, ১ম ভাগ

১২৩

অনুরূপা দেবী

*দেশের সেবা

পঞ্চহারা

১২৮

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

*পাঘানের কথা

পাঘানের কথা

১৩২

এস. ওয়াজেদ আলি

*ভারতবর্ষ

মাতৃকের দরবার

১৪৩

শেখ হবিবুর রহমান

*স্বপ্নরবনে

স্বপ্নরবনে ভ্রমণ

১৪৬

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

*অপর পাঠশালা

পথের পাঁচালী

১৫১

পদ্মাংশ

রচয়িতা ও বিষয়	যে পুস্তক হইতে গৃহীত	পত্রাঙ্ক
যাদবেন্দ্র		
মাতৃস্নেহ	পদাবলী	১৫৯
কাশীরাম দাস		
গুরুভক্তি	মহাতারত	১৬০
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী		
কালকেতু	চণ্ডী-মঙ্গল	১৬২
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত		
মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা	প্রসঙ্গাবলী	১৬৪
মাইকেল মধুসূদন দত্ত		
মেঘনাদ ও বিভীষণ	মেঘনাদ-বধ কাব্য	১৬৬
রজনাল বন্দ্যোপাধ্যায়		
দেশপ্রেম	পদ্মিনীর উপাখ্যান	১৬৯
বিহারীলাল চক্রবর্তী		
বাল্মীকির কবিত্বলাভ	সারদা-মঙ্গল	১৭০
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		
পরশমণি	কবিতাবলী	১৭২
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর		
যক্ষের আলয়	বেশদূত	১৭৫
গিরিশচন্দ্র ঘোষ		
*লক্ষ্যণ-বর্জন	লক্ষ্যণ-বর্জন	১৭৬



বুচীপত্র—পদ্যাংশ

১৮০

রচয়িতা ও বিষয়

যে পুস্তক হইতে গৃহীত

পত্রাঙ্ক

নবীনচন্দ্র সেন

*বীরের শোক

কুরুক্ষেত্র

১৮১

রাজকৃষ্ণ রায়

*বর্ষা

বাল্মীকি রামায়ণের পদ্যানুবাদ—কিকিছ্যা কাণ্ড ১৮৪

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

*শেষ

পুষ্পাঞ্জলি

১৮৭

গোবিন্দচন্দ্র দাস

ধৈর্য্য ধর

বৈজয়ন্তী

১৮৮

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

*মা ও ছেলে

প্রসাবলী

১৯০

নবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

*পূজারিনী

কথা ও কাহিনী

১৯২

*দুর্ভাগা দেশ

গীতাঞ্জলি

১৯৬

*ভারত-তীর্থ

গীতাঞ্জলি

১৯৭

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

*হিমাচলে

যজ্ঞভঙ্গ্য

১৯৯

রজনীকান্ত সেন

*মা

বানী

২০০

অক্ষয়কুমার বড়াল

*জীবন-সোপান

এষা

২০২

কামিনী রায়

*আশার স্বপন

আনো ও ছায়া

২০৩



রচয়িতা ও বিষয়	যে পুস্তক হইতে গৃহীত	• পত্রাঙ্ক
মানকুমারী বসু *সাধক	কাব্যক্সুমাঙ্কলি	২০৪
প্রিয়ংবদা দেবী *কাল-বৈশাখী	রেণু	২০৭
মতোজনাথ দত্ত *আবরা	কাব্য-সঙ্কলন	২০৭
কালিদাস রায় *ছাত্রধারা	হৈমন্তী	২০৯
হুমায়ূন কবীর *আকবর	স্বপ্ন-সাধ	২১২

ঐবেশিকার বাজালা পাঠ্য

[সংকলন]

সাদ্যাহ

হিমালয়-ভ্রমণ

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কলিকাতা জোড়ালীকোর পুণ্ডিত “ ঠাকুর ” পরিবারে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর বিনাতে গিয়া রাজস্বত্বান লাভ করিয়াছিলেন। প্রভূত ধনসম্পদের মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াও অরবয়সে দেবেন্দ্রনাথের মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। অল্প বয়স হইতেই দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়েব পুত্বে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি-সাধনে বদ্ধপরিকর হন। ইহার ত্যাগ ও ধর্মবিশ্বাস অসাধারণ ছিল, তৎস্বপ্ন ইহার অনুরাগী ব্রাহ্মগণ ইহাকে ‘ মহামি ’ আখ্যা পুদান করেন। ইহার রচিত ‘ ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান,’ ‘ ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস,’ ‘ উপদেশাবলী,’ ‘ জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি,’ ‘ পরলোক ও মুক্তি,’ ‘ আত্মজীবনী,’ ‘ বিবিধ ব্রাহ্ম-সঙ্গীত ’ প্রভৃতি পুস্তক সুপরিচিত। ইহার পুস্তকগণ সকলেই কৃতী ছিলেন, তন্মধ্যে বিশুকবি রবীন্দ্রনাথের নাম জগতের সর্বত্র বিদিত। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ জানুয়ারী মহামি দেবেন্দ্রনাথ স্বর্গারোহণ করেন।]

আমি শিমলাতে ফিরিয়া কিশোরীনাথ চাটুজোকে বলিলাম, “ আমি সপ্তাহের মধ্যে আরো উত্তর দিকে উচ্চ উচ্চ পর্বত ভ্রমণে যাইব। আমার সঙ্গে তোমাকে যাইতে হইবে। আমার জন্য একটা ঝাঁপান ও তোমার জন্য একটা খোড়া ঠিক করিয়া রাখ। ” “ যে আজ্ঞা ” বলিয়া তাহার উদ্ঘোষে

সে চলিল। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ শিমলা হইতে যাত্রা করিবার দিন স্থির ছিল। আমি সে দিবস অতি প্রচুনে উঠিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার ঝাঁপান আগিয়া উপস্থিত, বাঙ্গী-বন্দারেরা সব হাজির। আমি কিশোরীকে বলিলাম, “তোমার ঘোড়া কোথায়?” “এই এলো ব’লে, এই এলো ব’লে” বলিয়া সে ব্যস্ত হইয়া পথের দিকে তাকাইতে লাগিল। এক ঘণ্টা চলিয়া গেল, তবু তাহার ঘোড়ার কোন খবর নাই। আমার যাইবার এই বাধা ও বিলম্ব সহ্য হইল না। আমি বুঝিলাম যে, অধিক নীতের ভয়ে আরো উত্তরে কিশোরী আমার সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছুক। আমি তাহাকে বলিলাম, “তুমি মনে করিতেছ যে, তুমি আমার সঙ্গে না গেলে আমি একাকী ভ্রমণে যাইতে পারিব না। আমি তোমাকে চাই না, তুমি এখানে থাক। তোমার নিকট পের্টের ও বাস্তব যে সকল চাবি আছে, তাহা আমাকে দাও।” আমি তাহার নিকট হইতে সেই সকল চাবি লইয়া ঝাঁপানে বলিলাম; বলিলাম, “ঝাঁপান উঠাও।” ঝাঁপান উঠিল; বাঙ্গী-বন্দারেরা বাঙ্গী লইয়া চলিল; হতবুদ্ধি কিশোরী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি আনন্দে ও উৎসাহে, বাস্তব দেখিতে দেখিতে শিমলা ছাড়াইলাম। দুই ঘণ্টা চলিয়া একটা পর্বতে যাইয়া দেখি, তাহার পার্শ্ব-পর্বতে যাইবার সেতু ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, আর চলিবার পথ নাই। ঝাঁপানীরা ঝাঁপান রাখিল। আমায় কি তবে এখান হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে? ঝাঁপানীরা বলিল, “যদি এই ভাঙ্গা পুলের কানিস দিয়া একা-একা চলিয়া এই পুল পার হইতে পারেন তবে আমরা খালি ঝাঁপান লইয়া খদ দিয়া ওপারে যাইয়া আপনাকে ধরিতে পারি।” আমার তখন যেমন মনের বেগ, তেমনি আমি সাহস করিয়া এই উপায়ই অবলম্বন করিলাম। কানিসের উপরে একটীমাত্র পা রাখিবার স্থান, হাতে ধরিবার কোন দিকে কোন অবলম্বন নাই, নীচে ভয়ঙ্কর গভীর খদ; ঈশ্বর-প্রসাদে আমি তাহা নিম্বিষ্টে লঙ্ঘন করিলাম। ঈশ্বর-প্রসাদে বথার্থই “পদ্মঃ লঙ্ঘয়তে গিরিন্”—আমার ভ্রমণের সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল না।

তথা হইতে ক্রমে পর্বতের উপরে উঠিতে লাগিলাম। সেই পর্বত একেবারে প্রাচীরের ন্যায় সোজা হইয়া এত উচৈ উঠিয়াছে যে, সেখান হইতে নীচের খদের কেলু-গাছকেও ক্ষুদ্র চারার মত বোধ হইতে লাগিল। নিকটেই

গ্রাম। 'সেই গ্রাম হইতে বাঘের মত কতকগুলো কুকুর ষেউ ষেউ করিয়া ছুটিয়া আসিল। সোজা খাড়া পর্বত ; নীচে বিষম খদ, উপরে কুকুরের তাড়া। ভয়ে ভয়ে এ সঙ্কটে পথটা ছাড়াইলাম। দুই প্রহরের পর, একটা শূন্য পাস্থশালা পাইয়া সে দিনের জন্য সেইখানেই অবস্থিতি করিলাম। আমার সঙ্গে রন্ধন করিবার কোন লোক নাই। ঝাঁপানীরা বলিল, "হম্বোগেঁকী রোটি বড়ী মিঠা হৈ।" আমি তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের মজা ও যব-মিশ্রিত একখানা রুটি লইয়া তাহারই একটু খাইয়া সে দিন কাটাঁইলাম। তাহাই আমার যথেষ্ট হইল।—“রুখা সুখা গহঁঁকা টুকরা, লোনা অলোনা ক্যা। সির দিয়া, তো রোনা ক্যা।” খানিক পরে কতকগুলো পাহাড়ী নিকটস্থ গ্রাম হইতে আমার নিকটে আসিল এবং নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া আমোদে নৃত্য করিতে লাগিল। ইহাদের একজনের দিকে চাহিয়া দেখি যে, তাহার নাক নাই, মুখখানা একেবারে চ্যাপটা। জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমহারে মুঁহ্মে য়হ্ ক্যা হ্যা ?” সে বলিল, “আমার মুখে একটা ভালুকে খাবা মারিয়াছিল।” আমার সম্মুখের একটা পথ দেখাইয়া বলিল, “ঐ পথে ভালুক আসিয়াছিল, তাহাকে তাড়াইতে যাওয়ায় সে খাবা মারিয়া আমার নাকটা উঠাইয়া লইয়াছে।” সে ভাঙ্গা মুখ লইয়া তাহার কতই নৃত্য, কতই তাহার আমোদ। আমি সেই পাহাড়ীদের সরল প্রকৃতি দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া, অপরাহ্ণে একটা পর্বতের চূড়ায় যাইয়া অবস্থান করিলাম। সেখানে গ্রামের অনেকগুলি লোক আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া বসিল। তাহারা বলিল, “আমাদের এখানে বড় ক্লেশে থাকিতে হয়। বরফের সময়ে এক-হাঁটু বরফ ভাঙ্গিয়া সর্বদাই চলিতে হয়। ক্ষেতের সময়ে শূকর ও ভালুক আসিয়া সব ক্ষেত নষ্ট করে। রাত্রিতে মাচার উপর থাকিয়া আমরা ক্ষেত রক্ষা করি।” সেই পর্বতের খদেই তাহাদের গ্রাম। তাহারা আমাকে বলিল, “আপনি আমাদের গ্রামে চলুন, সেখানে আমাদের বাড়ীতে সুখে থাকিতে পারিবেন, এখানে থাকিলে আপনার কষ্ট হইবে।” আমি কিন্তু সেই সন্ধ্যার সময়ে তাহাদের গ্রামে গেলাম না। সে পাক্দ্গীর পথ বড় কষ্টে উঠিতে নামিতে হয়। আমার যাইবার উৎসাহ সঙ্কেও দুর্গম পথ বলিয়া গেলাম না।

আমি সে রাত্রি সেই চুড়াতেই থাকিয়া প্রভাতে সেখান হইতে চলিয়া গেলাম। এই দিন, দুই প্রহর পর্যন্ত চলিয়া ঝাঁপানীরা ঝাঁপান রাখিল; বলিল, “পথ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর ঝাঁপান চলে না।”—এখন কি করি? পথটা চড়াইয়ের, অথচ কোন পাকদণ্ডীও নাই। ভাঙ্গা পথ, উর্দ্ধের দিকে কেবল পাথরের উপরে পাথরের চিবি পড়িয়া রহিয়াছে। এই পথ-সঙ্কট দেখিয়াও কিন্তু আমি ফিরিতে পারিলাম না। আমি সেই ভাঙ্গা পথে পাথরের উপর দিয়া হাঁটিয়া উঠিতে লাগিলাম। একজন পিছনের দিকে আমার কোমরটার অবলম্বন হইয়া ধরিয়া রহিল। তিন ঘণ্টা এইরূপ করিয়া চলিয়া-চলিয়া, সেই ভাঙ্গা পথ অতিক্রম করিলাম। শিখরে উঠিয়া একটা ঘর পাইলাম। সে ঘরে একখানা কোচ ছিল, আমি আসিয়াই তাহাতে শুইয়া পড়িলাম। ঝাঁপানীরা গ্রামে যাইয়া আমার জন্য এক বাটি দুধ আনিল, কিন্তু অতি-পরিশ্রমে আমার ক্ষুধা চলিয়া গিয়াছে, আমি সে দুধ খাইতে পারিলাম না। সেই যে কোচে পড়িয়া রহিলাম, সমস্ত রাত্রি চলিয়া গেল, একবারও উঠিলাম না। প্রাতে শরীরে একটু বল আসিল। ঝাঁপানীরা আবার এক বাটি দুধ আনিয়া দিল, আমি তাহা পান করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। আরো উপরে উঠিয়া, সে দিন নারুকাগাতে উপস্থিত হইলাম। এ অতি উচ্চ শিখর। এখানে শীতের অতিশয় আধিক্য বোধ হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে দুগ্ধ পান করিয়া পদব্রজেই চলিলাম। অদূরেই নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম, যেহেতু সে পথ বনের মধ্য দিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সেই বন ভেদ করিয়া রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া পথে পড়িয়াছে, তাহাতে বনের শোভা আরো দীপ্তি পাইতেছে। যাইতে যাইতে দেখি যে, বনের স্থানে স্থানে বহুকালের বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ-সকল মূল হইতে উৎপাটিত হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণত রহিয়াছে, ও অনেক তরুণ-বয়স্ক বৃক্ষও দাবানলে দগ্ধ হইয়া অসময়ে দুর্দশাপ্রাপ্ত হইয়াছে। অনেক পথ চলিয়া পরে যানারোহণ করিলাম। ঝাঁপানে চড়িয়া ক্রমে আরও নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম। পর্বতের উপরে আরোহণ করিতে করিতে তাহার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল হরিদবর্ণ ঘন-পল্লবাবৃত বৃহৎ বৃক্ষ-সকল দেখিতে পাই। তাহাতে একটা পুষ্প কি একটা ফলও নাই। কেবল কেনু নামক বৃহৎ বৃক্ষেতে হরিদবর্ণ একপ্রকার কদাকার ফল দৃষ্ট হয়, তাহা

পক্ষীতেও আহাৰ করে না। কিন্তু পৰ্ব্বতের গাত্রে যে বিবিধ প্রকাৰের তৃণ-লতাদি জন্ম, তাহারই শোভা চমৎকার। তাহা হইতে যে কত জাতির পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সহজে গণনা করা যায় না। শ্বেতবৰ্ণ, পীতবৰ্ণ, নীলবৰ্ণ, স্বৰ্ণবৰ্ণ, সকল বৰ্ণেরই পুষ্প যথা-তথা হইতে নয়নকে আকর্ষণ করিতেছে। এই পুষ্প-সকলের সৌন্দৰ্য্য ও লাবণ্য ও তাহাদিগের নিকলক পবিত্রতা দেখিয়া, সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বৰ্ত্তমান বোধ হইল। যদিও ইহাদিগের যেমন রূপ তেমন গন্ধ নাই, কিন্তু আর এক প্রকার শ্বেতবৰ্ণ গোলাপ-পুষ্পের গুচ্ছ-সকল বন হইতে বনান্তরে প্রস্ফুটিত হইয়া, সমুদয় দেশ গন্ধে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। এই শ্বেত গোলাপ চারি পত্রের এক স্তবক মাত্র। স্থানে স্থানে চামেলি-পুষ্পও গন্ধ দান করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝেঁৱেরি ফল-সকল খণ্ড খণ্ড রক্তবৰ্ণ উৎপলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। আমার সঙ্গে এক ভৃত্য এক বনলতা হইতে তাহার পুষ্পিত শাখা আমার হস্তে দিল। এমন সুন্দর পুষ্পের লতা আমি আর কখনো দেখি নাই; আমার চক্ষু খুলিয়া গেল, আমার হৃদয় বিকশিত হইল। আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিল-মাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। এই বনের মধ্যে কে-বা সেই-সকল পুষ্পের গন্ধ পাইবে, কে-বা তাহাদের সৌন্দৰ্য্য দেখিবে? তথাপি তিনি কত যত্নে, কত স্নেহে তাহাদিগকে সুগন্ধ দিয়া, লাবণ্য দিয়া, শিশিরে সিক্ত করিয়া, লতাতে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার করুণা ও স্নেহ আমার হৃদয়ে আগিয়া উঠিল।

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

[১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে নেদিনিপুরের বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি দারিদ্র্যে অতিশয় কষ্ট ভোগ করেন, তথাপি অনেক পরিশ্রম করিয়া তিনি নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। আরও কয়েকজন এই উপাধি পাইয়াছেন, কিন্তু 'বিদ্যাসাগর' বলিতে বঙ্গদেশে শুধু ঈশ্বরচন্দ্রকেই

বুঝায়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন, কিন্তু উপরিতন কর্মচারীর সঙ্গে মতবৈধ হওয়ায় চাকরি ত্যাগ করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্য-সেবায় বৃত্তী হন। সাহিত্যসেবা-দ্বারা তিনি পুতুত অর্থ উপার্জন করেন; সেই অর্থ তিনি দুঃস্থ ও অনাথদের উপকারার্থ মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রের অপরিণীত কন্যা তাঁহার রচিত পুস্তকগুলিকে সরস, মধুর ও উদ্দীপনাময় করিয়া রাখিয়াছে। বঙ্গানার গদ্য-সাহিত্য তাঁহার নিকট অশেষরূপে ধনী; তাঁহাকে কেহ কেহ 'বঙ্গসাহিত্যের জনক' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তিনি 'নীতার বনবাস,' 'শকুন্তলা,' 'স্বাস্থিবিলাস,' 'বেতাল পঞ্চবিংশতি,' 'আখ্যান-মঞ্জরী' পুতুতি বহু পুস্তক রচনা করেন। ইহা ছাড়া সংস্কৃত-শিক্ষার উপযোগী কয়েকখানি প্রাথমিক শিক্ষা-পুস্তক এবং ব্যাকরণও তিনি রচনা করেন। তিনি প্রাচীন শ্রেণীর পণ্ডিত হইয়াও ইংরেজী ভাষায় বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন এবং বিধবা-বিবাহ প্রচার ও বহুবিবাহ নিবারণ করিতে পুতুত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর পরলোক-গমন করেন। গতন্যমেন্ট তাঁহাকে 'সি.আই.ই.' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।]

প্রস্থানসময় উপস্থিত হইল। গৌতমী এবং শার্দ্রব ও শারদ্বত নামে দুই শিষ্য শকুন্তলার সমতিবাহারে গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা যথাসম্ভব বেশভূষার সমাধান করিয়া দিলেন। মহর্ষি শোকাকুল হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অদ্য শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে; নয়ন অনবরত বাষ্পাবিতে পরিপূর্ণিত হইতেছে; কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্শক্তিহীন হইতেছি; জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য্য! আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈকল্য উপস্থিত হইতেছে; না জানি সংসারীরা এমন স্বস্থায় কি দুঃসহ ক্রেশ ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম, স্নেহ অতি বিষম বস্তু। অনন্তর তিনি শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে বেলা হইতেছে, প্রস্থান কর; আর অনর্থক কালহরণ করিতেছ কেন? এই বলিয়া তপোবন-তরুণিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সন্নিহিত তরুণণ! যিনি তোমাদের জলসেচন না করিয়া, কদাচ জলপান করিতেন না; যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও, স্নেহবশতঃ কদাচ তোমাদের পল্লবভঙ্গ করিতেন না; তোমাদের কুমুমপ্রসবের সময় উপস্থিত হইলে, যাহার আনন্দের সীমা থাকিত না,—অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।

অনন্তর সকলে প্রাতোবসন করিলেন। শকুন্তলা গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া, প্রিয়ংবদার নিকটে গিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন, সখি! আৰ্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে, কিন্তু তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার পা উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! তুমিই যে কেবল তপোবন-বিরহে কাতর হইতেছ, এরূপ নহে, তোমার বিরহে তপোবনের কি অবস্থা ঘটিতেছে, দেখ।—জীবনাত্রাই নিরানন্দ ও শোকাকুল; হরিণগণ আহার-বিহারে পরাভ্রু হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে,—মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে; ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধমুখ হইয়া রহিয়াছে; কোকিলগণ আশ্রমুকুলের বসাস্বাদে বিমুখ হইয়া নীরব হইয়া আছে; মধুকর-মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে ও গুন্ গুন্ ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে।

কণ্ঠ কহিলেন, বৎসে! আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয়। তখন শকুন্তলা কহিলেন, তাত! বনতোমিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া যাইব না। এই বলিয়া তিনি বনতোমিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন, বনতোমিণি! শাখাবাহ-দ্বারা আমায় স্নেহভরে আলিঙ্গন কর; আজ অবধি আমি দূরবস্তিনী হইলাম। অনন্তর অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, সখি! আমি বনতোমিণীকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম। তাঁহারা কহিলেন, সখি! আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে, বল। এই বলিয়া, উভয়ে শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ঠ কহিলেন, অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমরা কি পাগল হইলে? তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে রাখনা করিবে, না হইয়া, তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে।

এক পূর্ণ গর্ভা হরিণী কুটারের প্রান্তে শয়ন করিয়া ছিল। তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে, শকুন্তলা কণ্ঠকে কহিলেন, তাত! এই হরিণী নিব্বিধে প্রসব করিলে, আমায় সংবাদ দিবে, ভুলিবে না, বল। কণ্ঠ কহিলেন, না বৎসে! আমি কখনই ভুলিব না।

কতিপয় পদ গমন করিয়া, শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানিতেছে, এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কণ্ঠ কহিলেন, বৎসে! যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে;

যাহার অহাৱের নিমিত্ত তুমি সৰ্বদা শ্যামাক আহরণ করিতে ; যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ-দ্বারা স্কত হইলে, তুমি ইক্ষুনীতৈল দিয়া ব্রণশোধন করিয়া দিতে,—সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গতিরোধ করিতেছে। শকুন্তলা তাহার গাত্রে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা। আর আমার সঙ্গে আইস কেন, ফিরিয়া যাও, আমি তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তুমি মাতৃহীন হইলে আমি তোমায় প্রতিপালন করিয়াছিলাম ; এখন আমি চলিলাম ; অতঃপর পিতা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। এই বলিয়া শকুন্তলা রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, বৎসে। শাস্ত হও, অশ্রুবেগ সংবরণ কর, পথ দেখিয়া চল ; উচ্চ-নীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করাতে বারবার আঘাত লাগিতেছে।

এইরূপ নানা কারণে গমনে বিলম্ব দেখিয়া, শার্ঙ্গরব কণ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্। আপনকার আর অধিক দূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই ; এই স্থলেই, যাহা বলিতে হয় বলিয়া দিয়া, প্রতিগমন করুন। কণ্ব কহিলেন, তবে আইস, এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হই। তদনুসারে সকলে সন্নিহিত ক্ষীরপাদপের ছায়ায় অবস্থিত হইলে কণ্ব কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, বৎস। তুমি শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে রাখিয়া তাঁহারে আমার এই আবেদন জানাইবে,—আমরা বনবাসী, তপস্যায় কালযাপন করি ; তুমি অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ; আর শকুন্তলা বন্ধুবর্গের অগোচরে স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিনী হইয়াছে : এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায়, শকুন্তলাতেও স্নেহদৃষ্ট রাখিবে ; আমাদের এই পর্য্যন্ত প্রার্থনা ; ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে, ঘটাবেক, তাহা আমাদের বলিয়া দিবার নয়।

মহর্ষি শার্ঙ্গরবের প্রতি এই সন্দেশ নির্দেশ করিয়া, শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে। এক্ষণে তোমারেও কিছু উপদেশ দিব,—আমরা বনবাসী বটে, কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। তুমি পতিগৃহে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে ; সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখা-ব্যবহার করিবে ; পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া-দাক্ষিণ্য-প্রদর্শন করিবে ; সৌভাগ্যগর্বে গর্বিত হইবে না ; স্বামী কার্কশ্য-প্রদর্শন করিলেও রোধবশা

ও প্রতিকূলচারিণী হইবে না ; মহিলারা একরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয় ; বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টকস্বরূপ। ইহা कहিয়া বলিলেন, দেখ, গৌতমীই বা কি বলেন। গৌতমী कहিলেন, বধুদিগকে এই বই আর কি বলিয়া দিতে হইবেক ? পরে শকুন্তলাকে कहিলেন, বাছা ! উনি যেগুলি বলিলেন, সকল মনে রাখিও।

স্বপ্নদর্শন—বিদ্যাবিষয়ক

অক্ষয়কুমার দত্ত

[বর্তমান জেলার অন্তর্গত চুপী গ্রামে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত ছিলেন এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার ইংরেজী দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রকে বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণের উপভোগ্য করিয়া লিখিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ইহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে, 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-পুষ্টিত্বের সম্বন্ধ-বিচার,' 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়,' 'চারুপাঠ' প্রভৃতি পুস্তক বাঙ্গালা সাহিত্যে পুসিক। ইনি পরম পণ্ডিত ও স্নলেখক ছিলেন। ইনি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক-গমন করেন।]

পরমেশ্বরের বিচিত্র রচনা-দর্শনাথৈ পরম কোতূহলী হইয়া, আমি কিয়ৎ-কালাবধি দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং নানা স্থান পর্য্যটন-পূর্বক এখন মথুরা-সন্নিধানে আগিয়া অবস্থিতি করিতেছি। এখানে এক দিবস দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয়-প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া, সায়ংকালে যমুনাতীরে উপবেশনপূর্বক স্নানলিত লহরী-জীনা অবলোকন করিতেছিলাম। তথাকার স্নানিষ্ঠ মারুত-হিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছিল। কত শত দীপ্যমান হীরকখণ্ড গগন-মণ্ডলে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল, এবং তন্মধ্যে দিব্য-লাবণ্য-পরিশোভিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া, কখনও আপনাব পরম রমণীয় অনির্বচনীয় সুধাময় কিরণ বিকিরণপূর্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন, কখনও বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া স্বকীয় মন্দীভূত কিরণ-বিস্তার-দ্বারা পৌর্ণমাসী রজনীকে উদ্যানরূপ স্থান

করিতেছিলেন। কখনও তাঁহার সুপ্রকাশিত রশ্মিজাল সলিল-তরঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া কম্পমান হইতেছিল; কখনও গগনাবলম্বিত মেঘবিষ-দ্বারা বনুনার নির্মল জল ঘনতর শ্যামবর্ণ হইয়া, অন্তঃকরণ হরণ করিতেছিল। পূর্বের দূর হইতে লোকালয়ের কলরব শ্রুত হইতেছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে বন্দীভূত হইয়া স্ব স্ব স্থানে লীন হইল, এবং সর্বসত্তাপনামিনী নিদ্রা জীবগণের নেত্রোপরি আবির্ভূত হইয়া, সকল ক্রেশ শান্তি করিতে লাগিল।

এইরূপ সুমিষ্ট সময়ে আমি তথায় এক পাষাণখণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া, আকাশ-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে, জগতের আদি-অন্ত, কার্য-কারণ, সুখ-দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুদয় মনে মনে পর্যালোচনা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে জন-কল্লোলের কলকল-স্বনি, বৃক্ষ-পত্রের শরণ-শব্দ ও সুশীতল সসীরণের সুন্দর হিলোল-দ্বারা আমার পরম সুখানুভব হওয়ায়, মনোবৃত্তি-সমুদয় ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল, এং এই অবসরে নিদ্রা আমার অজ্ঞাতসারে নয়নদ্বয় নিম্নীলিত করিয়া আমাকে অভিভূত করিল। আমার বোধ হইল, যেন এক বিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। তন্মধ্যে কোন কোন স্থানে কেবল নবীন-দুর্বাদল-পরিপূর্ণ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র, কুত্রাপি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুরাতন বৃক্ষসমূহ, কোথাও নদী বা নিম্ন রতীবস্ত্র মনোহর কুসুমোদ্যান দর্শন করিয়া অপরিমিত আনন্দ লাভ করিলাম। কোতূহল-রূপ দীপ্ত হতাশন ক্রমশঃ প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল; এবং তদনুসারে দিগ্বিদিক্ বিবেচনা না করিয়া, যতদূর দৃষ্ট হইল ততদূরই মহোৎসাহে ও পরম সুখে পর্যটন করিতে লাগিলাম।

অবশেষে এক সরোবর-তীরস্থ অতি নিবিড় নির্জন নিস্তব্ধ বনখণ্ডে, এক অপূর্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম। তাঁহার অত্যাঙ্ক প্রসন্ন বদন ও অনৌকিক শাস্ত্র স্বভাব দর্শনে, তাঁহাকে বনদেবতা জ্ঞান করিয়া, বিহিত-বিধানে নমস্কার করিলাম ও তাঁহার পুনঃপুনঃ দর্শনলাভ-দ্বারা নয়ন-যুগল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কৃতজ্ঞলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিলাম। দেখিলাম, তিনি আপনার কপোলপ্রদেশে হস্তার্পণ করিয়া, গগন-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসার মানস করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার বাক্য-স্ফূরণ না হইতে, তিনি গাত্রোথান করিয়া, সাতিনয় আগ্রহ-পূর্ব্বক কহিলেন,—“আমি তোমার মানস জ্ঞানিয়াছি; আমার নাম বিদ্যা;

তুমি যে স্থানে যাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহার এই পথই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। যাহারা এই রম্য কানন ভ্রমণ করিতে আইসেন, আমিই তাঁহাদিগকে পথ প্রদর্শন করি; চল, তোমাকেও সঙ্গে লইয়া যাই।”

আমি তাঁহার এই আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, হৃষ্টমনে তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। উভয়-পার্শ্ববর্তী বৃক্ষ-শ্রেণীর মধ্যদেশ দিয়া কিয়দূর গমন করিতে করিতে, অরণ্যের শৈত্য, শোভা ও পবিত্রতা প্রত্যক্ষ করিয়া, অতুলানন্দ প্রাপ্ত হইলাম, এবং অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—“দেবি, এ স্থানের নাম কি, এবং এখানে কি কি অপূর্ব ব্যাপারই বা সম্পন্ন হইয়া থাকে?” তাহাতে তিনি সম্মত হইয়া উত্তর করিলেন,—“এ বিদ্যারণ্য, এ অরণ্যে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ আছে, অতি ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই এখানে আগমন করেন; কিন্তু ইহার ফল ভোগ করা অতিশয় আয়াস-সাধ্য, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কেহ কেহ দূর হইতে কোন বৃক্ষের উচ্চতা দর্শনমাত্র পরাভূমুখ হইয়া প্রতিগমন করেন, কেহ কেহ বা ফল-আহরণের প্রত্যাশায় কতক দূর বৃক্ষাক্রান্ত হইয়াও পুনর্ব্বার অধঃপতিত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি একবার এই রমণীয় কাননের ফল ভোগ করিয়াছেন, তিনি আর কদাপি তাহার আশ্বাদন বিস্মৃত হইতে পারেন না। আমি তোমাকে ক্রমে ক্রমে সমুদয় দর্শাইতেছি, চল। ঐ যে সুদৃশ্য মনোহর বৃক্ষ সম্মুখে দৃষ্টি করিতেছ, যাহার সতেজ শাখা-সমুদয় সুমধুর বসন্তকীট-ফল-ভরে অবনত হইয়াছে, যাহার স্বল্প হইতে সুবাসন-মধু-ধারা-সকল অনবরতই ক্ষরিতেছে ও সুকুমারমতি তরুণ যুবকেরা যাহাতে সুখে আরোহণ করিতেছে, উহার নাম কাব্য-তরু। দেখিবাছ, অলঙ্কৃতি-রূপা কি অপূর্ব আশ্চর্য্য রমণীয় লতা তাহাকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। বৃক্ষ হইতে কিছু দূরে, যে প্রকাণ্ড তেজস্বী বৃক্ষ দেখিতেছ, সুদীর্ঘ প্রবীণ ব্যক্তির যাহার সেবা করিতেছেন, তাহার নাম জ্যোতিষ।” ইহা কহিয়া বিদ্যা দেবী ঐ বৃক্ষের অশেষ গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার বাক্যাবসান হইলে, আমি জ্যোতিষ-তরুর নিকটবর্তী হইয়া দেখিলাম, পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত-সমুদয় এক একবার প্রগাঢ়রূপ মনোনিবেশ-পূর্ব্বক ধ্যান-পরায়ণ হইতেছেন, আর বার প্রসন্নবদনে হাস্য করিয়া অতুল আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। পরন্তু আর এক অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া, সাতিনয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। ঐ

বৃক্ষের মূল মৃত্তিকা-সংযুক্ত নহে ; আর এক প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষের স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি এই শেঘোক্ত তরুর ন্যায় সারবান্ বৃক্ষ আর একটিও দৃষ্টি করি নাই। তাহার কোন স্থানের কণামাত্রও ক্ষয় হয় নাই ও কুত্রাপি একটিমাত্রও ছিদ্র কিংবা চিহ্ন নাই। আমি এই অদ্ভুত তরুর বিষয়ে সবিশেষ জানিবার জন্য পরম কৌতুহলী হইয়া, বিদ্যাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন,—“এই সারবান্ অক্ষয় বৃক্ষের নাম গণিত। তুমি কেবল সম্মুখবর্তী জ্যোতিষ-তরুর মূল ইহাতে সংবদ্ধ দেখিতেছ ; প্রদক্ষিণ করিয়া দেখ, অন্যান্য কত আশ্চর্য্য বৃক্ষ ও লতা ইহার স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া, তদুপরি প্রতিষ্ঠিত আছে।” বস্তুতঃ আমি বেটেন করিয়া দেখিলাম, তাঁহার কথা প্রামাণিক বটে ; শাখা, প্রশাখা ও বৃক্ষরূহ-সংবলিত এক গণিত-বৃক্ষ অর্দ্ধকানন ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

তথা হইতে প্রশ্নানান্তর আমার সমভিব্যাহারিণী পথপ্রদশিকা বনদেবী সানুগ্রহ-বচনে বলিলেন,—“সর্বদেশীয় বৃক্ষলতাদি আনয়ন করিয়া এ কাননে রোপণ করা গিয়াছে। জ্যোতিষ ও গণিতের কয়েকটা কলম তোমাদিগের দেশ হইতেও আহরণ করা গিয়াছে। দেখ, ভিন্-জাতীয় লোকে এই কাননে অবস্থিতি করিয়া, উৎসাহ ও যত্ন সহকারে তাহার কেমন পারিপাট্য ও উন্নতি সাধন করিয়াছে। আর তোমার স্বদেশীয় লোকদিগকে ধিক্কার করিতে হয় ; কারণ, যতগুলি বৃক্ষ রক্ষণাবেক্ষণের ভার কেবল তাহাদিগের উপর সমপিত আছে, প্রায় তাহার সমুদয়ই ভগ্ন ও শুক হইয়া যাইতেছে। দক্ষিণ দিকে যত বৃক্ষ দেখিতেছ, সমস্তই এক-জাতীয়, তাহার নাম স্মৃতি ; আর বাম দিকে যত দৃষ্ট হইতেছে, তাহার নাম দর্শন।” আমি ঐ উভয়-জাতীয় বৃক্ষ অবলোকন করিয়া, যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইলাম। ঐ সমস্ত সহজেই অসার, রক্তপরিপূর্ণ, কোনটা বা নিতান্ত শূন্যগর্ভ, তাহাতে আবার সমুচিত যত্ন-সহকারে পরিপালিত না হওয়াতে, অতিশয় দুরবস্থ হইয়া রহিয়াছে। দেখিলাম, দক্ষিণ দিকে সমুদয় বৃক্ষ যদিও সম্যগ্রূপে নষ্ট হয় নাই, কতকগুলি শুক ও ভগ্ন-শাখ হইয়াছে, কিন্তু পারিপাট্য নাই ; বোধ হইল, যেন প্রবল ঝড়বাত-দ্বারা সমুদয় বিপ্লুত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। বাম দিকের কোন বৃক্ষের কেবল স্কন্ধমাত্র আছে, কোনটির বা সমুদয় গিয়া এক দিকের একমাত্র শাখা আছে, তন্নিহ্ন কোন কোন বৃক্ষের স্কন্ধমাত্রও দৃষ্টিগোচর হইল না। এই দুঃসহ দুঃখের সময়ে এক পরম কৌতুক

দেখিলাম,—কতকগুলি অভিমাত্রী মনুষ্য উভয়পার্শ্বস্থ বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া, অত্যন্ত দত্ত ও ব্যাপকতা সহকারে মহা কোলাহল ও বিবম কলহ আরম্ভ করিয়াছে।

এইরূপ শারীরস্থান, রসায়ন, চিকিৎসা প্রভৃতি অনির্বচনীয় পরম রমণীয় তরু-সমূহ দর্শন করিয়া, সাতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম, এবং অতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া, পশ্চিমদ্যে পরমারাধ্যা বিন্যাদেবীকে কহিলাম,—“দেবি। আমি তোমার প্রসাদে অন্য অনুপম সুখ অনুভব করিলাম। ভূমণ্ডলে এত নির্মল সুখ-ধাম আর কোথাও নাই। আমার বোধ হয়, এ স্থানে বিত্ত-চিত্ত সচরিত্র ব্যক্তিরাই আগমন করে, অপর লোকের এখানে আসিবার অধিকার নাই।” এই কথা শ্রবণমাত্র তিনি বিবগুবদনে কহিলেন,—“তুমি যথার্থ বিবেচনা করিয়াছ; এ স্থান ধর্মশীল সাধু ব্যক্তিদিগেরই যোগ্য বটে, এবং পূর্বে ইহা তাদৃশই ছিল। তখন কেবল পরোপকারী, তব-পরায়ণ, পুণ্যাত্মা আচার্য্য-সকলই এই পরম পবিত্র কাননে উপবেশন করিয়া, অতুল আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু এক্ষণে এ বনে নানা বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছে; পাপ-রূপ পিশাচের উপদ্রবে ইহা অতি সঙ্কট-স্থান হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, বিজ্ঞাতীয়-বেশধারী অভিমাত্র স্ব-মস্তক উন্নত ও গ্রীবাঙ্গণ বক্র করিয়া, অত্যন্ত উগ্রভাবে সকলের উপর ধরতর দৃষ্টিপাত করিতেছে, ও স্বকীয় পুত্র দত্তকে সমভিব্যাহারে লইয়া, মহাশ্লাঘা প্রকাশ-পূর্বক সগর্ব্ব-পদবিক্ষেপ করিতেছে। উহাদের অঙ্গ-ভঙ্গী দেখিয়া কি তোমার বোধ হইতেছে না যে, উহারা মনে মনে বিগ্ন-সংসার তুচ্ছ ভাবিতেছে? তৎপার্শ্বে দৃষ্টি কর, ক্রোধ নিজ কাস্তা হিংসাকে সঙ্গে লইয়া, ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। উহা অভিমাত্রের অত্যন্ত অনুগত। যদি কেহ অভিমাত্রকে স্পর্শমাত্র করে, ক্রোধ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া, তাহার বৈর-নির্ধাতন করিতে উদ্যত হয়। এ দিকে অবলোকন কর, একটা প্রকাণ্ড বাকল দেখিতে দেখিতে আপনার শরীর বৃদ্ধি করিয়া ফেলিল। এক্ষণে ও যেক্রপ স্থূলকায় হইয়া উঠিল, আমার বোধ হইতেছে, বিগ্ন-সংসার ভোজন করিলেও উহার উদর পূর্ণ হয় না। উহার নাম কি জ্ঞান? লোভ। বিশেষতঃ কাব্য-তরুতলে যে দুই প্রচণ্ড পিশাচ দণ্ডায়মান দেখি তহ, উহাদের অত্যাচারে এ স্থানের অতিশয় অপদগ্ন ঘোষণা হইয়াছে; উহাদের নাম কাম ও পান-দোষ। এককালে এই অপূর্ব

আনন্দ-কাননে নিরলস দম্পতী-প্রেমেরই প্রাদুর্ভাব ছিল ; তৎকালে অনেকানেক প্রধান ধর্ম তাহার সহচর ছিল, এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিয়াছে । ঐ ঘনপত্রবাবৃত নিবিড় বৃক্ষের অন্তরালে যে এক পরমা-সুন্দরী রমণীকে দৃষ্টি করিতেছ, উহার পর কুংসিত স্ত্রী আর দ্বিতীয় নাই । উহার গাত্রে যে কত শ্রবণ, কত ক্ষত ও কত কলঙ্ক আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না । কেবল কতকগুলি বেণতুমা-করুনা-যারা তৎসমুদয় প্রচহ্ন রাখিয়া আপনাকে সজ্জীভূত করিয়া দেখাইতেছে ; উহার নাম কপটতা ।”

সমুদয় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া আমি বিবাদ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম, এবং মনে মনে চিন্তা করিলাম,—এ আমার সংসার স্বভাবতঃ শোক-দুঃখেই পরিপূর্ণ ; যদিও দুই-একটি সুখময় পুণ্যভাম ছিল, তাহাতে এত বিঘ্ন ঘটিয়াছে । যাহা হউক, আপনার কর্তব্য-সাধনে পরাধুমুখ হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনা করিয়া, সর্বদুঃখ-নিবারিণী সস্তাপ-নাশিনী বিন্যাদেবীর পশ্চাদ্ভর্তী হইয়া গমন করিতে লাগিলাম । কিয়দূর গমনানন্তর, একবার পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া দেখি, যে সকল রাক্ষস-পিণ্ডাচের অহিত আচার দৃষ্টি করিয়া আসিলাম, তাহারাই আমার নিকটবর্তী হইয়াছে । পূর্ব্বে যাহাদিগের অতি কুংসিত বীভৎস আকার দর্শন করিয়াছিলাম, এখন দেখি, তাহারা পরম মনোহর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে । কি জানি, তাহারা কি কুমন্ত্রণা দেয়, এই আশঙ্কায় পরম হিতৈষিনী বিন্যাদেবীর সমীপবর্তী হইয়া, সবিণেষ সমস্ত নিবেদন করিলাম । তৎক্ষণাৎ তিনি আমাকে অভয় দিয়া, বৈধ্যা ও তিতিকা নামে দুই মহাবল পরাক্রান্ত পুহরীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—“তোমরা দুই জনে ইহার দুই পার্শ্বে থাক, কোন শত্রু যেন ইহার নিকটস্থ না হইতে পারে ।”

এইরূপে আমরা বনপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া, সম্মুখে এক ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখিতে পাইলাম । তখন বিন্যা অতি প্রসন্নবদনে সুমধুর হাস্য করিয়া কহিলেন,—“এই ক্ষুদ্র প্রান্তরের শেষে যে মনোহর গিরি দর্শন করিতেছ, ঐ তোমার লক্ষিত স্থান ; ঐ স্থান প্রাপ্ত হইলেই তুমি চরিতার্থ হইবে ।” এই কথা শুনিয়া আমি পরম-পুনর্জিতচিত্তে অরণ্য হইতে নিরাস্ত হইয়া, চিরাকাঙ্ক্ষিত ফল-প্রত্যাশায় মহোৎসাহ-সহকারে দ্রুতবেগে পদবিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলাম, এবং অবিনশ্বে পর্ব্বত-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, তথায় আরোহণ করিবার এক পথ প্রাপ্ত

হইলাম। ঐ পথের এক পার্শ্বে এক দৃঢ়ব্রতা স্মৃশীলা স্ত্রী এবং অন্য পার্শ্বে এক বহুপরিশ্রমী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ দণ্ডায়মান আছেন; তাঁহারা যাত্ৰীদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া, পর্বতোপরি লইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদিগকে পরিচয় দ্বিজ্ঞাসিয়া জানিলাম,—স্ত্রীর নাম শ্রদ্ধা, আর পুরুষের নাম যত্ন।

ঐ পর্বত আরোহণ করা অতিশয় ক্লেশকর বোধ হইল। অতি কষ্টে কিছু দূরে গমন করিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিলাম,—সম্প্রতি এই স্থানে অবস্থিতি করি। বিদ্যাদেবী স্বকীয়া মহীয়সী শক্তির দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়া কহিলেন,—“হে প্রিয়তম। এ পর্বতের পার্শ্ব-দেশে কোন স্থানে স্থির থাকিবার সম্ভাবনা নাই; যদি আর উপরে না উঠ, তবে অবশ্যই অধোগমন করিতে হইবে, অতএব সাবধান,—সাবধান।” আমি তাঁহার এই সদুপদেশ শুনিয়া, চৈতন্য প্রাপ্ত হইলাম। পরন্তু স্নেহের বিষয় এই যে, যতই আরোহণ করিতে লাগিলাম, ততই ক্লেশের লাঘব হইয়া স্নেহের বৃদ্ধি হইয়া আসিল।

অবশেষে যখন পর্বতোপরি উদ্ভীর্ণ হইলাম, তখন কি অনির্বচনীয় অনুপম সুখানুভবই হইল। তৎকাল, স্মৃশীতল-মাকৃত-হিরোলে শরীর পুনর্কিত হইতে লাগিল। তথায় ঘেব, হিংসা, বিবাদ, বিসংবাদ, চৌর্য্য, অত্যাচার—এ সকলের কিছুই নাই, কেবল আরোগ্য ও আনন্দ অবিরত বিরাজ করিতেছে। ইহা দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণ অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইল। বোধ হইল, বিশুসংসারে এমন রম্য স্থান আর দ্বিতীয় নাই। কিছুকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণানন্তর দূর হইতে এক অপূর্ব সরোবর দেখিতে পাইলাম এবং তদ্বর্ণনार्থে আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী হইয়া দেখি, কতকগুলি পরম-পবিত্র সর্বদাসুন্দরী কন্যা সরোবর-তটে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদিগের অসামান্য রূপ-লাবণ্য, প্রকৃত পবিত্র মুখশ্রী এবং সাবলা ও বাৎসল্যস্বভাব অবলোকন করিয়া, অপরিমেয় প্রীতি লাভ করিলাম। আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহাদিগের শরীরে কোন অলঙ্কার নাই, অথচ অনলঙ্কারই তাঁহাদের অলঙ্কার হইয়াছে। বোধ হইল যেন, আনন্দ-প্রতিমাগুলি ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলাম,—ইহারা দেবকন্যা হইবেন, তাহার সংশয় নাই। তখন বিদ্যাদেবী সাতিশয় অনুকম্পা-পূরঃসর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—“তুমি যথাথ অনুমান

করিয়াছ; ইঁহার। দেবকন্যাই বটেন, এবং এই ধর্ম্মাচল ইঁহাদের বাসভূমি। ইঁহাদের কাহারও নাম দয়া, কাহারও নাম ভক্তি, কাহারও নাম ক্ষমা, কাহারও নাম অহিংসা, কাহারও নাম মৈত্রী, ইত্যাদি। সকলের নিজ নিজ গুণানুসারে নামকরণ হইয়াছে। ইঁহাদের রূপ ভুবনবিখ্যাত। ইঁহার। যে কি পর্য্যন্ত সুশীল, তাহা কি বলিব। বিদ্যারণা-যাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহার। এই ধর্ম্মাচল আরোহণ করেন, তাঁহাদিগেরই শ্রম সার্থক ও জন্ম সফল। তুমি এই সরোবরে স্নান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ ও জীবন পবিত্র কর।'

বিদ্যাদেবীর উপদেশানুসারে আমি উল্লিখিত শান্তি-সরোবরে অবগাহন করিয়া, অভূতপূর্ব অতি নির্বল আনন্দনীরে নিমগ্ন হইতেছিলাম, ইতিমধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি,—সেই সুন্দর মারুতসেবিত যমুনা-কূলেই শায়িত্ত্ব রহিয়াছি।

পালামো

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ এবং যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ-পরগনার কাঁটালপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি 'বেঙ্গল রায়ত্‌স্' নামক পুস্তক লিখিয়া বঙ্গদেশের তৎকালীন লেফ্টেন্যান্ট গভর্নরের পুঁতি লাভ করেন এবং তাহার কলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু কোন বিশেষ কারণে ইঁহাকে ঐ চাকরি ত্যাগ করিতে হয়। তৎপরে ইনি অনেক দিন স্পেশাল স্বে-রেজিষ্ট্রার ছিলেন; উপরিতন কর্ম্মচারীর সঙ্গে মতবৈধ হওয়াতে ইনি চাকরি ছাড়িয়া দেন। সঞ্জীবচন্দ্র অতি সুলেখক ছিলেন। ইঁহার রচিত 'পালামো,' 'জাল পুতাপর্চাদ' প্রভৃতি গুণ বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে। বঙ্কিম-চন্দ্রের পরে কয়েক বৎসর ইনি 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

১

অনেক দিনের কথা লিখিতে বসিয়াছি, সকল স্মরণ হয় না। পূর্বের লিখিলে যাহা লিখিতাম, এক্ষণে যে তাহা ই লিখিতেছি, এমন নহে। পূর্বের সেই সকল নির্জন পর্বত, কুসুমিত কানন প্রভৃতি যে চক্ষুতে দেখিয়াছিলাম,

শে চক্ষু আর নাই। এখন পর্বত কেবল প্রস্তরময়, বন কেবল কণ্টকাকীর্ণ, অধিবাসীরা কেবল কদাচারী বলিয়া স্মরণ হয়। অতএব যাহারা বয়োগুণে কেবল শোভা-সৌন্দর্য্য প্রভৃতি ভালবাসেন, বৃদ্ধের লেখায় তাঁহাদের কোন প্রবৃত্তি পরিতুষ্ট হইবে না।

যখন আমার পানামো যাওয়া একান্তই স্থির হইল, তখন জানি না যে সে স্থান কোন্ দিকে, কত দূর; অতএব ম্যাপ দেখিয়া পথ স্থির করিলাম। হাজারি-বাগ হইয়া যাইতে হইবে, এই বিবেচনায় ডাক-গাড়ী ভাড়া করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময়ে রানীগঞ্জ হইতে যাত্রা করিলাম। প্রাতে বরাকর নদীর পূর্বপারে গাড়ী থামিল। নদী অতি ক্ষুদ্র, তৎকালে অল্প মাত্র জল ছিল, সকলেই হাঁটিয়া পার হইতেছে, আমার গাড়ী ঠেলিয়া পার করিতে হইবে, অতএব গাড়ওয়ান কুলি ডাকিতে গেল।

পূর্বপার হইতে দেখিলাম যে, অপর পারে ঘাটের উপরেই একজন সাহেব বাঙ্গালায় বসিয়া পাইপ টানিতেছেন, সম্মুখে একজন চাপরাসী একরূপ গৈরিক মৃত্তিকাহস্তে দাঁড়াইয়া আছে। যে ব্যক্তি পারার্থ সেই ঘাটে আসিতেছে, চাপরাসী তাহার বাহতে সেই মৃত্তিকা-দ্বারা কি অঙ্কপাত করিতেছে। পারার্থীর মধ্যে বন্য লোকই অধিক, তাহার মৃত্তিকারঞ্জিত আপন আপন বাহর প্রতি আড়নয়নে চাহিতেছে আর হাসিতেছে, আবার অন্যের অঙ্গে সেই অঙ্কপাত কিরূপ দেখাইতেছে তাহাও এক এক বার দেখিতেছে, শেষে হাসিতে হাসিতে দৌড়াইয়া নদীতে নানিতেছে। তাহাদের ছুটাছুটিতে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইয়া কলের উপরে উঠিতেছে।

আমি অন্যমনস্ক এই রঙ্গ দেখিতেছি, এমন সময়ে কুলিদের কতকগুলি বালক-বালিকা আসিয়া আমার গাড়ী ঘেরিল, এবং “সাহেব, একটি পয়সা,” “সাহেব, একটি পয়সা,” এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ধূতি-চাদর পরিয়া আমি নিরীহ বাঙ্গালী বসিয়া আছি, আমায় কেন সাহেব বলিতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত বলিলাম, “আমি সাহেব নহি।” একটি বালিকা আপন ক্ষুদ্র নাসিকাস্থ অঙ্গুরিবৎ অলঙ্কারের মধ্যে নখ নিমজ্জন করিয়া বলিল, “হাঁ, তুমি সাহেব।” আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, “তবে তুমি কি?” আমি বলিলাম, “আমি বাঙ্গালী।” সে বিশ্বাস করিল না, বলিল, “না, তুমি

সাহেব।” তাহারা মনে করিয়া থাকিবে যে, যে গাড়ী চড়ে সে অবশ্য
সাহেব।

বরাকব হটতে দুই-একটি ক্ষুদ্র পাগড় দেখা যায়। বঙ্গবাসীদের কেবল
মাঠ দেখা অভ্যাস, যুদ্ধিলাব সামনা স্থাপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়;
অতএব সেই ক্ষুদ্র পাগড়গুলি দেখিয়া যে তৎকালে আমার যথেষ্ট আনন্দ হইবে,
ইহা আব আশ্চর্য্য কি? বানাকালে পাগড় পর্বতের পরিচয় অনেক শুনা
হিন, বিশেষতঃ একবার এক বৈবাহিক আৰুড়ায় চূপকাম করা এক গিবিগোবর্দ্ধন
দেখিয়া পাগড়ের আকার অনুভব করিয়া লইয়াছিলাম। বরাকবের নিকটস্থ
পাগড়গুলি দেখিয়া আমার সে বান্যসংস্কারের কিকিং পরিবর্তন হইতে আরম্ভ
হইল।

অপরাহ্নে দেখিলাম, একটি সুন্দর পর্বতের নিকট দিয়া গাড়ী যাইতেছে।
এত নিকট দিয়া যাইতেছে যে, পর্বতস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকের ছায়া পর্য্যন্ত দেখা
যাইতেছে। গাড়ীওয়ানকে গাড়ী থামাইতে বলিয়া আমি নামিলাম। গাড়ীওয়ান
জিজ্ঞাসা করিল, “কোথা যাইবেন?” আমি বলিলাম, “একবার এই পর্বতে
যাইব।” সে হাসিয়া বলিল, “পাগড় এখান হইতে অনেক দূর, আপনি
সন্ধ্যার মধ্যে তথায় পৌঁছিতে পারিবেন না।” আমি এ কথা কোনরূপে
বিশ্বাস করিতে পারিলাম না; আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, পাগড় অতি নিকট,
তথায় গাইতে আমার পাঁচ মিনিটও লাগিবে না, অতএব গাড়ীওয়ানের নিষেধ
না শুনিয়া আমি পর্বতভিত্তিরে চলিলাম। পাঁচ মিনিটের স্থানে পনের মিনিট
কাল দ্রুতপদবিধানে গমন, তথাপি পর্বত পূর্বমত সেই পাঁচ মিনিটের পথ
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন আমার ভ্রম ব্যাভিত্ত পারিয়া গাড়ীতে
ফিবিয়া আসিলাম। পর্বত-সম্মুখে দূরত্ব স্থির করা বাঙালীর পক্ষে বড় কঠিন।
ইহার প্রমাণ পান্নাবৌ গিয়া আমি পুনঃপুনঃ পাইয়াছিলাম।

পর দিবস প্রায় দুই পুহরের মধ্যে হাজাগিবাগে পৌঁছিলাম; তথায় গিয়া
শুনিলাম, কোন সঙ্গাত্ত ব্যক্তির বাণীতে আমার আগারের আয়োজন হইতেছে।
প্রায় দুই দিবস আগর হয় নাই, অতএব আগার-সনাক্তীয় কথা শুনিবামাত্র ক্ষুধা
অধিকতর প্রবীণ হইল। যিনি আমার নিষিদ্ধ উদ্বেগ করিতেছেন, তিনি
আমার আগমনবার্তা কিরূপে জানিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিবার আর অবকাশ

হইল না ; আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাটীতে গাড়ী লইয়া যাইতে অনুমতি করিলাম ।
 তাঁহার বাটীতে যাইতেছি, তাঁহার সহিত আমার কখনও চাক্ষুষ পরিচয় হয় নাই ;
 তাঁহার নাম শুনিয়াছি, সুখ্যাতিও যথেষ্ট শুনিয়াছি, সজ্জন বলিয়া তাঁহার প্রশংসা
 সকলেই করে । কিন্তু সে প্রশংসায় কর্ণপাত বড় করি নাই, কেন-না, বড়
 বাসিন্দাই সজ্জন ; বড় কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাশা ; যাহা নিন্দা শুনা যায়,
 তাহা কেবল প্রতিবাসীর । প্রতিবাসীরা পরশ্রীকাতর, দান্তিক, কলহপ্রিয়,
 লোভী, কপণ ও বঞ্চক । তাহারা আপনাদের সম্মানকে ভাল বাপড়, ভাল
 জুতা পরায়,—কেবল আমাদের সম্মানকে কাঁদাইবার জন্য । তাহারা আপনাদের
 পুত্রবধূকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার দেয়,—কেবল আমাদের পুত্রবধুর মুখ ভার করাইবার
 নিমিত্ত । পাপিষ্ঠ প্রতিবাসীরা । যাহাদের প্রতিবাসী নাই, তাঁহাদের ত্রোষ
 নাই । তাঁহাদেরই নাম ঋষি । ঋষি কেবল প্রতিবাসিত্যাগী গৃহী । ঋষির
 আশ্রমপার্শ্বে প্রতিবাসী বসায়, তিন দিনের মধ্যে ঋষির ঋষিত্ব যাইবে । প্রথম
 দিনে প্রতিবাসীর ছাগলে পুষ্পবৃক্ষ নিষ্পত্র করিবে, দ্বিতীয় দিনে প্রতিবাসীর গরু
 আসিয়া কমণ্ডলু ভাঙিবে, তৃতীয় দিনে প্রতিবাসীর গৃহিণী আসিয়া ঋষিপত্নীকে
 অপনার অলঙ্কার দেখাইবে । তাহার পরই ঋষিকে ওকালতীর পরীক্ষা দিষ্টে
 হইবে, নতুবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের দরখাস্ত করিতে হইবে ।

এক্ষণে সে সকল কথা থাক । যে বড়বাসীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে
 যাইতেছিলাম, তাঁহার উদ্যানে গাড়ী প্রবেশ করিলে, তাহা কোন ধনবান্
 ইংবাজের হইবে বলিয়া আমার প্রথমে ভ্রম হইল । পরক্ষণেই সে ভ্রম গেল ।
 বারান্দায় গুটিকত বাগ্‌লী বসিয়া আমার গাড়ী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন ।
 তাঁহাদের নিকটে গিয়া গাড়ী থামিলে, আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম ।
 আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই সাদরে আগ্রহ হইলেন ; না চিনিয়া তাঁহার
 অভিবাदन সর্বাপেক্ষে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনিই বাটীর কর্তা । তিনি শতলোক-
 সমভিবাাহারে থাকিলেও আমার দৃষ্টি বোধ হয় প্রথমেই তাঁহার মুখের প্রতি
 পড়িত । সেরূপ প্রসন্নতাবাঞ্চক ওষ্ঠ আমি অতি অল্প দেখিয়াছি । তখন
 তাঁহার বয়ঃক্রম বোধ হয় পঞ্চাশ অতীত হইয়াছিল, বৃদ্ধের তালিকায় তাঁহার নাম
 উদিতাছিল, তথাপি তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম । বোধ হয়, সেই প্রথম
 আমি বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি ।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, আমি তখন নিজে বুঝা ; অতএব সে বয়সে বৃদ্ধকে সুন্দর দেখা ধর্মসঙ্গত নহে। কিন্তু সে দিবস একপ ধর্মবিরুদ্ধ কার্য্য ঘটিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিজে বৃদ্ধ, কাজেই অধিকাংশ বৃদ্ধকেই সুন্দর দেখি। কোন মহানুভব ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না, এক্ষণে আমি তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করি।

২

বাঁচি হইতে পালানো যাইতে যাইতে যখন বাহকগণের নির্দেশমত দূর হইতে পালানো দেখিতে পাইলাম, তখন আমার বোধ হইল, যেন নর্ত্তো মেঘ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ঐ অন্ধকার মেঘমধ্যে এখনই যাইব, এই মনে করিয়া আমার কতই আশ্লাদ হইতে লাগিল। কতক্ষণে পৌছিব মনে করিয়া আবার কতই ব্যস্ত হইলাম। পরে চারি-পাঁচ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া আবার পালানো দেখিবার নিমিত্ত পাকী হইতে অবতরণ করিলাম। তখন আর মেঘ-ভ্রম হইল না, পাহাড়গুলি স্পষ্ট চেনা যাইতে লাগিল ; কিন্তু জঙ্গল ভাল চেনা গেল না। তারপর আরও দুই-এক ক্রোশ অগ্রসর হইলে তাম্রাভ অরণ্য চারিদিকে দেখা যাইতে লাগিল ; কি পাহাড়, কি তলস্ব স্থান, সমুদয় যেন মেঘদেহের ন্যায় কুক্ষিত লোমরাজি-দ্বারা সর্বত্র সমাচ্ছাদিত বোধ হইতে লাগিল। শেষে আরও কতদূর গেলে বন স্পষ্ট দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে, নিম্নে, সর্বত্র জঙ্গল, কোথাও আর ছেদ নাই। কোথাও কষিত ক্ষেত্র নাই, গ্রাম নাই, নদী নাই, পথ নাই, কেবল বন—ঘন নিবিড় বন।

পরে পালানো প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নদী, গ্রাম সকলই আছে, দূর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় নাই। পালানো পরগনায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর পাহাড়, আবার পাহাড়, যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাভীত তরঙ্গ। আবার বোধ হয় যেন, অবনীৰ অন্তরাগ্নি একদিনেই সেই তরঙ্গ তুলিয়াছিল। এখন আমার ঠিক স্মরণ হয় না, কিন্তু বোধ হয় যেন দেখিয়াছিলাম সকল তরঙ্গই পূর্বদিক্ হইতে উঠিয়াছিল। এইরূপ পাহাড় লাতেহার-গ্রামপার্শ্বে একটি আছে, আমি প্রায় নিত্য তথায় গিয়া বসিয়া

খাকিতাম। এই পাহাড়ের পশ্চিমভাগে মৃত্তিকা নাই, স্তূত্রাং তাহার অন্তরস্থ সকল স্তর দেখা যায়; এক স্তরে নুড়ি আর এক স্তরে কাল পাথর ইত্যাদি। কিন্তু কোন স্তরই সমসূত্র নহে, প্রত্যেকটি কোথাও উঠিয়াছে, কোথাও নামিয়াছে। আমি তাহা পূর্বে লক্ষ্য করি নাই, লক্ষ্য করিবার কারণ পরে ঘটিয়াছিল। একদিন অপরাহ্নে এই পাহাড়ের মূলে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে আমার একটা "নোমোকহারাম" ফরাসিস্ কুকুর আপন ইচ্ছামত তাঁবুতে চলিয়া গেল, আমি ফ্রোবে চীৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিলাম। আমার পশ্চাতে সেই চীৎকার অত্যশ্চর্য্যরূপে প্রতিধ্বনিত হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া পাহাড়ের প্রতি চাহিয়া আবার চীৎকার করিলাম, প্রতিধ্বনি আবার পূর্ব্বমত হ্রস্ব-দীর্ঘ হইতে হইতে পাহাড়ের অপর প্রান্তে চলিয়া গেল; আবার চীৎকার করিলাম, শব্দ পূর্ব্ববৎ পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া উচ্চ-নীচ হইতে লাগিল। এইবার বুঝিলাম, শব্দ কোন একটি বিশেষ স্তর অবলম্বন করিয়া যায়, সেই স্তর যেখানে উঠিয়াছে বা নামিয়াছে, শব্দও সেইখানে উঠিতে-নামিতে থাকে। কিন্তু শব্দ দীর্ঘকাল কেন স্থায়ী হয়, যতদূর পর্য্যন্ত সেই স্তরটি আছে, ততদূর পর্য্যন্ত কেন যায়, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

আর একটি পাহাড় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম, সেটি এক-শিলা, সমুদরে একখানি প্রস্তর। তাহাতে একেবারে কোথাও কণামাত্র মৃত্তিকা নাই, সমুদর পরিষ্কার বাবু বাবু করিতেছে। তাহার এক স্থান অনেক দূর পর্য্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটার উপর এক অশ্বখ গাছ জন্মিয়াছে। তখন মনে হইতেছিল, অশ্বখ বৃক্ষ বড় রসিক, এই নীরস পাষণ্ড হইতেও রস গ্রহণ করিতেছে। কিছুকাল পরে আর একদিন এই অশ্বখ গাছ আমার মনে পড়িয়াছিল; তখন ভাবিয়াছিলাম, বৃক্ষটি বড় শোষণক, ইহার নিকট নীরস পাষণ্ডেরও নিস্তার নাই।

এক্ষণে সে সকল কথা যাউক, প্রথম দিনের কথা দুই-একটি বলি। অপরাহ্নে পালানমোরে প্রবেশ করিয়া উভয়পার্শ্বস্থ পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে দেখিতে বনমধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। বাঁধা পথ নাই, কেবল এক সঙ্কীর্ণ গো-পথ দিয়া আমার পাকী চলিতে লাগিল; অনেক স্থলে উভয়-পার্শ্বস্থ লতা-পল্লব পাকী স্পর্শ করিতে লাগিল। বন-বর্ণনায় যেরূপ "শাল-তাল-তমাল-হিস্তাল"

সুনিয়ন্ত্রিত, সেরূপ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তান, হিন্দান একেগারেই নাই, কেবল শালবন, অন্য বনা গাছও আছে। শালের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছ একটিও নাই, সকলগুলিই আমাদের দেশী কবর বৃক্ষের মত, না হয় কিছু বড়, কিন্তু তাহা হইলেও জঙ্গল অতি দুর্গম, কোথাও তাহার ছেদ নাই, এই জন্য ভয়ানক। মধ্যে মধ্যে যে ছেদ আছে, তাহা অতি সামান্য।

এই অঞ্চলে প্রধানতঃ কোনের বাস। কোনেরা বনা জাতি; স্বর্বাঙ্গী, কৃষ্ণবর্ণ,—দেখিতে কুৎসিত কি রূপবান্, তাহা আমি মীমাংসা করিতে পারি না। যে সকল কোন কলিকাতায় আইসে বা চা-বাগানে যায়, তাহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও রূপবান্ দেখি নাই, বরং অতি কুৎসিত বলিয়া বোধ করিয়াছি। কিন্তু স্বদেশে কোনমাত্রই রূপবান্, অন্ততঃ আমার চোখে। বন্যেরা বনে মূন্দর, শিশুরা মাতৃকোড়ে।

৩

নিতা অপরাহ্নে আমি লাতেহার পাহাড়ের কোড়ে গিয়া বসিতাম; তাঁহাতে ঋত কার্য থাকিলেও আমি তাহা ফেলিয়া যাইতাম। চারিটা বাজিলেই আমি অস্থির হইতাম; কেন, তাহা কখনও ভাবিতাম না; পাহাড়ের কিছুই নূতন নাই; কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কোন গল্প হইবে না, তথাপি কেন আমার সেখানে যাইতে হইত, জানি না। এখন দেখি এ বেগ আমার একান্ত বহে; যে সময়ে উঠানে ছায়া পড়ে, নিতা সে সময়ে কুলবধুর মন মাতিয়া উঠে, জল আনিতে যাইবে; জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যাইবে। জলে যে যাইতে পারিল না, সে অভাগিনী; সে গৃহে বসিয়া দেখে, উঠানে ছায়া পড়িতেছে, আকাশে ছায়া পড়িতেছে, পৃথিবীর রং ফিরিতেছে; বাহির হইয়া সে দেখিতে পাইল না,—তাহার কত দুঃখ। বোধ হয়, আমিও পৃথিবীর রং-ফেরা দেখিতে যাইতাম। কিন্তু আর একটু আছে, সেই নির্জন স্থানে মনকে একা পাইতাম, বালকের ন্যায় মনের সহিত ক্রীড়া করিতাম।

যে রূপ নিতা লাতেহার পাহাড়ে যাইতাম, সেইরূপ আর একদিন যাইতে-ছিলাম, পথে দেখি, একটি যুবা বীরদর্পে পাহাড়ের দিকে যাইতেছে, পশ্চাতে

কতকগুলি স্ত্রীলোক তাহাকে মাঝিতে মাঝিতে সঙ্গ ঘাইতেছে। আমি ভাবিনাম, যখন স্ত্রীলোক মাঝিতেছে, তখন যুবক রাগ নিশ্চিত তাহের উপর হইয়াছে; আমি বাঙ্গালী, সুতরাং এ ভিঃ আর কি অনুভব করিব? এক কালে এইরূপ রাগ নিজেও কতবার করিয়াছি, তাই অন্যের বীরদর্প বুঝিতে পারি।

আমি যখন নিকটবর্তী হইলাম, তখন স্ত্রীলোকেবা নিরস্ত হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। বৃদ্ধান্ত জিজ্ঞাসা করার যবা সন্দেহ বিনিল, “আমি বাধ মাঝিতে ঘাইতেছি; এইবার আমার গুরুক বাবে মাঝিয়াছে; আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, সে বাধ না মাঝিয়া কোন্ যুগে আর জনগ্রহণ করিব?” আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতিত হইয়া বলিনাম, “চল, তোমার সঙ্গ ঘাইতেছি।” আমার অদৃষ্টনোমে বগলে বন্দুক, পায়ে বুট, পরিধানে কোট-পেন্টানুন, বাস তাঁবতে; সুতরাং এ কথা না বলিলে ভাল দেখায় না। বিশেষতঃ অনেকে আমার সাহেব বলিয়া জানে, অতএব সাহেবীধরনে নিঃসঙ্কোচচিত্তে চলিনাম।

যুবক সঙ্গ কতক দূরে গেলে সে আমার বলিল, “আমি বাধাটি স্বহস্তে মাঝিব।” আমি হাসিয়া সম্মত হইলাম। যুবা আর কোন কথা না বলিয়া চলিল; তখন হইতে নিজের প্রতি আমার কিঞ্চিৎ ভালবাসার সন্সার হইল। “স্বহস্তে মাঝিব” এই কথায় বুঝাইয়াছিল, পরহস্তে বাধ মারা সম্ভব; আমি সাহেব-বশধারী, অবশ্য বাধ মাঝিলে মাঝিতে পারি, যুবা এ কথা নিশ্চিত ভাবিয়াছিল, তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাহার পর কতক দূরে গিয়া উভয়ে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। যুবা অগ্রে, আমি পশ্চাতে। যুবক স্তম্ভে টাঙ্গি, সে একবার তাহা স্কন্ধ হইতে নামাইয়া তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তাহার পর কতক দূরে গিয়া দেখি, পাহাড়ের এক স্থানে প্রকাণ্ড বীথিকার নায় একটি গর্ভ বা গুহা আছে তাহার মধ্য-স্থানে প্রস্তবনির্মিত একটি কুঠীর, চতুঃপার্শ্বে স্থান তাহার প্রাঙ্গণস্বরূপ। যুবা সেই গর্ভের নিকট একস্থানে দাঁড়াইয়া অতি সাবধানে ব্যাঘ্র দেখাইল। প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে ব্যাঘ্র নিবীহ ভানমানুষের নায় চোখ বুজিয়া আছে, যুগের নিকট সুললিত-নবর-সংযুক্ত একটি ধাবা দর্পণের নায় ধরিয়া নিদ্রা ঘাইতেছে। বোধ হয়, নিদ্রার পূর্বে খাওয়াটি একবার চাটিয়াছিল। যে দিকে ব্যাঘ্র নিদ্রিত ছিল, যুবা সেই দিকে চলিল।

আমায় বলিল, “মাথা নত করিয়া আসুন, নতুবা প্রাঙ্গণে ছায়া পড়িবে।” তদনুসারে আমি নতশিরে চলিলাম। শেষে সে একখানি বৃহৎ প্রস্তরে হাত দিয়া বলিল, “আসুন, এইখানি ঠেলিয়া তুলি।” উভয়ে প্রস্তরখানিকে স্থানচ্যুত করিলাম। তাহার পর উহা বোরববে প্রাঙ্গণে পড়িল; শব্দে কি আঘাতে তাহা ঠিক জানি না, ব্যাথ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার পর পড়িয়া গেল—অ’র উঠিল না !

বাক্সালা ভাষা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[চব্বিশ-পরগনার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া গ্রামে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। ইহার পিতা যাদবচন্দ্র অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। যাদবচন্দ্রের চারি পুত্র—শ্যামাচরণ, নগীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশুবিদ্যালয় স্থাপিত হইলে এবং হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হইলে, ইনি পর বৎসরই উক্ত কলেজ হইতে কলিকাতা বিশুবিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সঙ্গে সঙ্গেই ইনি গভর্নমেন্ট কর্তৃক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন।

ইনি পঠদশাতেই পদ্যরচনা করিয়া মধ্যে মধ্যে ‘পুভাকর’ ও অন্যান্য সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতেন। ‘পুভাকর’-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাছে ইহার বাক্সালা লেখার হাতে-বড়ি এই সময়ে ইনি ‘ললিতা ও মানস’ নামক একখানি ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক রচনা করেন। ইহার অনেক দিন পরে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পুণ্ডিত উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’ প্রকাশিত হয়। ইহার রচিত গুণাবলীর মধ্যে প্রবান কয়েকখানির নাম এই : ‘দুর্গেশনন্দিনী,’ ‘কপালকুণ্ডলা,’ ‘বিষবৃক্ষ,’ ‘চন্দ্রশেখর,’ ‘কৃষ্ণকান্তের উইল,’ ‘সেবী চৌধুরাণী,’ ‘সীতারাম,’ ‘আনন্দমঠ,’ ‘রজনী,’ ‘যুগলাঙ্গুরীয়,’ ‘রাধারাণী,’ ‘রাজসিংহ,’ ‘ইন্দিরা,’ ‘বুণালিনী,’ ‘কমলাকান্তের দপ্তর,’ ‘লোকরহস্য,’ ‘বিবিধ প্রবন্ধ,’ ‘কৃষ্ণচরিত্র’ ও ‘ধর্মতত্ত্ব’। ইনি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ‘বঙ্গদর্শন’ নামক নূতন ধরণের একখানি উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ৫৬ বৎসর বয়সে ইনি স্বর্গারোহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক ও উপন্যাসিক।]

প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে সকল বাক্সালী ইংরেজি সাহিত্যেই পারদর্শী, তাঁহারা একজন লওনী ‘কক্ণী’

বা একজন কৃষকের কথা সহজে বুঝিতে পারেন না, এবং এতদ্ব্যতীত অনেক দিন বাস করিয়া বাঙ্গালীর সহিত কথাবার্তা কহিতে কহিতে যে ইংরেজেরা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাহারা প্রায় একখানিও বাঙ্গালা গ্রন্থ বুঝিতে পারেন না। প্রাচীন ভারতেও, সংস্কৃতে ও প্রাকৃত-ভাষায়, আদৌ বোধ হয়, এইরূপ প্রভেদ ছিল, এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষা-সকলের উৎপত্তি।

বাঙ্গালায় লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বলিতে গেলে, কিছুকাল পূর্বে দুইটি পৃথক্ ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল—একটির নাম সাধু ভাষা, অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিনু দ্বিতীয়টির কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত না। সাধু ভাষায় অপ্ৰচলিত সংস্কৃত শব্দ-সকল বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধু ভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না। লোকে বুঝুক বা না-বুঝুক, আভাঙ্গা সংস্কৃত চাহি। অপর ভাষা সে দিকে না-গিয়া, যাহা সকলের বোধগম্য তাহাই ব্যবহার করে।

গদ্য-গ্রন্থাদিতে সাধু ভাষা ভিনু আর কিছু ব্যবহার হইত না। তখন পুস্তক-প্রণয়ন সংস্কৃত-ব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে, বাঙ্গালা গ্রন্থ-প্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই; সে বাঙ্গালা লিখিতেই পারে না। যাহারা ইংরেজিতে পণ্ডিত, তাহারা বাঙ্গালাতে লিখিতে-পড়িতে না-জানা গৌরবের মধ্যে গণ্য করিতেন। সুতরাং বাঙ্গালার রচনা ফোঁটা-কাটা অনুস্মারবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই তাহাদিগের গৌরব। তাহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব। যেমন গ্রাম্য স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক বা না-বাড়ুক, ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না-হউক, দুর্বোধ্য সংস্কৃতবাহন্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল।

এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু, বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শীহীন, দুর্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষয়কের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি

ইংরেজিতে সুশিক্ষিত, ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় “আনানের ঘরের দুলাল” প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুরুতরুর মূলে জীবনবারি নিধিত হইল।

সেই দিন হইতে মাধু ভাষা এবং অপব ভাষা—দুই প্রকার ভাষাতেই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন হইতে লাগিল, ইহা দেখিয়া সংস্কৃত-ব্যবসায়ীরা আলাতন হইয়া উঠিলেন; অপর ভাষা তাঁহাদিগের বড় ধুপা।

এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার সমালোচকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। এক দল ঝাঁটি সংস্কৃতবাদী; যে গ্রন্থে সংস্কৃত-মূলক শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ ব্যবহার হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায় মূণার যোগা। অপর সম্প্রদায় বলেন, তোমাদের ও-কচুকচি বাঙ্গালা নহে; উহা আমরা কোন গ্রন্থে ব্যবহার করিতে দিব না। যে ভাষা বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্য-কার্য্য-সকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালীতে বুঝে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষা; তাহাই গ্রন্থাদিতে ব্যবহারের যোগ্য। অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক্ষণে এই সম্প্রদায়ভুক্ত।

স্থূল কথা, সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য?—যে পড়িবে তাহার বুঝিবার জন্য; না-বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য—অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না-থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য—তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই-চারিজন শব্দ-পণ্ডিতে বুনুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্থ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন; যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখনও যশ করিব না। তিনি দুই-একজনের উপকার করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে পরোপকার-কাতর খলস্বভাব বলিব। তিনি জ্ঞান-বিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া, চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে দূরে রাখেন। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থ-প্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই; জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিন্তোন্মুখি ভিন্ন

রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই ; অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মৰ্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত, ততই গ্রন্থের সফলতা। জ্ঞানে মনুষ্য-মাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সেই সর্বজনের প্রাপ্য ধনকে, তিনি এমনত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিনু আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বয়ং হইতে বঞ্চিত করিলে—তুমি সেখানে বন্ধকমাত্র।

বিষয়-অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন,—সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থ-পৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য ; সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য নিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য—সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণত্ব সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পরিকাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাগাগর বা ভূদেববাবু-পুদশিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় তাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্য সিদ্ধ না-হয়, আরও উপরে উঠিবে ; প্রয়োজন হইলে, তাহাতেও আপত্তি নাই—নিম্নয়োক্তনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিষ্কৃত করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রামা, বনা—যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিনু কাহাকেও ছাড়িবে না। তারপর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবে—কেন-না, যাহা অসুন্দর, মনুষ্য-চিন্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি বাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে ; লেখক যদি লিখিতে জ্ঞানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সেই

সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না-হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহন ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে, নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় লইবে।

ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ তাগ করিয়া এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদের বিবেচনায়, ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দশূর্য্যো পুষ্টা এবং সাহিত্যানুকারে বিভূষিতা হইবে।

মাগর-সঙ্গমে নবকুমার

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এক দিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নোকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পৰ্ণগীর্ ও অন্যান্য নাবিকদম্পত্যদিগের ভয়ে যাত্রীর নোকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল; কিন্তু এই নোকারোহীরা সঙ্গিহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝাটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল; নাবিকেরা দিগ্নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। একণে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। নোকারোহিগণ অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। এক জন প্রাচীন এবং এক জন যুবা পুরুষ, এই দুই জন মাত্র জাগ্রৎ অবস্থায় ছিলেন। প্রাচীন যুবকের সহিত কথোপকথন করিতে ছিলেন। বারেক কথাবার্তা স্বগিত করিয়া বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাঝি, আত্ম কত দূর যেতে পার্বে?” মাঝি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “বলিতে পারিলাম না।”

বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যুবক কহিলেন, “বহাশয়, যাহা অগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না—ও বুঝ কি প্রকারে বলিবে? আপনি ব্যস্ত হইবেন না।”

বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, “ব্যস্ত হব না ? বল কি, বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলেপিলে সংবৎসর খাবে কি ?”

এ সংবাদ তিনি সাগরে উপনীত হইলে পরে পশ্চাদাগত অন্য যাত্রীর মুখে পাইয়াছিলেন। যুবা কহিলেন, “আমি ত পূর্ব্বই বলিয়াছিলাম, মহাশয়ের বাটীতে অভিভাবক আর কেহ নাই—মহাশয়ের আগা ভাল হয় নাই।”

প্রাচীন পূর্ব্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন, “আস্বে না ? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। এখন পরকালের কৰ্ম করিব না ত কবে করিব ?”

যুবা কহিলেন, “যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেক্রপ পরকালের কৰ্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেক্রপ হইতে পারে।”

বৃদ্ধ কহিলেন, “তবে তুমি এলে কেন ?”

যুবা উত্তর করিলেন, “আমি ত আগেই বলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিব বড় সাধ ছিল, সেই জন্যই আসিয়াছি।” পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, “আহা ! কি দেখিলাম ! জন্মাজন্মান্তরেও ভুলিব না—

‘দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তনুী
তমালতালীবনরাজিনীলা ।
আভাতি বেনা লবণাসুরাশে-
ধীরানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা ॥’ ”

বৃদ্ধের শ্রুতি কবিতার প্রতি ছিল না, নাবিকেরা পরস্পর যে কথোপকথন করিতেছিল, তাহাই একতান-মনা হইয়া শুনিতেছিলেন।

এক জন নাবিক অপরকে কহিতেছিল, “ও ভাই, এ ত বড় কাজটা খারাবি হলো—এখন কি বার-দরিয়ায় পড়লেম, কি কোন্ দেশে এলেম, তা যে বুঝিতে পারি না।”

বক্তার স্বর অত্যন্ত ভয়কাতর। বৃদ্ধ বুঝিলেন যে, কোন বিপদ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “নাথি, কি হয়েছে ?” নাথি উত্তর করিল না। কিন্তু যুবক উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, প্রায় প্রভাত হইয়াছে। চতুর্দিক অতি গাঢ় কুজ্জ্বলিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে—আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, উপরুল, কোন দিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না। বুঝিলেন, নাবিকদিগের দিগব্রম হইয়াছে।

এক্ষণে কোন্ দিকে যাইতেছে, তাহার নিশ্চয়তা পাইতেছে না—পাছে বাহির-সমুদ্রে পড়িয়া অকুনে যাবা যায় এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াছে।

হিম-নিবারণ-জনা সমুদ্রে আবরণ দেওয়া ছিল, এজন্য নৌকার ভিত্তি হইতে আরোহীরা এ সকল বিষয় কিছুই জানিতে পারেন না। কিছু নব্য যাত্রী অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বুদ্ধকে সবিধেব কহিলেন; তখন নৌকামধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। যে কয়েকটি দ্বীনোক নৌকামধ্যে ছিল, তন্মধ্যে কেহ কেহ কথার শব্দে জাগিয়াছিল, শুনিবামাত্র তাহারা আর্দ্রনাদ করিয়া উঠিল। প্রাচীন কহিলেন, “কেনাবায় পড়। কেনাবায় পড়। কেনাবায় পড়।”

নব্য যাত্রী দ্বিধা হামিয়া কহিলেন, “কেনারা কোথা, তাহা জানিতে পারিলে এত বিপদ হইবে কেন?”

ইহা শুনিয়া নৌকারোহীদিগের কোলাহল আরও বৃদ্ধি পাইল। নব্য যাত্রী কোনমতে তাহাদিগকে স্থির করিয়া নাবিকদিগকে কহিলেন, “আশঙ্কার বিষয় কিছু নাই, প্রভাত হইয়াছে—চারি-পাঁচ দণ্ডের মধ্যে অবশ্য সূর্যোদয় হইবে। চারি-পাঁচ দণ্ডের মধ্যে নৌকা কদাচ যাবা যাইবে না। তোমরা এক্ষণে বাহন বন্ধ কর, যোতে নৌকা যথায় যায় থাক; পশ্চাৎ রোদ্র হইলে পরামর্শ করা যাইবে।”

নাবিকেরা এই পরামর্শে সম্মত হইয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত নাবিকেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। যাত্রীরা ভয়ে কণ্ঠাগতপ্রাণ। বেশী বাতাস নাই। সুতরাং তাহারা তবঙ্গান্দোলনকল্পে বড় জানিতে পারিলেন না। তথাপি সকলেই যত্ন নিকট নিশ্চিত করিলেন। পুরুষেরা নিঃশব্দে দর্শনানন্দ জপ করিতে লাগিলেন, দ্বীনোকেরা শব্দ তুলিয়া বিবিধ শব্দবিন্যাসে কানিতে লাগিল। একটি দ্বীনোক গঙ্গাসাগরে সম্মান বিসর্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই,—সে-ই কেবল কানিল না।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে অন্তরে বেনা প্রায় এক প্রহর হইল। এমন সময়ে অকস্মাৎ নাবিকেরা দরিয়ার পাঁচ-পাঁচের নাম কৌতুহিত করিয়া মহাকোলাহল করিয়া উঠিল। যাত্রীরা সকলেই হিঙ্কায়া করিয়া উঠিল, “কি। কি। মাঝি, কি হইয়াছে?” মাঝিরাও একবাক্যে কোলাহল করিয়া কহিতে

লাগিল, “রোদ উঠেছে। রোদ উঠেছে। ঐ দেখ ডাঙ্গা।” যাত্রীরা সকলেই ঔৎসুক্য-সহকারে নৌকার বাহিরে আসিয়া, কোথায় আসিয়াছেন, কি বৃষ্টি, দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সূর্য্য প্রকাশ হইয়াছে। কুষ্টিটির অক্ষাংশ হইতে দিগন্তের একেবারে বিমুক্ত হইয়াছে। বেলা প্রায় প্রহরা তৃতীয় হইয়াছে। যে স্থানে নৌকা আসিয়াছে, সে প্রকৃত মহাসমুদ্র নহে, নদীর মোহানা যাত্রা, কিন্তু তথায় নদীর বেক্রম বিস্তার, সেক্রম বিস্তার আর কোথাও নাই। নদীর এক কূল নৌকার অতি নিকটবর্তী বটে,—এমন কি, পক্ষাণ্ড হস্তের মধ্যগত, কিন্তু অপর কূলের চিহ্ন দেখা যায় না। আর যে দিকেই দেখা যায়, অনন্ত জলরাশি চক্লল রবিরশ্মিমালা-প্ৰদীপ্ত হইয়া গগনপ্রাপ্তে গগন-সহিত নিশিয়াছে। নিকটস্থ জল সচরাচর সর্কর্ম্ম নদীজলবর্ণ; কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্ৰভ। আরোহীরা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছেন; তবে গোভাগা এই যে, উপকূল নিকটে, আশঙ্কার বিষয় নাই। সূর্য্য প্রতি দৃষ্টি করিয়া দিক্ নিরূপিত করিলেন। সমুদ্রে যে উপকূল দেখিতে ছিলেন, সে সহজেই সমুদ্রের পশ্চিম তট বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। তটমধ্যে নৌকার অনতিদূরে এক নদীর খুব মন্দগামী কলধৌত-প্ৰবাহবৎ আসিয়া পড়িতেছিল। লক্ষ্যমণ্ডলে দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহৎ সৈকত-ভূমিগণ্ডে নানাবিধ পক্ষিগণ অগণিত সংখ্যায় জড়িত করিতেছিল। এই নদী এক্ষণে “বস্ত্রপূর্বের নদী” নাম ধারণ করিয়াছে।

আরোহীদিগের ক্ষুদ্রবাহক কথা সমাপ্ত হইলে, নাবিকেরা প্রস্তাব করিল যে জোয়ারের বিনষ্ট আছে—এই অবকাশে আরোহীগণ সমুদ্রস্থ সৈকতে পাকাদি সমাপন করুন, পরে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিতে পারিবেন। আরোহিবর্গ ও এই পরামর্শে সন্তোষিত হলেন। তখন নাবিকেরা তরি তীরনপ্ত করিলে আরোহীগণ অবতরণ করিয়া স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাদির পর পাকের উদ্দেশ্যে আর এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল—নৌকায় পাকের কাঠ নাই। বায়ুভয়ে উপর হইতে কাঠ সংগ্ৰহ করিয়া আনিতে কেহই স্বীকৃত হইল না। পরিশেষে সকলের উপবাসের উপক্রম দেখিয়া প্রাচীন, প্রাপ্তজ্ঞ যবাকৈ সম্বোধন করিয়া কহিলেন “বাপ, নবকুমার। তুমি ইহার উপায় না করিলে আমরা এতগুলি লোক মারা যাই।”

নবকুমার কিষ্কিৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, “আচ্ছা যাইব; কুড়ালি দাও, আর দা লইয়া এক জন আমার সঙ্গে আইস।”

কেহই নবকুমারের সহিত যাইতে চাহিল না।

“স্বাভাব সময়ে বুঝা যাবে”—এই বলিয়া নবকুমার কোমর বাঁধিয়া একাকীই কুঠারহস্তে কাষ্ঠাহরণে চলিলেন।

তীরোপরি আরোহণ করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর-মধ্যে কোথাও বসতির লক্ষণ কিছুই নাই—কেবল বন মাত্র। কিন্তু সে বন, দীর্ঘ বক্ষাবলীণোভিত বা নিবিড় বন নহে—কেবল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ মণ্ডলাকারে কোন কোন ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়া আছে। নবকুমার তন্মধ্যে আহরণযোগ্য কাষ্ঠ দেখিতে পাইলেন না; সুতরাং উপযুক্ত বৃক্ষের অনুসন্ধানে নদীতট হইতে অধিক দূর গমন করিতে হইল। পরিশেষে ছেদন-যোগ্য একটা বৃক্ষ পাইয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সমাহরণ করিলেন। কাষ্ঠ বহন করিয়া আনা আর এক বিঘম কঠিন ব্যাপার বোধ হইল। নবকুমার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না, এ সকল কর্ণে অভ্যাস ছিল না; সম্যক্ বিবেচনা না-করিয়া কাষ্ঠ আহরণে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে কাষ্ঠভার-বহন বড় ক্লেশকর হইল। যাহাই হউক, যে কর্ণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে অগ্রে কান্ত হওয়া নবকুমারের স্বভাব ছিল না, এজন্য তিনি কোনমতে কাষ্ঠভার বহিয়া আনিতে লাগিলেন। কিয়দূর বহেন, পরে ক্ষণেক বসিয়া বিশ্রাম করেন, আবার বহেন; এইরূপে আসিতে লাগিলেন।

এই হেতুবশতঃ নবকুমারের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে সমভিব্যাহারিগণ তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল; তাহাদিগের এইরূপ আশঙ্কা হইল যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। সম্ভাব্য কাল অতীত হইলে এইরূপই তাহাদিগের হৃদয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত হইল; অথচ কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তাঁরে উঠিয়া কিয়দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করে।

নৌকারোহিণী এইরূপে করনা করিতেছিল, ইত্যবসরে জনরাশিমধ্যে ভৈরব কল্লোল উথিত হইল। নাবিকেরা বুঝিল যে, জোয়ার আসিতেছে। নাবিকেরা বিশেষ জানিত যে, এ সকল স্থানে জনোচ্ছুকসকলে তটদেশে একরূপ

প্রচণ্ড তবড়াভিঘাত হয় যে, তখন নৌকাদি তীরবর্তী থাকিলে তাহা ঝণ্ডা হইয়া যায়। এজন্য তাহারা অতিব্যস্তে নৌকার বন্ধন মোচন করিয়া নদী-মধ্যবর্তী হইতে লাগিল। নৌকা মুক্ত হইতে না হইতে সমুদ্রস্থ সৈকতভূমি জলপ্লাবিত হইয়া গেল, যাত্রীগণ কেবল ত্রস্তে নৌকার উঠিতে অবকাশ পাইয়াছিল, ততুলাদি যাহা যাহা চরে স্থিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় ভাসিয়া গেল। দুর্ভাগ্যবশতঃ নাবিকের সুনিপুণ নহে, নৌকা সামলাইতে পারিল না; প্রবল জলপ্রবাহবেগে তরণী রসুলপুরের নদীর মধ্যে যাইতে লাগিল। এক জন আরোহী কহিল, “নবকুমার রহিল যে।” এক জন নাবিক কহিল, “আঃ, তোর নবকুমার কি আছে? তাকে শিয়ালে ঝাইয়াছে।”

জলবেগে নৌকা রসুলপুরের নদীর মধ্যে যাইতেছে, প্রত্যাগমন করিতে বিস্তর ক্রেশ হইবে, এইজন্য নাবিকেরা প্রাণপণে তাহার বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন কি, সেই মাঘ মাসে তাহাদিগের ললাটে শ্বেদক্ষুতি বহিতে লাগিল। এইরূপ পরিশ্রম-দ্বারা নৌকা রসুলপুরের নদীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু যেমন বাহিরে আসিল, অমনি তথাকার প্রবলতর স্রোতে উত্তরমুখী হইয়া তীরবৎ বেগে চলিল, নাবিকেরা তাহার তিলার্দ্ধ মাত্র সংঘম করিতে পারিল না। নৌকা আর ফিরিল না।

যখন জলবেগ এমনত মন্দীভূত হইয়া আসিল যে, নৌকার গতি সংযত করা যাইতে পারে, তখন যাত্রীরা রসুলপুরের মোহানা অতিক্রম করিয়া অনেক দূর আসিয়াছিলেন। এখন নবকুমারের জন্য প্রত্যাবর্তন করা যাইবে কি না, এ বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইল। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, নবকুমারের সহযাত্রীরা তাঁহার প্রতিবেশী যাত্রা, কেহই আশ্রয় নহেন। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, তথা হইতে প্রতিবর্তন করা আর এক ভাটার কর্ণ। পরে রাত্রি আগত হইবে, আর বাত্রে নৌকাচালনা হইতে পারিবে না, অতএব পরদিনের জোয়ারের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। এ কাল পর্য্যন্ত সকলকে অনাহারে থাকিতে হইবে। দুই দিন নিরাহারে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে। বিশেষ নাবিকেরা প্রত্যাগমন করিতে অসম্মত, তাহারা কথার বাধা নহে; তাহারা বালতেছে যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। তাহাই সম্ভব। তবে এত ক্রেশ-স্বীকার কি জন্য?

এরূপ বিবেচনা করিয়া যাত্রীরা নবকুমার ব্যতীত স্বদেশে গমনই উচিত বিবেচনা করিলেন। নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্র-তীরে বনবাসে বিসর্জিত হইলেন।

ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাস-নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাস্যপদ। আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে—কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্ব্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?

বঙ্কিমচন্দ্র

শিবনাথ শাস্ত্রী

[১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ-পরগনার অন্তর্গত চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে মাতুলান্নয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম হরানন্দ বিদ্যাসাগর। ইহাদের নিবাস ক্ষয়নগর-মজিলপুর। ইনি যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং পরে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হন। ইনি 'মেজ বৌ,' 'নয়নতারা' প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'নির্ব্বাসিতের বিলাপ,' 'পুষ্পমালা' প্রভৃতি কবিতাপুস্তক প্রণয়ন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইহার রচিত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' একখানি বিশেষ আবশ্যক ও জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ গ্রন্থ। ইহার 'আত্মচরিত' ও বাঙ্গালা ভাষার একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ইহার মৃত্যু হয়।]

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নৈহাটির সন্নিহিত কাঁটালপাড়া নামক গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহুদিন ইংরাজ গভর্নমেন্টের অধীনে ডেপুটি কালেক্টরের কাজ করিতেন।

বাল্যকাল হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ছগলী কলেজে পাঠ করেন। সেখানে পাঠ করিবার সময়েই তাঁহার বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সে সময়ে কবিরর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রাদুর্ভাবের কাল। তখন প্রতিভাশালী ব্যক্তিমাতেই সাহিত্য-অগতে কিছু করিতে ইচ্ছুক হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেন।

শুষ্ঠ-কবিও তখন প্রতিভার উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি অক্ষয়কুমার দত্তের উৎসাহদাতাদিগের মধ্যেও একজন ছিলেন। কিন্তু কাব্যজগতে তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, দ্বারকানাথ অধিকারী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তৎকাল-প্রচলিত রীতি-অনুসারে বঙ্কিম প্রথমে ‘প্রভাকরে’ লিখিয়া কাব্যরচনা অভ্যাস করিতেন। তখন ‘প্রভাকরে’ উত্তর-প্রত্যুত্তরে কবিতা লেখা যুবক-লেখকদিগের একটা মহা উৎসাহের ব্যাপার ছিল। এই সকল বাগ্‌যুদ্ধ “কলেজীয় কবিতাযুদ্ধ” নামে প্রথিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনের প্রারম্ভে ‘ললিতা ও মানস’ নামে একখানি পদ্যগ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন।

তিনি হুগলী কলেজ হইতে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে গমন করেন, এবং সেখান হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত বি.এ. উপাধি সর্বপ্রথম প্রাপ্ত হইয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী কর্ত্ত প্রাপ্ত হ’ন।

১৮৬৪ সালে তাঁহার প্রণীত ‘দুর্গেশনন্দিনী’ নামক উপন্যাস মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। আমরা সে দিনের কথা ভুলিব না। ‘দুর্গেশনন্দিনী’ বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; এ জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। আমরা তৎপূর্বে ‘বিজয়-বসন্ত,’ ‘কামিনী-কুমার’ প্রভৃতি কতিপয় সেকলে ‘কাদম্বরী’-ধরণের উপন্যাস, গার্হস্থ্য-পুস্তক-প্রচার-সভায় প্রকাশিত ‘হংসরূপী রাজপুত্র,’ ‘চক্‌মকির বাঘ’ প্রভৃতি কয়েকটি ছোট গল্প, এবং ‘আরব্য উপন্যাস’ প্রভৃতি কয়েকখানি উপকথা-গ্রন্থ আগ্রহের সহিত পড়িয়া আসিতেছিলাম। ‘আলালের ঘরের দুলাল’ তাহার মধ্যে একটু নূতন ভাব আনিয়াছিল। কিন্তু ‘দুর্গেশনন্দিনী’তে আমরা যাহা দেখিলাম, তাহা অগ্রে কখনও দেখি নাই। একরূপ অদ্ভুত চিত্রণ-শক্তি বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই; দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল, কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা—সকল বিষয়ে বোধ হইল যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাক্রমে হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।

অল্প দিন পরে ‘কপালকুণ্ডলা’ দেখা দিল। যে তুলিকা ‘দুর্গেশনন্দিনী’র নমনানন্দকর কমনীয়তা চিত্রিত করিয়াছিল, তাহা ‘কপালকুণ্ডলা’র গাভীর্ঘ্যবস-

পূর্ণ ভাব সৃষ্টি করিল। লোকে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে ‘মৃণালিনী,’ ‘চন্দ্রশেখর,’ ‘বিষবৃক্ষ,’ ‘কৃষ্ণকান্তের উইল,’ ‘আনন্দমঠ,’ ‘দেবী চৌধুরাণী,’ ‘কমলাকান্তের দপ্তর,’ ‘সীতারাম,’ ‘রাজসিংহ’ প্রভৃতি আরও অনেকগুলি উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় ঔপন্যাসিকদিগের শীর্ষস্থান প্রাপ্ত হইলেন।

বঙ্কিমবাবু স্ব-প্রণীত গ্রন্থসকলে এক নূতন বাঙ্গালা গদ্য লিখিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। তাহা এক দিকে বিদ্যাসাগরী বা অক্ষরী ভাষা ও অপর দিকে আলালী ভাষার মধ্যগা। ইহাতে অসম্ভট হইয়া আমার পূজ্যপাদ মাতুল হারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত ‘সোমপ্রকাশে’ বঙ্কিমবাবু ও তাঁহার অনুকরণকারীদিগের নাম “শবপোড়া-মড়াদাহের দল” রাখিলেন। অভিপ্রায় এই, যাহারা “শব” বলে তাহারা “দাহ” বলে, যাহারা “মড়া” বলে তাহারা তৎসঙ্গে “পোড়া” বলে—কেহই “শবপোড়া” বা “মড়াদাহ” বলে না। তাঁহার মতে বঙ্কিমী দল ঐরূপ ভাষাব্যবহার-দোষে দোষী। আমরা, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদল, সোমপ্রকাশের পক্ষাবলম্বন করিলাম এবং বঙ্কিমী দলকে “শবপোড়া-মড়াদাহের দল” বলিয়া বিক্রপ করিতে আরম্ভ করিলাম। বঙ্কিমের দল ছাড়িবেন কেন? তাহারা সোমপ্রকাশের ভাষাকে “ভট্টাচার্য্যের চাণা” নাম দিয়া বিক্রপ করিতে লাগিলেন।

১৮৭১ সালে ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের প্রতিভা আর এক আকারে দেখা দিল। প্রতিভা এমনি জিনিষ, ইহা যাহা-কিছু স্পর্শ করে, তাহাকেই সজীব করে। বঙ্কিমের প্রতিভা সেইরূপ ছিল। তিনি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হইতে গিয়া একরূপ মাসিক পত্রিকার সৃষ্টি করিলেন, যাহা প্রকাশমাত্র বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে স্থান পাইল। তাহার সকলই যেন চিত্তাকর্ষক, সকলই যেন মিষ্ট। বঙ্গদর্শন দেখিতে দেখিতে উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় লোক-চক্ষুর সমক্ষে উঠিয়া পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, তখন তিনি রুসোর সাম্যতাবের পক্ষ, উদারনৈতিকের অগ্রগণ্য, এবং বেগম ও মিলের হিতবাদের পক্ষপাতী। তিনি তাঁহার অমৃতময়ী ভাষাতে সাম্য-নীতি এইরূপ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন যে, দেখিয়া যুবকদের মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বঙ্গদর্শন বহুদিন থাকিল না। বঙ্কিমবাবু বিষয়াস্তরে ব্যাপ্ত

হওয়াতে তাহা হস্তান্তরে গেল ও সেই সঙ্গে তাহার আকর্ষণও গেল এবং ক্রমে ভিরোভাব হইল।

আমাদের দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের সাধারণ নিয়মানুসারে বক্তিমের প্রতিভার শক্তি পঁয়তাল্লিশ বৎসরের পর যেন মন্দীভূত হইয়া আসিল। তৎপরে তিনি যে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের ভাষা ও চিত্রণ-শক্তির সেই পূর্বকার উন্মাদিনী শক্তি নাই, সে সজীবতা নাই। তাহার দৃষ্টিও সমৃদ্ধ হইতে পঞ্চাং দিকে পড়িতে লাগিল।

শেষ কর বৎসর তিনি ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাতে আপনাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। স্মৃতিতে পাওয়া যায়, এই অবস্থাতে তিনি আপনার প্রকাশিত 'সাম্য' নামক গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাহার শেষ-প্রচারিত এই নব-ধর্মের প্রধান লক্ষণ ছিল বৃত্তি-নিচয়ের সামন্ত্য, এবং শ্রীকৃষ্ণই তাহার আদর্শ পুরুষ। এই নব-ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্মতত্ত্ব-বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন।

এ দিকে তিনি গভর্নমেন্টের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে সর্বপ্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া রাজপ্রসাদের চিহ্ন-স্বরূপ "রায় বাহাদুর" ও "সি.আই.ই." উপাধি প্রাপ্ত হ'ন। ধরে-পরে এইরূপে সম্মানিত হইয়া ১৮৯৪ সালের ৮ই এপ্রিল দিবসে তিনি ভবধাম পরিত্যাগ করেন। বক্তিমবাবু প্রতিভার জ্যোতিতে দেশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

দিল্লীনগরী

রমেশচন্দ্র দত্ত

[কলিকাতা রামবাগানের পুণ্ডিত দত্ত-পরিবারে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার পাঠ সমাপ্ত করিয়া ইনি বিহারীলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিলাত যাত্রা করেন। তথা হইতে আই.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি সরকারী কর্মে বৃত্তী হ'ন। ইনি কর্তৃদক্ষতা-গুণে বিভাগীয় কমিশনার পর্যন্ত হইয়াছিলেন; তৎপরে অবসর গ্রহণ করিয়া বরোদার রাজ-মন্ত্রী পদ গ্রহণ করেন। পুথন যৌবনে ইনি ইংরাজী রচনায় জুতিত

অর্থন করিয়াছিলেন, পরে বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহে বাঙ্গালা রচনায় হস্তক্ষেপ করেন এবং একাদিক্রমে ‘বঙ্গবিজেতা,’ ‘মাধবীকঙ্কণ,’ ‘রাজপুত্র জীবন-সন্ধ্যা,’ ‘মহারাষ্ট্র জীবন-পুতাত,’ ‘সংসার,’ ‘সমাজ’ পুস্তক পুস্তক রচনা করিয়া যশস্বী হন। নানাভাবে ইহার দেশপ্ৰীতির সুগভীর পারিচয় পাওয়া যায়।]

দিল্লী অদ্য মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। আরংজীব স্বয়ং জাঁকজমক-প্রিয় ছিলেন না, কিন্তু রাজকার্য্য-সাধনায় সময়ে সময়ে জাঁকজমক আবশ্যক, তাহা বিশেষরূপে জানিতেন। অদ্য শিবজী দরিদ্র মহারাষ্ট্র দেশ হইতে বিপুল-অর্থ শালী মোগল-রাজধানীতে আগিয়াছেন; মোগলদিগের ক্ষমতা, সম্পত্তি ও অর্থের প্রাচুর্য্য দেখিলে শিবজী আপন হীনতা বুঝিতে পারিবেন, মোগলদিগের লহিত যুদ্ধের অসম্ভাবিতা বুঝিতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যে আরংজীব অদ্য প্রচুর জাঁকজমকের আদেশ দিয়াছিলেন। সম্রাটের আদেশে দিল্লীনগরী উৎসবের দিনে কুলললনার ন্যায় অপূর্ববেশ ধারণ করিয়াছে।

শিবজী ও রামসিংহ একত্র রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। পথ দিয়া অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক গমনাগমন করিতেছে, নগর লোকারণ্য হইয়াছে। বণিকগণ বাজারে দোকানে বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য রাশি করিয়া রাখিয়াছে, —উৎকৃষ্ট বস্ত্র, বহুমূল্য স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার, অপূর্ব খাদ্যসামগ্রী ও অপৰ্য্যাপ্ত গৃহানুকরণদ্রব্য দেখিতে দেখিতে শিবজী রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। কোথাও গৃহের উপর নিশান উড়িতেছে, কোথাও সুপরিচ্ছদ গৃহস্থেরা বারান্দায় বসিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা গবাক্ষ দিয়া কুলকামিনীগণ প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র যোদ্ধাকে দেখিতেছে। পথে অসংখ্য শকট, শিবিকা, হস্তী ও অশ্ব,—রাজা, মনসব্দার, সেখ, আমীর ও ওমরাহগণ সর্বদা গমনাগমন করিতেছেন। অশ্বারোহীগণ তীব্রবেগে যেন নগর কাঁপাইয়া যাইতেছে; সুন্দর অলঙ্কার ও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া ঝুঁড় নাড়িতে নাড়িতে গজেন্দ্রগমনে গজেন্দ্রগণ চলিয়া যাইতেছে; শিবিকাবাহকগণ ছহকার-শব্দে যেন আরোহীর পদমৰ্য্যাদা প্রচার করিয়া চলিয়া যাইতেছে। শিবজী এরূপ নগর কখনও দেখেন নাই, কোথায় পুনা বা রায়গড়।

যাইতে যাইতে রামসিংহ দূরে তিনটি শ্বেত গম্বুজ দেখাইয়া বলিলেন, “ঐ দেখুন, জুম্মা মসজীদ। সম্রাট শাজিহান জগতের অর্থ একত্র করিয়া ঐ

উন্নত প্রশস্ত মসজীদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ওরূপ মসজীদ জগতে আর নাই।”

শিবজী বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে দেখিলেন, রক্তবর্ণ প্রস্তরে নিৰ্ম্মিত মসজীদের প্রাচীর বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া শাভা পাইতেছে, তাহার উপর সুন্দর শ্বেত-প্রস্তর-বিনিৰ্ম্মিত তিনটি গম্বুজ ও দুই দিকে দুই মিনার যেন গগন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে।

এই অপরূপ মসজীদের সম্মুখেই রাজপ্রাসাদ ও দুর্গের বিস্তীর্ণ রক্তবর্ণ প্রস্তর-বিনিৰ্ম্মিত প্রাচীর দৃষ্ট হইল। দুর্গের পশ্চাতে যমুনা নদী, সম্মুখে বিস্তীর্ণ রাজপথ শব্দপূর্ণ ও লোকারণ্য। সেই স্থানের ন্যায় সমারোহপূর্ণ আর একটি স্থানও ভারতবর্ষে ছিল না, জগতে ছিল কি না সন্দেহ। দুর্গের প্রাচীরের উপর শত শত নিশান বায়ুপথে উড়িতেছে, যেন জগতে মোগল-সম্রাটের ক্ষমতা ও গৌরব প্রকাশ করিতেছে। দুর্গ দ্বারে একজন প্রধান মন্সবদারের প্রশস্ত শিবির, মন্সবদার দুর্গ দ্বার রক্ষা করিতেছেন। দুর্গের বাহিরে সেনা রেখায় রেখায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বন্দুকের কিরীচ-শ্রেণী সূর্যালোকে ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে, প্রত্যেক কিরীচ হইতে রক্তবস্ত্রের নিশান বায়ুমাৰ্গে উড়িতেছে। দুর্গ-সম্মুখে অসংখ্য লোক অসংখ্য প্রকার দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিতে আসিয়াছে, দুর্গ-প্রাচীর হইতে মসজীদ-প্রাচীর পর্য্যন্ত সমস্ত পথ শব্দপূর্ণ ও লোকপূর্ণ। অশ্বারোহী, গজারোহী ও শিবিকারোহী, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান পদাভিষিক্ত পুরুষগণ বহুলোকে সমন্বিত হইয়া বহু-সমারোহে সর্বদাই দুর্গ দ্বারের ভিতরে যাইতেছেন বা বাহিরে আসিতেছেন। তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ-শোভায় নয়ন ঝলসিয়া যাইতেছে, লোকের কলরবে কণ বিদীর্ণ হইতেছে। সকল শব্দকে নিমগ্ন করিয়া মধ্যে মধ্যে দুর্গের মধ্য হইতে কামানের শব্দ নগর কম্পিত করিতেছে ও রাজাধিরাজ আলম্‌গীরের অথাৎ জগতের অধিপতির ক্ষমতাবর্ত্তা জগৎ-সংসারে প্রচার করিতেছে। বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে অনেকক্ষণ এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া অবশেষে শিবজী রামসিংহের সহিত দুর্গ দ্বার অতিক্রম করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিয়া শিবজী যাহা দেখিলেন, তাহাতে আরও বিস্মিত হইলেন। চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ “কারখানা”য় অসংখ্য শিল্পকারগণ রাজ-ব্যবহার্য্য নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে—অপূর্ব সুবর্ণ ও রৌপ্য-খচিত বস্ত্র, মলমল, মসলিন

বা ছিট ; বহুমূল্য গালিচা, চন্দ্রাতপ, তাম্বু বা পর্দা ; সুন্দর পরিধেয় উষ্ণীষ, শাল বা গাত্রাবরণ ; অপরূপ সুবর্ণ ও মণিমানিক্যের বেগম-পরিধেয় অলঙ্কার ; সুন্দর চিত্র, সুন্দর কারুকার্য, সুন্দর শ্বেত-প্রস্তরের গৃহানুকরণ-দ্রব্য ; রাশিরাশি নীল, পীত, রক্তবর্ণ বা হরিষ্মণ প্রস্তরের নানারূপ খেলনা-দ্রব্য ; কত বর্ণনা করিব । ভারতবর্ষে যত অপূর্ব শিল্পকার ছিল, সম্রাট-আদেশে তাহারা মাসিক বেতন পাইয়া প্রতিদিন দুর্গে কার্য্য করিতে আসিত । সম্রাট রাজকার্য্যার্থ বা নিজ প্রয়োজনের জন্য যে-কোন বস্তু আবশ্যক বোধ করিতেন, বিলাসপ্রিয়া বেগমগণ যতরূপ অপূর্ব দ্রব্য আদেশ করিতেন, প্রাসাদবাগীদিগের যত প্রকার সামগ্রী প্রয়োজন হইত, তৎসমস্তই এই স্থানে প্রস্তুত হইত ।

শিবজী এ সমস্ত দেখিবার সময় পাইলেন না । অসংখ্য লোকের মধ্য দিয়া “ দেওয়ান-আম ” নামক উন্নত প্রশস্ত রক্তবর্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাসাদের নিকট আসিলেন । সম্রাট সচরাচর এই স্থানে সভার অধিবেশন করিতেন, কিন্তু অদ্য যেন শিবজীকে প্রাসাদের সমস্ত গৌরব দেখাইবার জন্যই সুন্দর শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত, নানারূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এবং জগতে অতুল্য “ দেওয়ান-খাস ” নামক প্রাসাদে সভার অধিবেশন করিয়াছিলেন । শিবজী সেই স্থানে যাইয়া দেখিলেন, প্রাসাদের ভিতর রত্ন-মাণিক্য-বিনির্ম্মিত সূর্য্যরশ্মি-প্রতিধাতী ময়ূর-সিংহাসনের উপর সম্রাট আরংজীব উপবেশন করিয়া আছেন । সম্রাটের চারিদিকে রৌপ্য-নির্ম্মিত রেল, রেলের বাহিরে ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য রাজা, মন্সব্দার, ওমরাহ ও সেনাপতিগণ নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ।

রামসিংহ শিবজীর পরিচয়-দান করিয়া রাজসদনে উপস্থিত হইলেন ।

মধুসূদনের বাল্যকাল

যোগীন্দ্রনাথ বসু

ডায়বও হারবার মহকুমায় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যোগীন্দ্রনাথ বসুর জন্ম হয় । ইনি শিশুদিগের জন্য অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ‘ ভারতবর্ষের মানচিত্র ’ নামক কবিতাটিই

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'পৃথ্বীরাজ' নামক বৃহৎ কাব্য রচনার পর ইনি 'কবিতৃষণ' উপাধি লাভ করেন। কিন্তু 'মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত' ই ইহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করেন।

উচ্চাভিলাষই মহত্বের ভিত্তিভূমি। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত জ্ঞান, ধর্ম, অর্থ কোন বিষয়েই মনুষ্য শ্রেষ্ঠতা-লাভে সমর্থ হয় না। মহত্ব-বীজ এই উচ্চাভিলাষ বাল্য হইতেই মধুসূদনের প্রকৃতিতে লক্ষিত হইত। সমকালবর্তী লেখকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইব, পূর্ণ বয়সে ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, এবং যতদিন না তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, ততদিন তিনি নিরস্ত হন নাই। তাঁহার বাল্যের উচ্চাভিলাষ, তাঁহার বুদ্ধিমতী জননীর উৎসাহ-বাক্যে এবং তাঁহার পিতার আদর্শে সম্যক্ পুষ্টলাভ করিয়াছিল। তাঁহার জননী অতি সম্ভ্রান্ত গৃহের দুহিতা ছিলেন। পিতৃকুলের সম্মানে এবং কৃতী স্বামীর ও প্রতিভাবান্ পুত্রের গৌরবে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করিতেন। সাধারণ নারীগণের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইত না। মহত্বংশে জন্মগ্রহণ করিলে যে মহদভিলাষ মনুষ্যের হৃদয়ে স্বভাবতঃ উদিত হইয়া থাকে, জাহ্নবী দাসী মেধাবী পুত্রের হৃদয়ে তাহা বদ্ধমূল করিবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিতেন। মধুসূদনের পিতাও তাঁহার সমসাময়িক-দিগের মধ্যে একজন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যবহারজীব ছিলেন। পিতার সম্মত ও কুতিত্ব বালক মধুসূদনকে মহত্বলাভে প্রণোদিত করিত। সেই জন্য লেখাপড়া-সম্বন্ধে তাঁহাকে, কোন দিন, কাহারও তাড়না সহ্য করিতে হয় নাই। নিজের উচ্চাভিলাষ ও আন্তরিক বিদ্যানুরাগ গুণেই তিনি বঙ্গদেশের একজন অগ্রগণ্য বিদ্বান্ হইয়াছিলেন। কি পঠদশায়, কি শিক্ষকতা-কার্য্যের সময়ে, কি ব্যারিষ্টার-অবস্থায়, কখনই মধুসূদন বিদ্যোপার্জন-সম্বন্ধে অযত্ন প্রকাশ করেন নাই। ছাত্রাবস্থায় হিন্দু কলেজে থাকিতে তিনি যেমন যত্নসহকারে গ্রন্থাভ্যাস করিতেন, মাদ্রাজে শিক্ষকতা-কার্য্য করিবার সময়েও তেমনই করিতেন। মাদ্রাজে থাকিতে তেলুগু, তামিল, হিব্রু ও সংস্কৃত ভাষা এবং ফ্রান্সে থাকিতে ফরাসী, জার্মান ও ইতালীয় প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার জন্য তিনি দেহ-মন নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয় এবং লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, যখনই যেখানে সুবিধা পাইয়াছিলেন, তখনই সেখান হইতে

গ্রন্থরাশি আনাইয়া, নিজের জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।* রোগ, দরিদ্রতা, পারিবারিক অশান্তি প্রভৃতি যে সকল বিষয় মনুষ্যের জ্ঞান-লালসা বিস্তৃত করিয়া দেয়, মধুসূদনের জীবনে তাহার কোনটিরই অভাব ছিল না ; কিন্তু নিত্যপ্রবহণশীল উৎসের ন্যায় তাঁহার জ্ঞানার্জনস্পৃহা সংসারের কঠোর নিদাঘ-তাপের মধ্যেও, তাঁহার হৃদয় হইতে নিরন্তর নিঃসৃত হইত। এই জ্ঞানার্জন-স্পৃহা এবং কাব্যানুরক্তি-সম্বন্ধে তিনি তাঁহার কোন সম্ভাষ্য বন্ধুকে এইরূপ লিখিয়া-ছিলেন,—

“এ ধরার কর্ণভার মন বেদনিলে,
কর-কর-পদ্য-স্পর্শে সারে সে বেদনা
বরদার দয়াসম? হাত বুলাইলে
জননী ব্যাধিত দেহে, কোথা ব্যথা থাকে?
এ কথা তোমার কাছে অবিদিত নহে।”

সংসার-যন্ত্রণায় নিপীড়িত-হৃদয় যে বাগ্‌দেবীর “কর-পদ্য-স্পর্শে” সমস্ত যন্ত্রণা বিস্মৃত হইতে পারে, মধুসূদন আর-জীবনে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদন বহু ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার সমস্ত শিক্ষার ও অধ্যয়নের নিকর্ষ, তাঁহার কাব্যানুরক্তি। নানা-দেশীয় কাব্য-শাস্ত্রের অনুশীলনে তাঁহার সমকক্ষ কোন ব্যক্তি বঙ্গদেশে বোধ হয় এ পর্য্যন্ত অনুগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার জীবনের অন্যান্য অনেক গুণের ন্যায় এই কাব্যানুরাগও তাঁহার জননীর প্রদত্ত শিক্ষা হইতে পরিবদ্ধিত হইয়াছিল। সে সময়ে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার বড় প্রচলন ছিল না। কিন্তু জাহ্নবী দাসী তৎকালেও লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি রামায়ণ, মহাভারত এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি বাঙ্গালা কাব্যসমূহ অত্যন্ত যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল, পঠিত গ্রন্থের অনেক অংশ তিনি মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। মেধাবী মধুসূদন, আট-দশ বৎসর বয়সের সময়ে, মাতাকে ও বাটীর অন্যান্য প্রাচীন মহিলাদিগকে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং মাতার দৃষ্টান্ত-অনুসারে তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন। কোন সহৃদয় ব্যক্তি বলিয়াছেন, মনুষ্য মাতৃস্তনদুগ্ধের সঙ্গে যাহা শিক্ষা করে, জীবনে কখনও

তাহা বিস্মৃত হইতে পারে না। মধুসূদনের জীবনে এ কথা অতি সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বহু ভাষায় এবং বহু গ্রন্থে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও, মাতৃ-প্রদত্ত শিক্ষার ফলে, বাল্যকালে রামায়ণ ও মহাভারত-সম্বন্ধে মধুসূদনের অনুরাগের কখনও খর্ব্বতা হয় নাই। পূর্ণবয়সে যখন সংস্কৃত, পারসীক, লাতিন, গ্রীক, ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান, এবং ইতালীয়ান—পৃথিবীর এই আটটি প্রধান ভাষার রত্নভাণ্ডার তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হইয়াছিল, এবং যখন তিনি বাল্যীকি, হোমর, ভার্জিল, দান্তে, মিল্টন প্রভৃতি মহাকবিদিগকে সুহৃদরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখনও তিনি তাঁহার শৈশবের সহচর, দরিদ্র কাশীরাম দাস ও কৃতিবাসকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাঁহার মাদ্রাজ হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার কোন আত্মীয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখেন, তিনি একখানি কাশীদাসী মহাভারত মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছেন। মধুসূদন বেশভূষায় এবং আহার-ব্যবহারে সাহেবের ন্যায় থাকিতেন; সুতরাং তাঁহার আত্মীয় ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, “একি, সাহেব লোকের হাতে মহাভারত।” মধুসূদন হাসিয়া বলিলেন, “সাহেব আছি বলিয়া কি বইও পড়িতে দিবে না? রামায়ণ, মহাভারত আমার কেমন ভাল লাগে, না পড়িয়া থাকিতে পারি না।”

মাদ্রাজে অবস্থান-কালে, যখন চর্চার অভাবে, তিনি বাল্যকালে ভাষা বিস্মৃত হইতেছিলেন, তখনও তিনি কলিকাতা হইতে রামায়ণ ও মহাভারত আনাইয়া, যন্ত্রের সহিত পাঠ করিতেন। কেবল রামায়ণ, মহাভারত নহে—বাল্যকালে ভাষার অনেক প্রাচীন কাব্যই তিনি অতি সমাদরের সহিত পাঠ করিতেন। চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে তিনি তাঁহার স্বদেশীয় কবিগণের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শিষ্টাচারের জন্য নয়; তাহা প্রকৃতই তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধার ও অনুরাগের ফল।

রামায়ণ ও মহাভারত-পাঠের সহিত মধুসূদনের ভবিষ্যৎ জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান আছে। যে মহাপ্রদ্বয় শত শত বৎসর অবধি হিন্দু নরনারী-দিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে, এবং সহস্র সহস্র ভারতসন্তান যাহা হইতে আপন আপন ভাবী মহত্ত্বের বীজ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা মধুসূদনেরও প্রকৃতি-দত্ত প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বাল্যে পুনঃপুনঃ রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়া, তিনি তাঁহার কবিশক্তি-বিকাশের সহায়তা লাভ

করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় আরও কত ভারতীয় কবি যে এরূপ সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। লোকের বিশ্বাস, কল্পতরুর নিকট প্রার্থনা করিলে, অতীষ্ট বর প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারত ভারত-সন্তানের পক্ষে সেই কল্পতরু। আমাদিগের জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে এই দুই গ্রন্থ যেরূপ সহায়তা করিয়াছে, আর কোন দেশের কোন কাব্য সেরূপ করিয়াছে কি না সন্দেহ। মধুসূদনের প্রকৃতি-দত্ত কবিশক্তি-বিকাশের পক্ষে যে সকল সামগ্রী অনুকূলতা করিয়াছিল, রামায়ণ ও মহাভারত তাহাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষে উল্লেখের উপযুক্ত। কিন্তু এই রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ-সম্বন্ধে বাল্মীকির ও বেদব্যাসের অপেক্ষা কৃত্তিবাসের ও কাশীদাসেরই নিকট মধুসূদন সমধিক ঋণী ছিলেন। মহাম্মদের সৃষ্ট চরিত্র হইতে যদিও তিনি তাঁহার কাব্যসমূহের ব্যক্তি নির্বাচন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভাষাজ্ঞান, বর্ণনাট্যপুণ্য এবং পুরাণান্তর্গত বিষয়-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কৃত্তিবাস এবং কাশীদাস হইতেই লব্ধ। মেঘনাদবধের ও বীরেন্দ্রনার অনেক স্থলেই, সেই জনা, ইহাদিগের প্রভাব লক্ষিত হইবে।

মধুসূদনের কাব্যানুরক্তির অপর কারণ তাঁহার বাল্য-শিক্ষা। শৈশবে গ্রামস্থ পাঠশালায় তিনি যে শিক্ষকের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতেন, তিনি পারঙ্গীক ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন; এবং বাঙ্গালা, সংস্কৃতও, শুনিতে পাওয়া যায় ইংরাজীও, অল্প অল্প জানিতেন। ছাত্রদিগকে তিনি অনেক পারঙ্গীক ভাষার কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন এবং তাঁহাদিগকে সেই সকল কবিতা কণ্ঠস্থ করিতে বলিতেন। তিনি নিজে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন কি না, তাহা জানিতে পারা যায় না; তবে তিনি যে কবিতানুরাগী ছিলেন, তাহা তাঁহার ছাত্রদিগের হৃদয়ে কাব্যানুরাগ সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা-দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে। শিক্ষক মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে মধুসূদন, অল্প বয়সে, অনেক পারঙ্গীক কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়া-ছিলেন, এবং সমবয়সীদিগকে তাহা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময়েও তিনি পারঙ্গী “গজল” গান করিয়া সঙ্গীদিগকে আমোদিত করিতেন।

মধুসূদনের কাব্যানুরক্তির অপর একটি কারণ তাঁহার সঙ্গীতপ্রিয়তা। বাল্য হইতে, কবিতার ন্যায়, গীতবাদ্যের দিকেও তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার পিতার ও পিতৃব্যগণের ন্যায় তিনিও আগমনী ও বিজয়া-সঙ্গীত শুনিতে

শুনিতে গলদশ্রুত হইতেন। অবস্থার কোনও রূপ পরিবর্তনে তাঁহার সঙ্গীতানুরাগের হ্রাস হয় নাই। তাঁহার ব্যারিষ্টার হইয়া ইংলও হইতে প্রত্যাগমনের পর, কোন ব্রাহ্মণ একবার তাঁহার নিকট একটি মোকদ্দমা-সম্বন্ধে পরামর্শ জানিবার জন্য গিয়াছিলেন। মধুসূদনের সঙ্গে ব্রাহ্মণের পূর্ব-পরিচয় ছিল এবং তিনি জানিতেন যে ব্রাহ্মণ অতি সুন্দর “সখীসংবাদ” গান করিতে পারেন। মধুসূদন মোকদ্দমার কথা রাখিয়া, সখীসংবাদ শুনিবার জন্য ব্রাহ্মণকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, এবং তাঁহার নিকট ক্রমানুয়ে দশ-পনরটি সখীসংবাদ শুনিয়া, বিনা অর্থ গ্রহণে তাঁহার মোকদ্দমা-সম্বন্ধে উপযুক্ত পরামর্শ দান করিলেন।

প্রকৃতি আপন নীচব ভাষায় যে শিক্ষা প্রদান করেন, পৃথিবীর কোন কাব্য বা কোন উপদেশের উপদেশ হইতে সে শিক্ষা লাভ করিতে পারা যায় না। প্রকৃতির নিতানবীন মুখশ্রী যে কত অপ্রেমিককে প্রেমিক ও কত অকবিকে কবি করিতেছে, তাহাদের সংখ্যা নাই। সেইজন্য, মধুসূদনের শৈশবের অন্যান্য অনুকূল উপাদানের ন্যায়, তাঁহার জন্মভূমির কথারও উল্লেখ আবশ্যিক। প্রকৃতির অতি সৌন্দর্য্যময় নিকেতনে মধুসূদনের জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ি অতি সুকোমল গ্রাম্য-শোভায় পূর্ণ। নদী, প্রান্তর এবং বৃক্ষলতা প্রভৃতি যে সকল উপাদান লইয়া বস্তুর পরীগ্রামের সৌন্দর্য্য, তাহাদের কোনটাই সেখানে অভাব নাই। নির্মল-সলিলা কপোতাক্ষী, ইহার তিন দিক্ বেষ্টন করিয়া, ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী, শাখায় শাখায় সম্বদ্ধ হইয়া, স্থানে স্থানে তাহার উপর অবনত হইয়া পড়িয়াছে। শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ভূমি, নদীর তট হইতে জলের রেখা পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। নগরের কৃত্রিমতার সঙ্গে সেখানকার কোন সম্বন্ধ নাই। প্রকৃতি অতি সরল, গ্রাম্য মূর্তিতে সেখানে বিরাজিত। নদীজলে কুলললনাগণ স্নানাবগাহন করিতেছেন; ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানাপ্রকারের তরলীসমূহ নদীবক্ষে গমনাগমন করিতেছে; কৃষকবনিতাগণ কলসীকক্ষে নদীতটে দণ্ডায়মান হইয়া একদৃষ্টিতে তাহাদিগের পানে চাহিয়া রহিয়াছে; রাখালবালকগণ পশুপাল ছাড়িয়া, ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছে; দেখিলে, নগরের কোলাহল বিস্মৃত হইয়া, সেই সরল, গ্রাম্য সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া যাইতে হয়। কপোতাক্ষীর পশ্চিম

দিকে দূরপ্রসারিত শ্যামল প্রান্তর। নদীর উভয়তটে বৃক্ষলতার অন্তরালে স্থানে স্থানে কৃষকদিগের কুটীর; মধ্যে মধ্যে দুই একটি প্রাচীন বট বা অশ্বথ বৃক্ষ। উদ্যানজ তরুসমূহের ঘনগনিবেশে গ্রামটী মধ্যাহ্নকালেও ছায়াপূর্ণ। মধুসূদনের কণ্ঠস্বর নীরব হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার জন্মভূমির বিহগগণের সঙ্গীতের বিরাম হয় নাই। পাপিয়ার গগনভেদী কণ্ঠস্বরে এখনও তাহা পূর্বের ন্যায় দিবারাত্রি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কত অযত্নসম্মত তরুলতা উদ্যানজ বৃক্ষরাজির গঞ্জে গম্বিলিত হইয়া, গ্রামটীকে আরন্যাশোভায় অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। মধুসূদনের পৈত্রিক বাসভবনের অদূরবর্তী নদীতটে দণ্ডায়মান হইয়া, একবার জ্যোৎস্নালোকে, পাপিয়ার দিগন্তপ্লাবী সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে, নিস্তব্ধ গ্রামটীর এবং ধীরবাহিনী কপোতাক্ষীর দিকে দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিলে, অতি নীরস হৃদয়ও ভাবে পূর্ণ হয় এবং গ্রামটীকে স্কটের ভাষায় “কবিপুত্রের উপযুক্ত ধাত্রী” (meet nurse for a poetic child) বলিতে ইচ্ছা করে। নিদাঘের জ্যোৎস্নালোকে যিনি কপোতাক্ষীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, মধুসূদন যে তাহাকে দুঃখশ্রোতের সহিত তুলনা করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত হয় নাই।

খ্রীষ্টবর্ষ-গ্রহণের পর মধুসূদন তাঁহার জীবনের অতি সামান্য অংশই সাগরদাঁড়িতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বদেশের মনোহারিণী মুক্তি তাঁহার হৃদয়ে চিরজাগরুক ছিল। বাল্যাবস্থায় কোথায় তিনি ক্রীড়া করিতেন, কোথায় বেড়াইতে ভালবাসিতেন, পূর্ণবয়সে তাহা তাঁহার স্মৃষ্টিরূপে স্মরণ ছিল। সাগরদাঁড়ির রাস্তাগুলি পাকা করিয়া বাঁধাইবেন, কপোতাক্ষীতে একটি অবতরণিকা প্রস্তুত করাইয়া দিবেন এবং তাহার কূলে “মাইকেলোদ্যান” নামক একটি উদ্যান নির্মাণ করাইয়া, সেখানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবেন, এই তাঁহার বাসনা ছিল। কিন্তু তাঁহার জীবনের অন্যান্য সহস্র অভিনাঘের ন্যায় ইহার কোনটাই পূর্ণ হয় নাই। বহুকাল প্রবাসের পর, একবার সাগরদাঁড়িতে আসিয়া, তিনি বলিয়াছিলেন, “এই মধুমাখা স্থানে আসিলে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোন স্থানে গেলে সেরূপ পাওয়া যায় না।” আর একদিন কপোতাক্ষীর কূলে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিয়াছিলেন, “কপোতাক্ষ, যে তোমার তীরে পাতার কুটীরে বাস করিতে পায়, সেও পরম

সুখী।” সুদূর ফরাসী ভূমি হইতে তিনি “কপোতাক্ষ”কে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

“সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্র-ধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কাণ আমি লাগতির ছলনে।
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদদলে,
কিস্ত এ স্নেহের তৃষা মিটে কার জলে?
দুঃখশ্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।”

জননী-জন্মভূমির মোহিনী মত্তি তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ গভীর ভাব অঙ্কিত করিয়াছিল, ইহা হইতেই তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে।

লোকভয়

অশ্বিনীকুমার দত্ত

[১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বরিশাল জেলার বাটাজোড় গ্রামে অশ্বিনীকুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ব্রজমোহন দত্ত। অশ্বিনীকুমার একজন বিখ্যাত দেশভক্ত নেতা ছিলেন। ‘ভক্তিয়োগ,’ ‘কর্মযোগ,’ ‘জ্ঞানযোগ’ প্রভৃতি চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থ এবং ভক্তিতত্ত্ব-বিষয়ক লক্ষীতাবলী রচনার জন্য ইনি সাহিত্য-সমাজে চিরকাল সমাদৃত হইবেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।]

লোকভয় ভক্তিপথের বিশেষ প্রতিবন্ধক। আমরা অনেক সময়ে লোক-নিন্দার ভয়ে অনেক সংকার্য্য হইতে বিরত থাকি,—লোকনিন্দার ভয়ে মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়ি।

সাধুভাবে চলিতে গেলে এ পৃথিবীতে অনেক সময়ে নিলাভাজন হইতে হয়, নানারূপ কষ্টে পড়িতে হয়। যাহারা মানুষ অপেক্ষা ভগবানকে অধিক

ভয় করেন, তাঁহারা প্রায়ই আমাদিগের মধ্যে পাগল বলিয়া পরিচিত হন।
যাঁহারা কোন কু-নীতি, কু-প্রথা অথবা কু-স্বাচার সংস্কার করিতে যান, তাঁহারা
যে কত কষ্ট পাইয়া থাকেন, তাহা পৃথিবীর প্রধান প্রধান সংস্কারকদিগের জীবনী
আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইবে। যিও খ্রীষ্টে পাপের বিরুদ্ধে ভগবদ্বিধি
প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই ক্রুশে হত হইয়াছিলেন। আজিও চৈতন্যকে
কেহ কেহ ভণ্ড পাষণ্ড বলিয়া থাকে।

কিন্তু যিনিই কেন বিরুদ্ধবাদী হউন না, যাঁহারা প্রকৃত সাধু তাঁহারা
ভগবৎপদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কখনও বিচলিত হন না। ধর্মের জন্য যে
কত মহাত্মা পাষণ্ডদিগের অত্যাচারে প্রাণ বিসর্জন করিয়া এই পৃথিবীকে
ধন্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত মনে হইলেও জীবন পবিত্র হয়।
তাঁহাদিগের পদানুসরণ করিতে গেলে প্রাণ পর্যন্ত পণ করিতে হইবে, লোক-
নিন্দার কষ্ট ত কিছুই নয়। রামপ্রসাদ গাছিতেন :—

“জয় কালী জয় কালী বন,

লোক বলে ব'ল্বে পাগল হ'ল।”

ভক্তমাত্রেরই এই কথা। আমাদের ত প্রাণ-নাশের আশঙ্কা নাই, তবে
মানুষ দুই একটি কথা বলিবার ভয়ে কি পরমার্থ ত্যাগ করিবে? যিনি ভগবানের
মিলনসুখ সন্তোষ করিতে ইচ্ছুক, তিনি আর লোকের কথা গ্রাহ্য করিবেন
কেন? একটি ভক্ত পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন :—

তেরি মেরি দোস্তী লাগল লোক সব বদনামী কিয়া।

লোক সবকো বন্ধনে দিজে তুমি হামনে হামনে কাম কিয়া ॥

অর্থাৎ, “তোমাতে আমাতে বন্ধন হইয়াছে, লোকেরা নিন্দা করিতেছে ;
বলুক তাহাদিগের যাহা ইচ্ছা হয়, তুমি আমি কাজ হাসিল করিয়াছি। তুমি
আমি যাহা কর্তব্য তাহাই করিয়াছি—পরস্পর যে বন্ধন-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি
অতি উত্তম হইয়াছে, যাহার যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বলুক না, আমাদিগের
তাহাতে কি আসে যায়?”

লোকভয়-দ্বারা আমরা কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি ও সমাজকে কতদূর
ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছি একবার চিন্তা করা কর্তব্য। কোন ব্যক্তি মোহরির কার্য
করিতেছেন, মাসিক ২০ টাকার অধিক বেতন পান না ; তিনিও মনে করেন,

“আনি নিজে বাজার করিলে লোকে কি বলিবে? একটি চাকর না রাখিলে চলে না।” মাসিক ৪৮ টাকা বেতনে একটি চাকর রাখেন, তাহার আহারের ব্যয় আর ৪৮ টাকা, বাকী ১২৮ টাকায় পরিবারের ভরণপোষণ হইতে পারে না; সুতরাং তাঁহার নিকটে কোন কার্য উপস্থিত হইলেই দেখিতে পাই তিনি কখন কখনও বাম হস্ত প্রসারণ করিয়া থাকেন। উৎকোচগ্রাহীদিগের মধ্যে অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যাইবে, “মহাশয়, করি কি? ভদ্রলোকের সম্মান। যে বেতন পাই তাহা ত জানেন। একটি ব্রাহ্মণ কি একটি চাকর না রাখিলে লোকে বলিবে কি? এদিকে ব্রাহ্মণ-চাকর রাখিতে হইলে, বলুন দেখি, পরিবারের ভরণপোষণ চলে কিরূপে—কাষে কাষেই আর কি করি?”

মহৎ ব্যক্তিদের জীবন আলোচনা করিয়া,—তাঁহারা যাহা খাঁটি বুঝিয়াছেন তাহাই করিয়া গিয়াছেন, ‘লোকভয়কে তৃণজ্ঞানও করেন নাই’—এই ভাবটি হৃদয়ে যত দৃঢ় করিতে পারা যাইবে ততই লোকভয় দূর হইবে। ধর্মের জন্য, সত্যের জন্য, তাঁহারা যে দুর্দমনীয় তেজ দেখাইয়াছেন, তাহার একটি স্ফুলিঙ্গ কাহারও জীবনে পড়িলে তাহার লোকভয় থাকিতে পারে না। সুতরাং সেই মহাত্মাদিগের চরিত্র পুনঃপুনঃ আলোচনা করা কর্তব্য।

আর একটি বিষয় মনে রাখিলে লোকভয় অনেক কমিয়া যাইবে। পৃথিবীতে সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, যাহারা প্রথমে কোন সন্ধিষয়ে বিরোধী হইয়াছিলেন, তাঁহারাই শেষে সেই বিষয়ের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। ধর্মের, সত্যের, যাহা ভাল তাহার চিরকালই জয় হয়। এই জীবনে অনেকবার দেখিয়াছি যে, যাহারা কোন ব্যক্তির নিন্দা না করিয়া জনগ্রহণ করিত না, এমনই ঘটনাচক্র আসিয়া পড়িল যে তাহারাই আবার নিজেদের ভুল বুঝিয়া সেই ব্যক্তির পরম বন্ধু হইয়া দাঁড়াইল। অনেক ‘সল’ (Saul) এই পৃথিবীতে ‘পলে’ (Paul) পরিণত হয়। অনেক শত্রু-ওমর মিত্র-ওমর হইয়া পড়ে।

মনে কর এই পৃথিবীতে কেহই তোমার পক্ষসমর্থন করিবে না, তাহাতেই বা কি? যাহা সত্য, যাহা ধর্ম, তাহা যে ভগবানের অনুমোদিত সে বিষয়ে ত কোন সন্দেহ নাই। ধর, একদিকে ভগবান আর একদিকে সমস্ত পৃথিবী; তোলেন কোন্ দিক্ গুরুতর বোধ হয়? তুমি কোন্ দিকে যাইবে?



কণ্টক দূর করিবার যে উপায়গুলি বলা হইল, তাহাদের মধ্যে, সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, মনের কার্য্যই অধিক। কু-চিন্তা সু-চিন্তা দ্বারা, কু-ভাব সু-ভাব দ্বারা, দমন করা প্রয়োজন। সকল পাপেরই উৎপত্তি মনে, এবং মন উহাদের বিনাশ-সাধনে সক্ষম।

যে বৃত্তিগুলি অধোমুখী হইয়াছিল, মনের দ্বারা তাহাদিগকে উর্দ্ধমুখী করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি বাহিরে বিষয়ভূমিতে বিচরণ করিতেছিল, সু-চিন্তা দ্বারা তাহাদিগকে অন্তর্গত করিতে পারিলেই কণ্টক উন্মূলিত করা হইল।

উপসংহারে কণ্টকগুলি-সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা প্রয়োজনীয়। ইহারা অনেক সময়ে ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়। অনেক সময়ে পাপ পুণ্যের বেশ ধরিয়া আইসে। সয়তান গরদের ধূতি পরিয়া তিলক কাটিয়া উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে কুমন্ত্রণা দেয়। সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে, এই সময়ে তাহার কুহকে ভুলিয়া না যাই। কোন ব্যক্তি কোন অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, কি অপবিত্র বাক্য বলিয়াছে, এবং তাহার জন্য বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নহে; তুমি তাহার প্রতিবাদ করা কিংবা তাহাকে শাস্তি দেওয়া নিতান্ত কর্তব্য মনে করিলে, হয়ত কেহ বলিয়া উঠিলেন, “ক্ষমা কর, অত প্রতিবাদ করিলে কি চলে? পৃথিবীতে এরূপ কতই হইতেছে, ইহার বিরুদ্ধে ক্রোধ করিলে লাভ কি? একটু ক্ষমা চাই।” এস্থলে যিনি পাপের বিরুদ্ধে দণ্ড ধারণ করিতে নিষেধ করিয়া ক্ষমার দোহাই দিলেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে পাপকে প্রশ্রয় দিলেন। তিনি হয়ত বুঝিতে পারেন নাই যে, ক্ষমার বেশে পাপ তাহাকে অধিকার করিয়াছে। যদি কেহ জানেন যে, কোন ব্যক্তি বড় কষ্টে পড়িয়াছে, কিন্তু তাহাকে নগদ টাকা দান করিলে তাহার অপব্যবহার করিবে, এবং যদি তিনি দয়ার্দ্র হইয়া পুণ্য ভাবিয়া তাহাকে নগদ টাকা দান করেন, তাহা হইলে তিনি জানিয়া রাখুন যে, পাপ পুণ্যবেশ ধারণ করিয়া তাহাকে প্রবলিত করিয়াছে।

ছদ্মবেশী পাপ-সম্বন্ধে এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। মনের চারিদিকে অতি সতর্ক এবং বুদ্ধিমান প্রহরী রাখিতে হইবে, যেন পাপ কোন প্রকারে কোনরূপ চতুরতা অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না পারে।

ভাগীরথীর উৎস-সন্ধান

জগদীশচন্দ্র বসু

[জগদীশচন্দ্র বসু ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের রাড়িখাল গ্রামের একটি প্রাচীন বংশে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশুবিদ্যালয় হইতে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেখানে কেম্ব্রিজ বিশুবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং লণ্ডন বিশুবিদ্যালয় হইতে বি.এস্-সি. ডিগ্রী ও পরে ডি.এস্-সি. উপাধি লাভ করেন। ইনি কলিকাতার প্লেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। জগদীশচন্দ্র বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদিগের অন্যতম। উদ্ভিদ-জগতে ইহার মৌলিক গবেষণা জগৎ-বিখ্যাত। গভর্নমেন্ট ইহার 'সার' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ইহার 'অব্যক্ত' নামক পুস্তক ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত 'Response of the Living and the Non-Living' নামক গ্রন্থ সুপরিচিত। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ৭৯ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়।]

আমাদের বাড়ীর নিম্নেই গঙ্গা প্রবাহিত। বাল্যকাল হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্য জন্মিয়াছিল। বৎসরের এক সময়ে কুল প্লাবন করিয়া জলস্রোত বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত; আবার হেমন্তের শেষে ক্ষীণকলেবর ধারণ করিত। প্রতিদিন জোয়ার-ভাটায় বারিপ্রবাহের পরিবর্তন লক্ষ্য করিতাম। নদীকে আমার একটি গতিপরিবর্তনশীল জীব বলিয়া মনে হইত। সন্ধ্যা হইলেই একাকী নদীতীরে আসিয়া বসিতাম। ছোট ছোট তরঙ্গগুলি তীরভূমিতে প্রতিহত হইয়া কুলু কুলু গীত গাহিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইত। যখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিত এবং বাহিরের কোলাহল একে একে নীরব হইয়া যাইত, তখন নদীর সেই কুলু কুলু ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিতে পাইতাম। কখন মনে হইত, এই যে অজ্ঞান জলধারা প্রতিদিন চলিয়া যাইতেছে, ইহা ত কখনও ফিরে না; তবে এই অনন্ত স্রোত কোথা হইতে আসিতেছে? ইহার কি শেষ নাই? নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম, “তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?” নদী উত্তর করিত, “মহাদেবের জটা হইতে।” তখন ভাগীরথের গঙ্গা-আনয়ন-মুত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইত।

তাহার পর, বড় হইয়া নদীর উৎপত্তি-সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা শুনিয়াছি ; কিন্তু যখনই শ্রান্তমনে নদীতীরে বসিয়াছি, তখনই সেই চিরাত্যস্ত কুলু কুলু শব্দের মধ্যে সেই পূর্বকথা শুনিলাম, “মহাদেবের জটা হইতে।”

একবার নদীতীরে আমার এক প্রিয়জনের পাখির অবশেষ চিতানলে ভস্মীভূত হইতে দেখিলাম। আমার সেই আজন্ম-পরিচিত বাৎসল্যের বাসমন্দির সহসা শূন্যে পরিণত হইল। সেই স্নেহের এক গভীর বিশাল প্রবাহ কোন্ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় দেশে বহিয়া চলিয়া গেল? যে যায়, সে ত আর ফিরে না; তবে কি সে অনন্তকালের জন্য লুপ্ত হয়? মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি? যে যায়, সে কোথায় যায়? আমার প্রিয়জন আজ কোথায়?

তখন নদীর কলশব্দের মধ্যে শুনিতে পাইলাম, “মহাদেবের পদতলে।”

চতুর্দিক্ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, কুলু কুলু শব্দের মধ্যে শুনিতে পাইলাম, “আমরা যথা হইতে আসি, আবার তথায় ফিরিয়া যাই। দীর্ঘ প্রবাসের পর উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছি।”

জিজ্ঞাসা করিলাম, “কোথা হইতে আসিয়াছ, নদি?” নদী সেই পুরাতন স্বরে উত্তর করিল, “মহাদেবের জটা হইতে।”

একদিন আমি বলিলাম, “নদি, আজ বহুকাল অবধি তোমার সহিত আমার সখ্যা। পুরাতনের মধ্যে কেবল তুমি। বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত তুমি আমার জীবন বেঁধেন করিয়া আছ, আমার জীবনের এক অংশ হইয়া গিয়াছ; তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, জানি না। আমি তোমার প্রবাহ অবলম্বন করিয়া তোমার উৎপত্তিস্থান দেখিয়া আসিব।”

শুনিয়াছিলাম, উত্তর-পশ্চিমে যে তুমারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়, তথা হইতে জাহ্নবীর উৎপত্তি হইয়াছে। আমি সেই শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া, বহু গ্রাম, জনপদ ও বিজন অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে কূর্গাচল নামক পুরান-প্রথিত দেশে উপরিত হইলাম। তথা হইতে সরযুনদীর উৎপত্তিস্থান দর্শন করিয়া দানবপুরে আসিলাম। তাহার পর, পুনরায় বহুল গিরিগহন লঙ্ঘনপূর্বক উত্তরাভিনুখে অগ্রসর হইলাম।

একদিন অতীব বন্ধুর পার্বত্য-পথে চলিতে চলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার চতুর্দিকে পর্বতমালা, তাহাদের পার্শ্বদেশে নিবিড় অরণ্যানী;

এক অপ্রভেদী শূদ্র তাহার বিরাট দেহ-দ্বারা পশ্চাতের দৃশ্য অন্তরান করিয়া সন্মুখে দণ্ডায়মান। আমার পথপ্রদর্শক বলিল, “এই শূদ্রে উঠিলেই তোমার অতীষ্ট সিদ্ধ হইবে। নিম্নে যে রজতসূত্রের ন্যায় রেখা দেখা যাইতেছে, উহাই বহু দেশ অতিক্রম করিয়া তোমাদের দেশে অতি বেগবতী, কুলপ্লাবিনী, শ্রোতস্বতী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সন্মুখস্থ শিখরে আরোহণ করিলেই দেখিতে পাইবে এই সুক্ল সূত্রের আরম্ভ কোথায়।”

এই কথা শুনিয়া আমি সমুদয় পথশ্রম বিস্মৃত হইয়া নব উদ্যমে পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম।

আমার পথপ্রদর্শক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, “সন্মুখে দেখ, জয় নন্দাদেবী! জয় ত্রিশূল!”

কিয়ৎক্ষণ পূর্ব পর্বতমালা আমার দৃষ্টি অবরোধ করিয়া ছিল। এখন উচ্চতর শূদ্রে আরোহণ করিবামাত্র আমার সন্মুখে আবরণ অপসৃত হইল। দেখিলাম, অনন্ত-প্রসারিত নীল নভোমণ্ডল। সেই নিবিড় নীলস্তর ভেদ করিয়া দুই স্তম্ভ তুম্বার-মূর্ত্তি শূন্যে উভিত হইয়াছে। একটি গরীয়সী রমণীর ন্যায়। মনে হইল যেন আমার দিকে সম্মুখ প্রণাম দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। ঝাঁহার বিশাল বক্ষে বহু জীব আশ্রয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে, এই মূর্ত্তি সেই মাতৃরূপিনী ধরিত্রীর বলিয়া চিনিলাম। ইহার অনতিদূরে মহাদেবের ত্রিশূল স্থাপিত। এই ত্রিশূল পাতালগর্ভ হইতে উভিত হইয়া মেদিনী-বিদারণপূর্বক শানিত অগ্রভাগ-দ্বারা আকাশ বিচ্ছ করিতেছে। ত্রিভুবন এই মহাস্ত্রে প্রথিত।*

এইরূপে পরস্পরের পার্শ্বে, সৃষ্ট-জগৎ ও সৃষ্টিকর্তার হস্তের আশ্রয় সাকার রূপে দর্শন করিলাম। এই ত্রিশূল যে স্থিতি ও প্রলয়ের চিহ্নরূপী, তাহা পরে বঝিলাম।

আমার পথপ্রদর্শক বলিল, “সন্মুখে এখনও দীর্ঘ পথ রহিয়াছে; উহা অতীব দগম; দুই দিন চলিলে পর তুম্বার-নদী দেখিতে পাইবে।”

সেই দুই দিন বহু বন ও গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া অবশেষে তুম্বারক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটি সুক্ল হইতে সুক্লতর হইয়া এ পর্য্যন্ত

* কুমারত্নের উত্তরে দুইটি তুম্বার-শিখর দেখা যায়। একটির নাম নন্দাদেবী, অপরটি ত্রিশূল নামে খ্যাত।

আসিতেছিল, কম্বোলিনীর মৃদু গীত এত দিন কণে ধ্বনিত হইতেছিল; সহসা যেন কোনো ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন, নিস্তব্ধ তুঘারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম, স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড উদ্ভিদমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়া ছ, যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে “তিষ্ঠ” বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোনো মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিক-খনি নিঃশেষ করিয়া এই বিশালক্ষেত্রে সংস্কৃত সমুদ্রের মূর্তি স্খরচনা করিয়া গিয়াছেন।

ই দিকে উচ্চ পর্বতশ্রেণী, বহুদূর-প্রসারিত সেই পর্বতের পাদমূল হইতে উদ্ভূত ভূগুদেশ পর্য্যন্ত অগণ্য উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। শিখর-তুঘার-নিঃসৃত জলধারা বক্ষিম গতিতে নিগূহ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল এখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না, মধ্যে ঘন কুজ্জ্বলিকা; এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অব্যাহত হইবে।

তুঘার-নদীর উপর দিয়া উর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এই নদী ধবলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে আসিতেছে। আসিবার সময়ে পর্বতদেহ ভগ্ন করিয়া প্রস্তর-স্তূপ বহন করিয়া আনিতেছে, সেই প্রস্তর-স্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অতি দুরারোহ স্তূপ হইতে স্তূপান্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যত উর্দ্ধে উঠিতেছি বায়ুস্তর ততই ক্ষীণতর হইতেছে; সেই ক্ষীণ বায়ু দেবধূপের সৌরভে পরিপূর্ণ। ক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল; অবশেষে হতচেতন-প্রায় হইয়া নন্দাদেবীর পদতলে পতিত হইলাম।

সহসা শত শত শব্দনাদ একত্র কণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অক্টোব্রীলিত-নেত্রে দেখিলাম, সমগ্র পর্বত ও বনস্বলীতে পূজার আয়োজন হইয়াছে। জলপ্রপাতগুলি যেন স্রুবহুৎ কমণ্ডলু-মখ হইতে পতিত হইতেছে; সেই সঙ্গে পারিজাত-বৃক্ষসকল স্বতঃ পুষ্প বর্ষণ করিতেছে; দূরে দিক্ আলোড়ন করিয়া শব্দধ্বনির ন্যায় গভীর ধ্বনি উঠিতেছে। ইহা শব্দধ্বনি কি পতনশীল তুঘার-পর্বতের বজ্রনিদাদ, স্থির করিতে পারিলাম না।

কতক্ষণ পরে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কুজ্জ্বলিকা নন্দাদেবী ও ত্রিশূল

আচ্ছন্ন করিয়া ছিল, তাহা উর্ধ্বে উষিত হইয়া শূন্যমার্গ আশ্রয় করিয়াছে। নন্দাদেবীর শীর্ষোপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্বর জ্যোতি বিরাজ করিতেছে, তাহা একান্ত দুনিরীক্ষ্য। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নিগত ধূমরাশি দিগ্দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে, এই কি মহাদেবের জটা? এই জটা পৃথিবীরূপিণী নন্দাদেবীকে চন্দ্রাতপের ন্যায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এই জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুয়ারকণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই কঠিন হীরককণাই ত্রিশূলগ্র শাণিত করিতেছে।

শিব ও রুদ্র! রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। মানসচক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায় উৎসে প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই মহাচক্র-স্থাপিত স্রোতে স্রষ্টি ও প্রলয়-রূপ পরস্পরের পার্শ্ব স্থাপিত দেখিলাম।

সমুখে আকাশভেদী যে পর্বতশ্রেণী দেখিতেছি, হিমানুরূপ বারিকণা উহাদের শরীরভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে; প্রবেশ করিয়া মহাবিক্রমে উহাদের বেহ বিনীর্ণ করিতেছে। চ্যুত শিখর বহ্নিনিদে নিম্নে পতিত হইতেছে।

বারিকণারাই নিম্নে শুভ্র তুয়ার-শয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ভগ্ন শৈল এই তুয়ার-শয্যায় শায়িত হইল। তখন কণাগুলি একে অন্যকে ডাকিয়া বলিল, “আইগ, আমরা ইহার অস্থি দিয়া পৃথিবীর দেহ নূতন করিয়া নিষ্কাণ করি।”

কোটি কোটি ক্ষুদ্র হস্ত অসংখ্য অণুপ্রমাণ শক্তির মিলনে, অনায়াসে সেই পর্বতভার বহিয়া নিম্নে চলিল। কোন পথ ছিল না, পতিত পর্বতখণ্ডের ঘর্ষণেই পথ কাটিয়া লইল—উপত্যকা রচিত হইল। পর্বতগাত্রে ঘষিত হইতে হইতে উপলব্ধুপ চূর্ণীকৃত হইল।

আমি যে স্থানে বসিয়া আছি, তাহার উভয়তঃ তুয়ারবাহিত প্রস্তরখণ্ড ঘাণীকৃত রহিয়াছে। ইহার নিম্নেই তুয়ারকণা তরলাকৃতি ধারণ করিয়া ক্ষুদ্র সরিতে পরিণত হইয়াছে। এই সরিৎ পর্বতের অস্থিচূর্ণ বহন করিয়া গিরিদেশ অতিবর্তন করিয়া বহল সমৃদ্ধ নগর ও জনপদের মধ্য দিয়া সাগরোদ্দেশে প্রবাহিত হইতেছে।

পথে একস্থানে উভয়কূলস্থ দেশ মরুভূমি-প্রায় হইয়াছিল। নদী তট উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ প্লাবিত করিল। পর্বতের অস্থিচূর্ণ-সংযোগে মৃত্তিকার

উর্বরতাশক্তি বদ্ধিত হইল। কঠিন পর্বতের দেহাবশেষ-দ্বারা বৃক্ষনতার সজীব শ্যামদেহ নিম্নিত হইল।

বারিকণাগণই বৃষ্টিক্রমে পৃথিবী ধৌত করিতেছে, এবং মৃত ও পরিত্যক্ত দ্রব্য বহন করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে। তথায় মনুষ্যচক্র অগোচরে তুন রাছোর স্রষ্টি হইতেছে।

সমুদ্রে মিলিত বারিকণাকুল সর্বদা বিতাড়িত হইয়া বেলাভূমি ভঙ্গ করিতেছে।

জলকণা কখনও ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া পাতালপুরস্ব অগ্নিকুণ্ডে আহুতি-স্বরূপ হইতেছে। সেই মহাযজ্ঞোবিত মুরাশি পৃথিবী বিদারণ করিয়া আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যাদগার-রূপে প্রকাশ পাইতেছে; সেই মহাতেজে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে; উর্ক ভূমি অতলে নিমজ্জিত ও সমদ্রতল উন্নত হওয়ায় নূতন মহাদেশ নিম্নিত হইতেছে।

সমুদ্রে পতিত হইয়াও বাবিবিন্দুগণের বিশ্রাম নাই। সূর্যের তেজে উত্তপ্ত হইয়া ইহারা উর্কে উদ্ভীন হইতেছে। ইহারাই একদিন অশনি ও ঝড়াবলে পর্বতশিখরাভিগৃহে ধাবিত হইয়া, তথায় বিপুল জটাজাল-মধ্যে আশ্রয় লইবে; আবার কালক্রমে বিগ্ৰামাস্তে পর্বতপৃষ্ঠে তুহিনাকারে পতিত হইবে। এই গতির বিরাম নাই, শেষ নাই।

এখনও ভাগীবতী-তীরে বসিয়া তাহার কুলু কুলু ধ্বনি শ্রবণ করি। এখনও তাহাতে পূর্বের নায় কণা শুনিতে পাই। এখন আর বৃষ্টিতে ভুল হয় না। “নদি, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?”—ইহার উত্তরে এখন স্পষ্ট স্বরে শুনিতে পাই—

“মহাদেবের জটা হইতে।”

স্মার আশুতোষ

বিপিনচন্দ্র পাল

[শীহট জেলার অন্তর্গত পৈল গ্রামে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 'সম্মা', 'পুর্বাধিনী', 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্যায়), 'বিজয়া', 'নারায়ণ' পুর্ভূতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। ইনি সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন পুর্ভূতি বহু বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইহার পুর্ত্যেক লেখায় চিন্তাশীলতা ও বিদ্যাবস্তার পুর্চুর পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পুর্ণীত 'চরিত্র-চিত্র' গুপ্ত বঙ্গসাহিত্যে সমাদর লাভ করিয়াছে। বিপিনচন্দ্র বাঙ্গালা, তথা ভারতের, অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ছিলেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ইহার মৃত্যু হয়।]

এ জগতে সকল ক্ষেত্রেই অধিকারিত্বের আছে। মানুষের গুণাগুণের খাঁটি বিচার করিতে গেলেও অধিকারী অনধিকারীর কথা ভাবিতে হয়। নির্মূল চিন্তা ব্যতীত কোন বিষয়েই সত্য দেখিবার অধিকার জন্মে না। যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রেরণায় আশুতোষের ভজনা করিতে যাইতেন, তাহারা আশুতোষের সত্য পরিচয় কখনও লাভ করেন নাই। অন্য পক্ষে, যাহারা কেবল আশুতোষের বাহিরের কর্ম দেখিয়াই তাহার অন্তরের ধর্মার্থের বিচার করিয়াছেন, তাহারাও তাহার প্রতি কখনও সুবিচার করিতে পারেন নাই। বাহিরের কর্মে সচরাচর কর্মীকে সত্যভাবে প্রকাশ করিতে পারে না। কর্মের নিজের একটা বিধান আছে। কর্মীকে এই বিধান মানিয়া চলিতে হয়। কর্মের খাতিরে কর্মীকে অনেক সময়ে আপনাকে চাপিয়া রাখিতে হয়। অনেক সময়ে নিজের স্বধর্মকে উপেক্ষা করিয়া কর্মের পরধর্মের অনুসরণ করিতে হয়। কর্ম-দ্বারা কর্মীর কখনই খাঁটি বিচার হয় না। আশুতোষের কর্মের দ্বারা তাহার বিচার করিলে চলিবে না; তাহার নিজস্ব প্রকৃতি-দ্বারা তাহার বাহিরের কর্মজীবনের ভাল-মন্দের ওজন করিতে হইবে। যাহারা আশুতোষের চরিত্রের অন্তঃপুরে কখনও প্রবেশ করিবার অধিকার পান নাই, তাহারা তাহার জটিল প্রকৃতির এবং বিচিত্র কর্মের ভাল-মন্দের সত্য বিচার কখনও করিতে পারিবেন না।

এ সংসারে যে মানুষই দশ জনের অপেক্ষা মাথা উঁচু করিয়া উঠে, সে-ই, একদিকে যেমন কতকগুলি লোকের অকৃত্রিম অনুরাগ এবং শ্রদ্ধা লাভ করে,

সেইরূপ আবার বহুতর লোকের অন্তরে অকারণ অসুয়াও জাগাইয়া দেয়। এই অসুয়াতেও বহুলোকের দৃষ্টিকে আচছন্ন করিয়া আশুতোষের চরিত্রের সত্য বিচার করিতে দেয় নাই। আশুতোষের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইবার পূর্বে আমিও তাঁহাকে যে চক্ষে দেখিতাম, পরিচয়-লাভের পরে সে ভাবে দেখি নাই।

বাহির হইতে আশুতোষকে অত্যন্ত দান্তিক ভাবিতাম। নিকটে যাইয়া একবারও কোন প্রকারে এই দান্তিকতার পরিচয় পাই নাই। ফলতঃ তাঁহার আচার-আচরণে ও কথাবার্তায় তাঁহাকে প্রায় সর্বদাই অতিশয় ডিমোক্র্যাটিক (Democratic) বলিয়া মনে হইয়াছে। এই ইংরাজী কথাটার প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় নাই। আপনার পোষাক-পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে ও কথা-বার্তায় যে নিজেকে আর দশ জন হইতে পৃথক্ করিয়া ও উঁচু করিয়া ধরিবার চেষ্টা না করে, তাহাকে ইংরাজীতে আমরা Democratic কহি। এই লক্ষণটা আশুতোষের মধ্যে সর্বদাই প্রকাশ পাইত বলিয়া মনে হইয়াছে। পোষাক-পরিচ্ছদ আশুতোষের অত্যন্ত সাদাসিদে ছিল। জজিয়তী করিতে যাইয়া তাঁহাকে হাইকোর্টের জজদের পোষাক পরিতে হইত বটে, কিন্তু পারতপক্ষে বোধ হয়, তিনি কখনও দেশের লোকের সভাসমিতিতে যাইবার সময়ে এই রাজ-বেশ ধারণ করিতেন না।

সচরাচর মানুষ আপনার ঐশ্বর্য্য-বিস্তার করিয়াই নিজেকে চারিদিকের সাধারণ লোক হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিতে চাহে। আশুতোষের মধ্যে ঐশ্বর্য্য-বিস্তারের এই আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় নাই। তিনি দেশের দশ জন হইতে আপনাকে পৃথক্ রাখিতে চাহেন নাই বলিয়াই, আপনার মানসিক মতবাদে অত্যন্ত উদার হইয়াও ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক আচার-আচরণে এবং ধর্ম্মের বাহ্য ক্রিয়াকলাপে কখনও প্রচলিত হিন্দুয়ানীর গত্তী ছাড়িয়া যান নাই। ইহার মূলে তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা অপেক্ষা, আমার মনে হয়, গভীর স্বাভাত্যাভিমানই বেশী বিদ্যমান ছিল। আশুতোষ আর দশ জন বাঙ্গালী গৃহস্থের মতন বাড়ীতে সচরাচর খালি গায়ে থাকিতেন। শুনিয়াছি, বড় বড় সাহেব-সুবা দেখা করিতে আসিলেও তিনি কখনও আপনার স্বজাতির এই বিবস্ত্র বর্ব্বরতাকে চাকিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন না। স্যাড্‌লার কমিশনের সভ্যরূপে দেশবিদেশে বেড়াইবার

সময়ে, তিনি কখনও বাঙ্গালীর মামুলী পোষাক ছাড়িয়া ইংরেজ দরবারের প্রচলিত পরিচ্ছদ পরিধান করেন নাই।

আশুতোষ বাঙ্গালাকে, বাঙ্গালীর ভাষাকে, বাঙ্গালীর সাধনা ও সভ্যতাকে কতটা যে ভালবাসিতেন, বাঁকিপুরে বাঙ্গালা সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে যাইয়া তাহার পরিচয় পাই। প্রথম যখন তাঁহাকে সম্মিলনের সভাপতিত্বে বরণ করিবার প্রস্তাব হয়, সভ্য বলিতে কি, তখন কথাটা ভাল লাগে নাই। আশুতোষের এই পদের কোন যোগ্যতা আছে বলিয়া কল্পনা করি নাই। কিন্তু তাঁহার অভিভাষণ শুনিয়া আমার সে ভ্রান্তি দূর হইয়া যায়। আশুতোষ, বাঙ্গালা লেখক না হইয়াও বাঙ্গালা সাহিত্যকে কি গভীর অনুরাগের চক্ষে দেখিতেন, এই অভিভাষণে তাহার প্রথম পরিচয় পাই। বাঙ্গালা সাহিত্যকে আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করিয়া, বাঙ্গালার মনীষাকে আধুনিক বিশ্বসাধনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, আশুতোষের প্রাণে গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল। বাঁকিপুরের সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে এই আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই বাসনার প্রেরণাতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি-পরীক্ষাতে আশুতোষ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে একটা বিশিষ্ট স্থান দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালীর সাধনাকে বড় করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহার প্রাণে যে গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল, এ সকলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আশা করিয়াছিলাম, রাজকর্ম হইতে অবসর পাইয়া আশুতোষ আপনার অসাধারণ শক্তি এবং মনীষাকে এ দিকে প্রয়োগ করিবেন। সে আশা পূর্ণ হইল না। কিন্তু ইহাতে আশুতোষের গভীর স্বাধীনতাভিমানের মূল্য বা মর্যাদার হ্রাস হয় নাই।

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তমান যুগে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিগণের মধ্যে অন্যতম। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান যুগের বঙ্গসাহিত্যের উপর ইঁহার অতুল প্রভাব। ইনি বাল্যকালে 'কবি-কাহিনী,' 'নির্মলের স্বপ্নভঙ্গ,' 'তারকার আত্মহত্যা' প্রভৃতি বহু কবিতা রচনা করেন। তৎপরে 'সোনার তরী,' 'নৈবেদ্য,' 'গীতাঞ্জলি,' 'ক্ষণিকা,' 'কথা ও কাহিনী,' 'বলাকা,' 'মহা,' 'পুরবী,' 'প্রান্তিক' প্রভৃতি বহু কাব্যগ্রন্থ, 'গোরা,' 'চোখের বালি,' 'ঘরে বাইরে,' 'নৌকাডুবি' প্রভৃতি বিবিধ উপন্যাস এবং 'রাজা ও রানী,' 'বিশর্জন,' 'রাজা,' 'চিরকুমার সভা,' 'শেষরক্ষা,' 'পরিভ্রাণ,' 'অচলায়তন,' 'রক্তকরবী,' 'তপতী,' 'অরুণ-বতন,' 'বাঁশরী' প্রভৃতি বহু নাটক রচনা করিয়াছেন। ইঁহার রচিত অনেক গ্রন্থই জগতের নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইঁহার রাজনীতি-, সমাজ- ও সাহিত্য-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ বঙ্গীয় গদ্যসাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়াছে। ইনি একাধিকবার যুরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া বক্তৃতা করেন এবং সর্বত্রই বিশেষভাবে অভিনন্দিত হন। অনেক দিন পূর্বে বোলপুরে ইনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন; পরে নালন্দা বিহারের অনুকরণে ইনি এই বিদ্যালয়টিকে 'বিশুভারতী' প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া তথায় সর্বদেশের পণ্ডিতদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে 'ডক্টর' উপাধি প্রদান এবং গভর্নমেন্ট ইঁহাকে 'নাইট' উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ করিয়া ইনি ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে যুরোপের জ্ঞানমর্যাদার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্ত হন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাস হইতে দুই বৎসর ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পদবী-সম্মান-বিতরণ-সভায় বিশ্বেকবি রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষায় যে 'ছাত্র-সম্ভাষণ' পাঠ করেন, তাহা ভাষা ও ভাষায় অপূর্ব। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অগস্ট রবীন্দ্রনাথ পরলোক-গমন করেন; তদুপলক্ষে সমগ্র জগৎ, তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা অর্পণ করে।]

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি। লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিহ্নিত হিপছিপে বালক। জাতিতে কায়স্থ। তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের এক বৎসর বয়স্ক একটি শিশুর রক্ষণ- ও পালন-কার্য্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল।

সেই শিশুটি কালক্রমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুন্সেফিতে প্রবেশ করিয়াছে। রাইচরণ এখনো তাহার ভৃত্য।

তাহার আর একটি মনিব বাড়িয়াছে; মাতাঠাকুরাণী ঘরে আসিয়াছেন; স্মৃতরাং অনুকূলবাবুর উপর রাইচরণের পূর্ব যতটা অধিকার ছিল তাহার অধিকাংশই নূতন কত্রীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কত্রী যেমন রাইচরণের পূর্বাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন তেমনি একটি নূতন অধিকার দিয়া অনেকটা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অনুকূলের একটি পুত্রসন্তান অল্পদিন হইল জন্মলাভ করিয়াছে—এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপুণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোনো প্রত্যাশা না করিয়া এমন সকল সম্পূর্ণ অথহীন অসঙ্গত প্রশ্ন সূর করিয়া শিশুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে, এই ক্ষুদ্র আনুকূল্যটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিলখিল হাস্যকলরব তুলিয়া ক্রতবেগে নিরাপদ স্থানে লকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য ও বিচার-শক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব্ব বিস্ময়ে বলিত, “মা, তোমার ছেলে বড়ো হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।”

পৃথিবীতে আর কোনো মানবসন্তান যে, এই বয়সে চৌকাঠ লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

অবশেষে শিশু যখন টলমল করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার, এবং যখন মাকে মা, পিসিকে পিচি, এবং রাইচরণকে চন্নি বলিয়া সম্বোধন করিল, তখন রাইচরণ সেই প্রত্যয়াতীত সংবাদ যাহার তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, “মাকে মা বলে, পিসিকে পিচি বলে, কিন্তু আমাকে বলে চন্দ্ৰ।” বাস্তবিক শিশুর মাথায় এ বুদ্ধি কী করিয়া যোগাইল বলা শক্ত। নিশ্চয়ই কোনো বয়স্ক লোক কখনই এরূপ অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না, এবং দিলেও তাহার জজের পদপ্রাপ্তিসম্ভাবনা-সম্বন্ধে সাধারণের সম্পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছুদিন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। মল্ল সাজিয়া তাহাকে শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত—আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত।

এই সময়ে অনুকূল পদ্মাতীরবর্তী এক জিলায় বদলি হইলেন। অনুকূল তাহার শিশুর জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় একটা জরির টুপি, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দুইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুই বেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান, গ্রাম, শস্যক্ষেত্র এক এক থানে মুখে পূরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড়-ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপঝাপ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশ দিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং ভ্রতবেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্রগতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরাহে মেষ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালী ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নোকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই—মেঘের ছিদ্ৰ দিয়া দেখা গেল, পরপারে জনহীন বালুকাতীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সূর্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, “চন্দ্ৰ ফু।”

অনতিদূরে সজল পঙ্কিল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কদম্ব-বৃক্ষের উচচশাখায় গুলিকতক কদম্ব-ফুল ফুটিয়াছিল, সেই দিকে শিশুর লুক্ক দৃষ্টি আকষ্ট হইয়াছিল। দুই চারি দিন হইল রাইচরণ কাঠি দিয়া বিদ্ধ করিয়া তাহাকে কদম্ব-ফুলের গাড়ি

যানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে, সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই; ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙিয়া ফুল তুলিতে যাইতে 'চন্দ্ৰ'র প্রবৃত্তি হইল না—তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অশ্বুনি নির্দেশ করিয়া বলিল, “দেখো দেখো ও—ই দেখো পাখী—ওই উড়ে—এ গেলো। আররে পাখী আয় আয়”—এইরূপ অবিশ্রান্ত বিচিত্র কলরব করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে, তাহাকে এরূপ সামান্য উপায়ে ভুলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা—বিশেষত চারিদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পাখী লইয়া অধিকক্ষণ কাজ চলে না।

রাইচরণ বলিল, “তবে তুমি গাড়িতে বসে থাকো, আমি চট করে ফুল তুলে আনচি। খবরদার জলের ধারে যেয়ো না।” বলিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ব-বৃক্ষের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু ঐ যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্ব-ফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খলখল্ ছল্ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দৃষ্টামি করিয়া কোন্ এক বহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশুপ্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানভিমুখে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবশিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধারে গেল—একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ করনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল—দ্রুত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বারবার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্যাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্ব-ফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল কেহ নাই। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কোথাও কাহারও কোনো চিহ্ন নাই।



মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোয়ার মতো হইয়া আসিল। ভাঙা বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, “বাবু—খোকাবাবু, লক্ষ্মী, দাদাবাবু আমার।”

কিন্তু চন্দ্ৰ বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল্‌ছল্‌ খল্‌খল্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল,—যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে উৎকণ্ঠিত জননী চারিদিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লঠন-হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল, রাইচরণ নিশীথের ঝোড়ো বাতাসের মত সমস্ত ক্ষেত্রময় “বাবু, খোকাবাবু আমার” ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম্ করিয়া মা-ঠাকুরাণের পায়ে কাছ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে, “জানিনে মা।”

যদিও সকলেই মনে মনে বুঝিল, পন্থারই এই কাজ, তথাপি গ্রামের প্রান্তে যে একদল বেদের সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সন্দেহ দূর হইল না। এবং মাতাঠাকুরাণীর মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে; এমনকি, তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অনুনয়পূর্বক বলিলেন, “তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে—তুই যত টাকা চা'স্‌ তোকে দেবো।” শুনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। গৃহিণী তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

অনুকূলবাবু তাহার স্ত্রীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, রাইচরণ এমন অবন্য কাজ কী উদ্দেশ্যে করিতে পারে। গৃহিণী বলিলেন, “কেন? তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।”

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এতকাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই। কিন্তু দৈবক্রমে, বৎসর না যাইতেই তাহার স্ত্রী অধিক বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সংবরণ করিল।

এই নবজাত শিশুটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগ্নী যদি না থাকিত তবে এই শিশুটি পৃথিবীর বায়ু বেশি দিন ভোগ করিতে পারিত না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ছেলেটিও কিছুদিন বাদে চোকাঠ পার হইতে আরম্ভ করিল, এবং সর্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সকৌতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন কি, ইহার কণ্ঠস্বর হাস্যক্রন্দন-ধ্বনি অনেকটা সেই শিশুরই মতো। এক-একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত, রাইচরণের বুকটা সহসা ধড়াস্ করিয়া উঠিত, মনে হইত দাদাবাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে।

ফেল্‌না—রাইচরণের ভগ্নী ইহার নাম রাখিয়াছিল ফেল্‌না—যথাসময়ে পিসিকে পিচি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল—তবে তো খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

তখন মাঠাকুরুণের সেই দারুণ সন্দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়িল—আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে কহিল, “আহা মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল, তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে।”—তখন, এতদিন শিশুকে যে অযত্ন করিয়াছে, সেজন্য বড় অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেল্‌নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে লাগিল যেন সে বড় ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির টুপি আনিল। মৃত স্ত্রীর গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারী হইল। পাড়ার কোনো ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না—রাত্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সঙ্গী হইল। পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইরূপ উন্মত্তবৎ আচরণে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

ফেল্‌নার যখন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তখন রাইচরণ নিজের জোত জমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতা লইয়া গেল। সেখানে বহুকষ্টে

একটি চাকরির জোগাড় করিয়া ফেল্নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো শিক্ষা দিতে ক্রটি করিত না। মনে মনে বলিত, বৎস, ভালবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোন অযত্ন হইবে, তা হইবে না।

এমন করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে শুনে ভালো এবং দেখিতে শুনিতেও বেশ, হুটপুট উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—কেশবেশবিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ কিছু সুখী এবং সৌখীন। বাপকে ঠিক বাপের মতো মনে করিতে পারিত না। কারণ, রাইচরণ স্নেহে বাপ, সেবায় ভৃত্য ছিল, এবং তাহার আর একটি দোষ ছিল, সে যে ফেল্নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্রনিবাসে ফেল্না বাস করিত, সেখানকার ছাত্রগণ রাইচরণকে লইয়া সর্বদা কৌতুক করিত, এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্নাও যে সেই কৌতুকানাশে যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসল-স্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড়ো ভালোবাসিত, এবং ফেল্নাও ভালোবাসিত, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঠিক বাপের মতো নহে, তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্মে সর্বদাই দোষ ধরে। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলি ভুলিয়া যায়—কিন্তু যে ব্যক্তি পুরা বেতন দেয় বার্ষিকের ওজর সে মানিতে চাহে না। এদিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্না আজকাল বসনভূষণের অভাব লইয়া সর্বদাই খুঁৎখুঁৎ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

একদিন রাইচরণ হঠাৎ কর্ণে জ্বাব দিল এবং ফেল্নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল,—আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছু দিনের মতো দেশে যাইতেছি। এই বলিয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকূল বাবু তখন সেখানে মুনসেফ ছিলেন।

অনুকূলের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গৃহিণী এখনো সেই পুত্রশোক বন্ধের মধ্যে লালন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবু কাছারি হইতে আগিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কতটী একটি সন্ধ্যাসীর নিকট হইতে সম্মান-কামনায় বহুমূল্যে একটি শিকড় ও আশীর্ব্বাদ কিনিতেছেন—এমন সময়ে প্রাঙ্গণে শব্দ উঠিল, “জয় হোক্‌ শ্রী।”

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে রে?”

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, “আমি রাইচরণ।”

বৃদ্ধকে দেখিয়া অনুকূলের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন এবং আবার তাহাকে কর্ণে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাইচরণ ম্লান হাস্য করিয়া কহিল, “মাঠাকুরুণকে একবার প্রণাম করিতে চাই।”

অনুকূল তাহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মাঠাকুরুণ রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদর করিলেন না—রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া জোড়হস্তে কহিল, “প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মাও নয়, আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এই আমি—”

অনুকূল বলিয়া উঠিলেন, “বলিস্‌ কিরে। কোথায় সে।”

“আজ্ঞা, আমার কাছেই আছে, আমি পরশু আনিয়া দিব।”

সেদিন রবিবার, কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রী-পুরুষে দুইজনে উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ উপস্থিত হইল।

অনুকূলের স্ত্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া অতৃপ্তনয়নে মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক ছেলোটী দেখিতে বেশ—বেশভুষা আকারপ্রকারে দারিদ্র্যের কোন লক্ষণ নাই। মুখে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্জ ভাব দেখিয়া অনুকূলের হৃদয়েও সহসা স্নেহ উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোনো প্রমাণ আছে?”

রাইচরণ কহিল, “এমন কাজের প্রমাণ কী করিয়া থাকিবে? আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।”

অনুকূল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলোটিকে পাইবামাত্র তাঁহার স্ত্রী সেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন এখন প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করা সুযুক্তি নহে; যেমনি হউক বিশ্বাস করাই ভালো, তা ছাড়া, রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবে? এবং বৃদ্ধ ভৃত্য তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে?—

ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে, সে শিশুকাল হইতে রাইচরণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনো তাহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভৃত্যের ভাব ছিল।

অনুকূল মন হইতে সন্দেহ দূর করিয়া বলিলেন, “কিন্তু রাইচরণ, তুমি আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পাইবি না।”

রাইচরণ করজোড়ে গদগদকণ্ঠে বলিল, “প্রভু, বৃদ্ধবয়সে কোথায় যাইব।”

কর্তা বলিলেন, “আহা থাক্। আমার বাছার কল্যাণ হউক। ওকে আমি মাপ করিলাম।”

ন্যায়পরায়ণ অনুকূল কহিলেন, “যে কাজ করিয়াছে উহাকে মাপ করা যায় না।”

রাইচরণ অনুকূলের পা জড়াইয়া কহিল, “আমি করি নাই, দেখুন করিয়াছেন।”

নিজের পাপ দৈশ্বরের স্বাক্ষরে চাপাইবার চেষ্টা দেখিয়া অনুকূল আরও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।”

রাইচরণ প্রভুর পা ছাড়িয়া কহিল, “সে আমি নয় প্রভু।”

“তবে কে?”

“আমার অদৃষ্ট।”

কিন্তু এরূপ কৈফিয়তে কোনো শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না।

রাইচরণ বলিল, “পৃথিবীতে আমার আর কেহ নাই।”

ফেল্‌না যখন দেখিল সে মুনসেফের সন্তান, রাইচরণ তাহাকে এতদিন চুরি করিয়া নিজের ছেলে বলিয়া অপমানিত করিয়াছে, তখন তাহার মনে মনে কিছু রাগ হইল। কিন্তু তথাপি উদারভাবে পিতাকে বলিল, “বাবা উহাকে শাপ করো। বাড়িতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া দাও।”

ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল; তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে ও নামে কোনো লোক নাই।

সুয়েজ খালে

স্বামী বিবেকানন্দ

ইহার নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত—‘বিবেকানন্দ’ ইহার সন্যাসাশ্রমের নাম। ইনি ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার শিমুলিয়ায় প্রসিদ্ধ দত্ত-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম বিশুনাথ দত্ত। নরেন্দ্রনাথ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বি.এ. পাশ করিয়া আইন অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রভাবে সন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। পরমহংসদেবের দেহত্যাগের পর, ছয় বৎসর কাল ইনি হিমালয়ে সাধনায় অতিবাহিত করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় শিকাগো নগরে “পার্লানেন্ট অব রিলিজন্স” নামক মহতী সভায় ইনি হিন্দুধর্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আমেরিকায় নানা স্থানে ইনি বক্তৃতা করিয়া তদ্রূপবাসীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদেশে পারী নগরে “কংগ্রেস অব রিলিজন্স” নামক সভায় ইহার অনন্যসাধারণ প্রতিভায় সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার যুরোপীয় শিষ্যগণের মধ্যে মিঃ মার্গারেট নোব্ল বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; ইনি ‘ভগিনী নিবেদিতা’ নামে পরিচিতা। স্বদেশে স্বামীজী ‘রামকৃষ্ণ মিশন,’ ‘রামকৃষ্ণ হোম,’ ‘ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়’ প্রভৃতি বহু লোক-হিতকর প্রতিষ্ঠান ও সেবাশ্রম স্থাপন

করেন। ইহার রচিত ‘জ্ঞানযোগ,’ ‘কর্মযোগ,’ ‘রাজযোগ,’ ‘শিকাগো বক্তৃতা,’ ‘ভক্তি-রহস্য’ প্রভৃতি পুস্তকে এবং ইহার ইংরেজী রচনাবলীতে ইহার অনন্ত ধর্ম-বিশ্বাস ও স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ৪১ বৎসর বয়সে বিবেকানন্দ পরলোক-গমন করেন।

এ সুয়েজ খাল খাতস্থাপত্যের এক অদ্ভুত নিদর্শন। ফড়িনেও লেসেপ্স নামক এক ফরাসী স্থপতি এই খাল খনন করেন। ভূমধ্য সাগর আর লোহিত সাগরের সংযোগ হ’য়ে, ইউরোপ আর ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের অত্যন্ত সুবিধা হ’য়েছে। মানবজাতির উন্নতির

সুয়েজ খাল।

বর্তমান অবস্থার জন্য যতগুলি কারণ প্রাচীন কাল থেকে কাজ ক’রছে, তার মধ্যে বোধ হয় ভারতের বাণিজ্য সর্বপ্রধান। অনাদি কাল হ’তে উর্বরতায় আর বাণিজ্যে, শিল্পে, ভারতের মত দেশ কি আর আছে?

ভারতের বাণিজ্যই সকল জাতির উন্নতির কারণ।

দুনিয়ার যত সুতি কাপড়, তুলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মোতি ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ বৎসর আগে পর্য্যন্ত ছিল, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হ’তে যেত। তা ছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমী, পশমিনা, কিংখাব ইত্যাদি এ দেশের মত কোথাও হ’তো না। কাজেই অতি প্রাচীন কাল হ’তেই, যে দেশ যখন সভ্য হ’ত তখনই ঐ সকল জিনিষের জন্য ভারতের উপর নির্ভর ক’রত। এই বাণিজ্য দু’টি প্রধান ধারায় চলত : একটি ডাক্ষা-পথে আফগানি

ভারতের পথ।

ইরানী দেশ হ’য়ে, আর একটি জলপথে রেড্‌ সি হ’য়ে। সিকন্দার সা, ইরান-বিজয়ের পর, নিয়ার্কস্‌ নামক সেনাপতিকে জলপথে সিঙ্কনদের মুখ হ’য়ে সমুদ্র পার হ’য়ে লোহিত সমুদ্র দিয়ে, রাস্তা দেখতে পাঠান। বাবিলন, ইরান, গ্রীস, রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ঐশ্বর্য্য যে কত পরিমাণে ভারতের বাণিজ্যের উপর নির্ভর ক’রত, তা অনেকে জানে না। রোম-ধ্বংসের পর মুসলমানি বোগদাদ ও ইতালীয় ভিনিস ও জেনোয়া ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান পাশ্চাত্য কেন্দ্র হ’য়েছিল। যখন তুর্কেরা রোম-সাম্রাজ্য দখল ক’রে ইতালীয়দের ভারত-বাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ ক’রে দিলে, তখন জেনোয়া-নিবাসী কলম্বুস (ক্রিস্টোফোরো কলম্বো) আটলান্টিক পার হ’য়ে ভারতে আসবার নূতন রাস্তা বার করবার চেষ্টা করেন, ফল—আমেরিকা

মহাদ্বীপের আবিষ্কৃত্য। আমেরিকায় পৌঁছেও কলম্বুসের ভ্রম যায়নি যে, এ ভারতবর্ষ নয়। সেই জন্যই আমেরিকার আদিম-নিবাসীরা এখনও ইণ্ডিয়ান নামে অভিহিত। বেদে সিদ্ধু নদের “সিদ্ধু,” “ইন্দু” দুই নামই পাওয়া যায়; ইরানীরা তাকে “হিন্দু,” গ্রীকরা “ইণ্ডুস” কোরে তুললে; তাই থেকে ইণ্ডিয়ান। মুসলমানি ধর্মের অভ্যুদয়ে “হিন্দু” দাঁড়ান—কাল (খারাপ), যেমন এখন—নোটিভ।

এ দিকে পোর্্তুগীসরা ভারতের নূতন পথ, আফ্রিকা বেড়ে আবিষ্কার করলে। ভারতের লক্ষ্যী পোর্্তুগালের উপর সদয়া হ'লেন; পরে ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ। ইংরেজের ঘরে ভারতের বাণিজ্য রাজস্ব সমস্তই; তাই ইংরেজ এখন সকলের উপর বড় জাত। তবে এখন আমেরিকা

ইউরোপ ভারতের সভ্যতার প্রভৃতি দেশে ভারতের জিনিসপত্র অনেক স্থলে ভারত অপেক্ষাও উত্তম উৎপন্ন হচ্ছে, তাই ভারতের আর নিকট সম্পূর্ণ ঋণী।

তত কদর নাই। একথা ইউরোপায়েরা স্বীকার ক'রতে চায় না। ভারত—নোটিভপূর্ণ, ভারত যে তাদের ধন, সভ্যতার প্রধান সহায় সম্বল, সে কথা মানতে চায় না, বুঝতেও চায় না। আমরাও বোঝাতে কি ছাড়ব?

ভেবে দেখ, কথাটা কি। ঐ যারা চাষাভূষা তাঁতিজোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য, বিজ্ঞাতি-বিজিত স্বজাতি-নিজিত ছোট জাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ ক'রে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রকৃতির নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্তন হ'য়ে যাচ্ছে। দেশ, সভ্যতা, প্রাধান্য—ওলট-পালট হ'য়ে যাচ্ছে। হে ভারতের শ্রমজীবী!

ভারতের ছোট জাত পূজার্থ। তোমার নীরব, অনবরত-নিদ্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ

বাবিলন, ইরান, আলকসাদিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জোনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি?—কে ভাবে এ কথা। তোমাদের পিতৃপুরুষ খানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির ক'রেছেন—তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে; আর যাদের কুধিরগ্রাবে মনুষ্যজাতির যা-কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে?

লোকজয়ী ধর্মবীর, রণবীর, কাব্যবীর সকলের চ'খের উপর, সকলের পূজ্য ; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নিতীক কার্যকারিতা,—আমাদের গরীবেরা ঘর-দুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে কর্তব্য ক'রে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুকও অক্রেণে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিকাম হয়,—কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজ্ঞান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য,—সে তোমরা, ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী!—তোমাদের প্রণাম করি।

প্রতাপাদিত্য

ক্ষারোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

[১২৭০ সালে (১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) ক্ষীরোদপুসাদের জন্ম হয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং তিন বৎসর পরে 'জেনারেল এসেমব্লীজ ইনস্টিটিউশন'এ রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপনায় বৃত্তী হন। কিন্তু সাহিত্য-সাধনার পথের প্রতিফল বোধ হওয়ায় ইনি অধ্যাপকের কার্য ত্যাগ করেন। বহু নাট্য-গ্রন্থ ও উপন্যাস ইনি লিখিয়া গিয়াছেন। ইনি ভক্তবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ইঁহার সম্পাদিত 'অলৌকিক রহস্য' নামক মাসিক পত্র অনেকের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছিল। 'আলিবাবা,' 'পুনোদরঞ্জন,' 'সাবিত্রী,' 'রক্তাবতী,' 'পদ্মিনী,' 'প্রতাপাদিত্য,' 'চাঁদবিবি,' 'কিনুরী,' 'উলুপী,' 'আলমগীর,' 'ভীষ্ম,' 'নর-নারায়ণ,' 'নিবেদিতা,' 'গুহামুখে,' 'গুহামধ্যে,' 'নারায়ণী' প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার সাহিত্য-সাধনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ১৩৩৪ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

যশোহর—গোবিন্দদেবের মন্দির প্রাঙ্গণ

বিক্রমাদিত্য ও বনস্বরায়

বিক্রমাদিত্য। হা হে ভায়া, মালখাজনা সমস্ত আশ্রায় রওনা ক'রে দিয়েছ

বসন্তরায়। তা না ক'রে কি আপনার সঙ্গে নিশ্চিত হ'য়ে কথা কইতে পাচ্ছি। সে সমস্ত—পাই কড়া ক্রান্তি পর্যন্ত দিয়েছি।

বিক্রম। বেশ করেছ ভাই। ওইটেই হ'চ্ছে আসল কাজ। সদর মালগুজারী খাজাকীখানায় আগে আন্জাম ক'রে, তা'র পরে যা' খুসী তাই কর। সখের কাজই বল, আর দেবতা-অর্চনাই বল,—দোল-দুর্গে। সব, শ্রাদ্ধশাস্তি, ক্রিয়াকলাপ এ সব পরের কথা। জমিদারী বজায় থাকলে ত' এ সব।

বসন্ত। তা' আর ব'লতে। তা'র উপর চারিধারে শত্রু।

বিক্রম। চারিধারে শত্রু। এই সোনার রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা ক'রেছ, বন কেটে নগর ব'সিয়েছ। এ পাকা আমটির ওপর অনেক কাঠবিড়ালীর নজর আছে।

বসন্ত। তবে আমরা খাড়া থাকলে কা'রে ভয়?

বিক্রম। বস্, বস্! খাড়া থাকলে কা'রে ভয়? তুমি বুদ্ধিমান, তোমাকে আর বুঝাব কি? দায়ুদ খাঁর সঙ্গে বহু লোকের সর্বনাশ হ'য়েছে। আমাদের বাপ পিতামহের পুণ্যবলে ক্ষতি না হ'য়ে উল্টে লাভ হ'য়ে গেছে। আজ আমরা বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া। এখন এমন রাজ্যটি যা'তে বজায় রাখতে পার, কেবল সেই চেষ্টা কর। মাটি ত' নয়, যেন সোনা। ভাল রকম আবাদ ক'রতে পারলে সোনা ফলান যায়। কিন্তু হ'লে কি হবে ভাই। তুমি আমি যত দিন আছি, তত দিন বিপদের কোন ভয় দেখি না। একটু নরম মেজাজে নবাবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক'রে চলা—সেটা তুমি আমি যত দিন আছি, তত দিন। ছেনেপিলেগুলো কি তেমন মিলেমিশে চ'লতে পারবে? আমার বাপধন যেরূপ উদ্ধতপ্রকৃতি, তা'কে ত' একটুও বিশ্বাস করা যায় না।

বসন্ত। সে কি, মহারাজ। প্রতাপকে উদ্ধতপ্রকৃতি দেখলেন কখন?

বিক্রম। না, না—তা এখনও দেখিনি বটে। তবে কি জ্ঞান, কিছু চঞ্চল।

বসন্ত। চঞ্চল, না শাস্ত?

বিক্রম। হ্যাঁ হ্যাঁ—এখনও শাস্ত আছে বটে—এখনও চঞ্চলটা নয় বটে।

বসন্ত। চঞ্চল বটে আমার ছেলেরা। বিশ্वास নেই বরং তাঁদের।
প্রতাপ চঞ্চল। প্রতাপের মত ছেলে কি আর দেখতে পাওয়া যায়।

বিক্রম। হ্যাঁ হ্যাঁ—এখনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বটে—তবে কি
না—তবে কি না—যতটা ব'লছ,—ততটা যে ঠিক—বুঝেছ বসন্ত। একেবারে
বাবাজীকে তুমি যে—বুঝেছ, ভাই—

বসন্ত। আপনি কি প্রতাপকে সন্দেহ করেন নাকি?

বিক্রম। হ্যাঁ-হ্যাঁ। একেবারে যে সন্দেহ—হ্যাঁ-হ্যাঁ। তবে কি না,—

বসন্ত। কেন প্রতাপের ওপর আপনি অন্যায় সন্দেহ ক'রলেন?
এ রাজ্যের যদি কেউ মর্যাদা রাখতে পারে ত' সে এক প্রতাপ।

বিক্রম। যাক্—যাক্—ও কথা ছাড়ান দাও—ও কথা ছাড়ান দাও।
দুর্গ। দুর্গমহরে—দুর্গ। দুর্গমহরে। যাক্—যাক্—বিক্রমপুর বাক্‌লা থেকে
তুমি যে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সব আনবে বলেছিলে, তাঁর ক'রলে কি?

বসন্ত। আনতে লোক ত' পাঠিয়েছি।

বিক্রম। বেশ, বেশ। গোবিন্দদেব-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যশোরে
ব্রাহ্মণ কায়স্থেরও প্রতিষ্ঠা কর। বস্—তা হ'লেই ঠিক হবে। দেবতা
ব্রাহ্মণ—কুটুম্ব নারায়ণ আনাও, প্রতিষ্ঠা করাও, তা হ'লেই মঙ্গল হবে। দুর্গ।
দুর্গমহরে।—তা হ'লে যাও ভাই—প্রাতঃকৃত্য সার গে'।

বসন্ত। আপনি কেবল তাঁদের বাসস্থান নির্দেশ ক'রে দেবেন।

বিক্রম। বেশ, বেশ—দু'জনে পরামর্শ ক'রে যা কর্তব্য হয় করা যাবে।

বসন্ত। যথা আজ্ঞা।

[পুত্ৰান]

বিক্রম। এমন ভাই পেলে, বাদশাগিরি পেয়েও তার হাতে মাথা রেখে
নিশ্চিত হ'য়ে ঘুমুতে পারি। কিন্তু ছেলেকেই আমার বিষম ভয়। প্রতাপের
কোপ্তির যে রকম ফল গুনেছি, তাতে পুত্রলাভ ক'রেও আমার হর্ষে বিষাদ।
ঠিকুজীতে যখন ব'লেছে—প্রতাপ পিতৃদ্রোহী হবে, তখন কি সে কথা আর
মিথ্যে হবার যো আছে? যাক্, আর ভেবেই বা কি ক'রব? ছ'দিনের দিন
বিধাতা সূতিকা-ঘরে ব'সে কপালে যা আঁক কেটে গেছে, সে ত ঋণ দিবে
ঘম্লেও আর উঠবে না। দুর্গ। দুর্গমহরে—দুর্গ।—দুর্গমহরে। তবে কি

না—তবে কি না—পিতৃদ্রোহী সম্ভান—জেনে শুনে ঘরে রাখা—দুধ-কলা দিয়ে কালসপ পোষা। দুর্গা—বসন্তকে যে ছাই এ কথা ব'লতেই পারছি না। আর ব'ললেই বা কি হবে, বসন্ত ত' বুঝবে না। যাক্—তারা শিব-সুল্লরী। ভেবে আর কি ক'রব? কালী কালভয়বারিণী মা!—তবে একটা স্তুতি হ'য়েছে। বসন্ত পরম বৈষ্ণব। স্বয়ং বৈষ্ণব-চুড়ামণি গোবিন্দদাস তাঁর সহায়। ছেলেটাকেও কোশল ক'রে তার দলে ভিড়িয়ে দিয়েছি। ভায়া আমার তাকে নিরামিষ ধরিয়েছে,—গলায় তুলসীর মালা পরিয়েছে। কাজটা অনেকটা এগিয়েছি। এখন মা কালীর ইচ্ছায়, ছেলেটাকে একেবারে নিরেট বৈষ্ণব ক'রতে পারলেই আমি নিশ্চিত।—ভবানন্দ।

(ভবানন্দের প্রবেশ)

ভবানন্দ। মহারাজ।

বিক্রম। দেখে এস ত' প্রতাপ কোথায়।

ভবা। আজ্ঞে মহারাজ, তিনি তুলসীমঞ্চ ব'সে মালা জপ ক'রছেন।

বিক্রম। বেশ, বেশ। আচ্ছা ভবানন্দ, প্রতাপের ভক্তিতে কেমন দেখছে বল দেখি?

ভবা। ওঃ! কি ভক্তি! তা আর আপনাকে পাপ মুখে কি ব'লব মহারাজ। হাতের মালা ঘুরতে না ঘুরতেই দু'চক্ষু দিয়ে দর দর ক'রে জল! যেন ইচ্ছামতী নদীতে বান ডেকে গেল।

বিক্রম। বেশ, বেশ।

ভবা। হয়ত' ব'ললে বিশ্বাস ক'রবেন না, গোবিন্দদাস বাবাজীরও বুঝি এত ভক্তি দেখিনি।

বিক্রম। বেশ, বেশ।—আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর দেখি, গোবিন্দদাস বাবাজীকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও দেখি।

[ভবানন্দের প্রস্থান]

বেশ হ'য়েছে। বসন্ত প্রতাপকে ঠিক বাগিয়ে এনেছে। তুলসীতলায় যখন ব'সিয়েছে, তখন আর ভাবনা কি। তুলসীর গন্ধ দু'দিন নাকে ঢুকলে, বাপধনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একেবারে নিরামিষ হ'য়ে যাবে। বস্—বস্—আর ভয় কি। দুর্গা। দুর্গা মহারে—দুর্গা। দুমুখহরে। তবু রজের ওপর একটু রসান

চড়িয়ে দিই। প্রতাপকে আনিরে গোবিন্দনাস বাবাজীর দু'টে। গান শুনিয়ে দিই।—ওরে।—

(ভৃত্যের পুবেশ)

যা ত', রাজকুমারকে একবার আমার কাছে আসতে বল্ ত'।

[ভৃত্যের পুষ্যান]

(গোবিন্দনাসের পুবেশ)

গোবিন্দদাস। শ্রীগোবিন্দ। অধীনকে স্মরণ করেছেন কেন মহারাজ ?

বিক্রম। এস বাবাজী, এস—এই অনেক দিন তোমার মুখে মধুর হরিনাম শুনি নি—তাই—বুঝেছে বাবাজী। সংসারচক্র—ঘুরে ঘুরেই ম'বুছি। কাজে স্রবার সাগর থাকতেও একটু যে চাক'ব', তাও পারছি নি। বাবাজী, ক্ষণেকের জন্য একটু কৃষ্ণনাম শুনিতে দাও।

গোবিন্দ। শ্রীগোবিন্দ। মহারাজ, নরাদম আমি। আজও পর্যন্ত অভিমান নিয়ে ঘুরে ম'বুছি। আমি যে মহারাজকে আনন্দ দিতে পারি, সে ভরসা আমার কই ? তবে দয়া ক'রে অধীনের মুখে কৃষ্ণনাম শুন্তে চেয়েছেন, এই আমার বহু ভাগ্য।

বিক্রম। বাবাজী। যে ব্যক্তি সাধু, তার কি আর অহঙ্কার থাকে ? থাক্—বাবাজী, একটা গেয়ে ফেল।

গোবিন্দ। কি গাইব, অনুমতি করুন।

বিক্রম। যা হ'ক একটা। ভাল কথা, সেই যে সে দিন বিদ্যাপতির আত্মনিবেদন গেয়েছিলে, সেটা আমার কানে বড়ই মধুর লেগেছিল।

গোবিন্দ। যে আজ্ঞে—

(গীত)

ভাতল সৈকতে বারিবিন্দু-সম

সুত মিত-রমণী-সমাজে ।

তৌহে বিগরি মন তাহে সমপি নু

অব মঝু হব কোন কাজে ॥

মাধব । হাম পরিণাম নিরাশা ।

তুঁহ জগতারণ দীন-দয়াময়

অতয়ে তৌহারি বিশোয়াসা ॥

বিক্রম। বা। বা। কি মধুর। কি ভাব।—তাতল সৈকতে—তাতে
আবার বারিবিন্দু সম—যেন তপ্তখোলার বালি—প'ড়'লুম মটর—হ'লুম ফুটকড়াই
—বা। বা। কি সুন্দর উপমা। তার ওপর আবার বারিবিন্দুটি প'ড়েছে কি
—অমনি চড়াং—খোলা একেবারে চোচাকুলা। মহাজন না হ'লে এ কথা
বলে কে? স্নাতো—মিতো—রমণী-সমাজে। বা। বা। কি চমৎকার।—
তবে রমণী-সমাজে যত জালা হ'ক্ আর না হ'ক্, বাবাজী। মাঝখান থেকে
এক স্নাতোর জালায় অস্থির হ'য়ে পড়েছি বাবাজী। স্নাতো এখন কাছি হ'য়ে
কোন দিন গলায় ফাঁস না লাগায়—ওরে। প্রতাপকে ডেকে আন্তে বললুম,
তা'র ক'রুলি কি?—

গোবিন্দ। তবে কি না তিনি দয়াময়।

বিক্রম। ওই।—যা' ব'লেছো বাবাজী। তবে কি না তিনি দয়াময়।—
সেই সাহসেই বেঁচে আছি।—ওরে। দেৱী ক'রছিস কেন? প্রতাপকে
আন্তে দেৱী ক'রছিস কেন?

(সম্মুখে বাণবিদ্ধ পক্ষীর পতন)

গোবিন্দ। হা গোবিন্দ। হা গোবিন্দ।—কি ক'রলে।

বিক্রম। ওরে। এ কি রে। ওরে। এ কাজ কে ক'রলে রে? ওরে।
এ জীবহত্যা কে ক'রলে রে? দোহাই বাবাজী—যেয়ো না।

গোবিন্দ। ক্ষমা করুন মহারাজ। অধীন আর এখানে থাকতে পারবে
না। যে স্থানে জীবহত্যা হয়, বৈষ্ণবের সে স্থানে থাকা উচিত নয়।
হা গোবিন্দ। কি ক'রলে।

[পুঙ্খান

বিক্রম। ওরে। এ জীবহত্যা কে ক'রলে রে।—

(প্রতাপের পুবেশ)

প্রতাপ। এ কি প্রতাপ। এ অকারণ প্রাণিহত্যা কে ক'রলে? নিশ্চিত হ'য়ে
সিঁদ্রনে ব'সে ভগবানের নাম শুন্ছিলুম—তাতে বাধা দিলে কে প্রতাপ?

প্রতাপ। ক্ষমা করুন মহারাজ, আমি ক'রেছি।

বিক্রম। না—না। তুমি কেন এ কাজ ক'রবে? এই শুন্লুম, তুমি
ভগবানকে ব'সে হরিনাম জপ ক'রছিলে। এ নিষ্ঠুর কার্য্য তুমি ক'রবে কেন।

প্রতাপ। কিছুক্ষণ জপে নিযুক্ত হ'য়ে বুঝুন—আমি হরিনাম-জপের যোগ্য নই। অসংখ্য প্রজাশাসনের জন্য দু'দিন পরে যা'কে রাজদণ্ড হাতে ক'রতে হবে, আশ্রয়-ভিখারী দুর্বলকে রক্ষা ক'রতে কথায় কথায় যাকে অস্ত্র ধ'রতে হবে, অহিংসাময় বৈষ্ণবধর্ম তার নয়। শক্তি-অভিমानी যশোর-রাজকুমারের একমাত্র অবলম্বন মহাশক্তির আশ্রয়। তাঁর কাছে কর্তব্যানুরোধে জীবহিংসা, তাঁর মনস্তাট্টির জন্য অঞ্জলিপূর্ণ শক্রশোণিতে মহাকালীর তর্পণ। পিতা। তাই আমি এই শোণিতপিপাসু রাজপক্ষীকে শরাঘাতে সংহার ক'রেছি।

(শঙ্করের পুবেশ)

শঙ্কর। মিথ্যা কথা, এ কার্য আমি ক'রেছি।

বিক্রম। তাই ত' বলি—তাও কি কখন হয়? ব্রাহ্মণের মর্যাদা রাখতে প্রতাপ আমার পিতৃসম্মুখে মিথ্যা কথা ক'য়েছে। এই শুনুন তুমি পরম বৈষ্ণব হ'য়েছো। তুমি এমন কাজ ক'রবে কেন।

প্রতাপ। না পিতা, মিথ্যা নয়। এ ব্রাহ্মণকে এর পূর্বে আমি আর কখন দেখিনি। আমারই শরাঘাতে এই পক্ষী নিহত হ'য়েছে।

শঙ্কর। না মহারাজ। মিথ্যা কথা। এই উদ্ভীষমান রাজপক্ষী আমার শরাঘাতেই নিহত হ'য়েছে।

প্রতাপ। সাবধান ব্রাহ্মণ। রাজার সম্মুখে মিথ্যা কথা ক'য়ো না।

শঙ্কর। সাবধান রাজকুমার। বৈষ্ণবধর্ম পরিত্যাগ ক'রে মহাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ ক'রো না। এ কার্য আমি ক'রেছি।

প্রতাপ। মিথ্যা কথা, আমি ক'রেছি।

শঙ্কর। ভাল, বাগ্বিতওয়ায় প্রয়োজন কি? সম্মুখেই পাখী প'ড়ে আছে। পরীক্ষা কর। কা'র শরাঘাতে এ পক্ষী নিহত হ'য়েছে এখনি বুঝতে পারা যাবে।

প্রতাপ। বেশ, তা'তে আর আপত্তি কি।

শঙ্কর। ধর্মাবতার যশোরেশ্বর সম্মুখে—তাঁর সম্মুখে পরীক্ষা—সুবিচারের প্রত্যাশা করি। কিন্তু রাজকুমার, পরীক্ষার আগে একটা প্রতিজ্ঞা কর। যদি তোমার বাণে এ পক্ষী বিদ্ধ হয়, তা হ'লে ব্রাহ্মণ হ'য়েও আমি কায়স্থ-কুলতিলক বিক্রমাদিত্য-নন্দনের দাস স্বীকার ক'রবো। আর আশা হ'তে যদি এ কার্য

সাধিত হয়, তা' হ'লে প্রতিশ্রুত হও রাজকুমার, তুমি অবনতমস্তকে এই ভিখারী ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার ক'রবে।

প্রতাপ। বেশ, প্রতিজ্ঞা ক'রলুম।—কিন্তু ব্রাহ্মণ। পরীক্ষার মীমাংসা হবে কি ক'রে?

শঙ্কর। তুমি কোন্ স্থান লক্ষ্যে শরসন্ধান ক'রেছ?

প্রতাপ। আমি পাখীর পক্ষভেদ ক'রেছি।

শঙ্কর। আর আমি মস্তক চূর্ণ ক'রেছি।

(বিজয়ার পূবেশ)

বিজয়া। আর আমি হৃদয় বিদ্ধ ক'রেছি।

বিক্রম। এ কি। এ কি অপূর্ব মূর্তি। এ কি হেঁয়ালি। কে তুমি? এ সমস্ত কি প্রতাপ।

প্রতাপ। তাই ত'। এ কি অপূর্ব মূর্তি। কিছু ত' জানি না মহারাজ। এ প্রদীপ্ত অনলোল্লাস, এ মন্তমাতঙ্গলাঞ্জন পাদক্ষেপ, এ অপূর্ব রণোন্মাদন বেশ আর কখন ত' দেখিনি মহারাজ। কে তুমি মা? কোথা থেকে এলে? কেন এলে?

শঙ্কর। যথাথই কি এলি মা। দুর্বল-পীড়ন-দর্শন-কাতর, সহস্রধা-ভিন্ন-অস্তর এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাতরকণ্ঠ তবে কি তোর কর্ণে পৌঁছেছে মা।

বিজয়া। এই দেখ শঙ্কর, হতভাগ্য পক্ষীর মস্তক ভিন্ন। এই দেখ প্রতাপ, পক্ষ ছিন্ন। আর এই দেখ মহারাজ, পক্ষিহৃদয়ে কি গভীর শরাঘাত। কিন্তু জানতে পারি কি ব্রাহ্মণ। কেন তুমি এই শ্যেনপক্ষীর উপর অস্ত্র নিক্ষেপ ক'রেছিলে?

শঙ্কর। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের চিরদুর্বল করে লক্ষ্য-ভেদের শক্তি আছে কি না পরীক্ষা ক'রেছিলুম।

প্রতাপ। আর আমি দেখলুম, মা।—হিন্দুস্থানের এ সীমান্ত-প্রদেশের বনভূমির একটা ক্ষুদ্র নগর হ'তে নিষ্কিপ্ত বাণ কখনও কোনও কালে আগ্রার সিংহাসনে পৌঁছাতে পারে কি না।

বিজয়া। আর আমি দেখলুম, মহারাজ।—মহারাজের প্রাসাদশিখরে অগণ্য শ্বেত পারাবত মনের সাথে বিচরণ ক'রছে। তা'দের সেই আনন্দের সংসার ছারখার ক'রবার জন্য একটা ভীষণ মাংসাশী পক্ষী অলক্ষ্যে আকাশপথে

ধুরে বেড়াচ্ছে। মহারাজ। বিশ বৎসর পূর্বে এমনি একটি সুখের সংসার ছারখার হ'য়েছিল। তা'র ফলে একটি ব্রাহ্মণ-কন্যা শিশুকাল হ'তে ভীষণ অরণ্যবাসিনী কুমারী—কপালিনী। কল্পনায় সে স্মৃতি জেগে উঠলো। প্রতিশোধ-বাসনায় কল্পিত কর হ'তে আপনা-আপনি শর ছুটে গেল, পাখীর ছনয় বিদ্ধ হ'ল।—এই নাও প্রতাপ, পক্ষী নাও। এই ত্রিবা-বিভিনু বিহঙ্গম তোমার বিজয়পতাকার চিহ্ন হ'ক।

[পুমান

শঙ্কর। এ কি মা। দেখা দিয়ে যাস্ কোথায়। সর্বনাশী। আশ্রয় দিয়ে আবার আমাদের আশ্রয়হীন করিস্ কেন?

প্রতাপ। এ কি মা বিজয়লক্ষ্মি। হতভাগ্য সন্তানের চক্ষে একটা নুতন জীবনের আভাস দিয়ে আবার তাকে অন্ধকারে ফেলে যাস্ কোথা?

শঙ্কর। রাজকুমার। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্রাহ্মণ আজ থেকে তোমার ভূতা।

প্রতাপ। ব্রাহ্মণ। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রতাপ আজ থেকে তোমার দাসানুদাস।

[পরস্পরের আলিঙ্গন ও পুমান

বিক্রম। ওরে—ওরে—কে কোথা রে। ও বসন্ত—বসন্ত—কোথা রে। কি হ'ল রে।

নিয়মের রাজত্ব

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

[মুদ্রাদ্রাব জেনার কালি মহকুমার রামেন্দ্রসুন্দর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্ৰহণ করেন। ইনি বিদ্যাবিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্ৰহণ করেন এবং উত্তরকালে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হন। বিজ্ঞানবিৎ হইলেও ইনি সর্বশাস্ত্রেই অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকগণের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর অন্যতম—ইহার 'জিজ্ঞাসা,' 'যজ্ঞকথা' প্রভৃতি পুস্তক বঙ্গভাষার অনকার-স্বরূপ। ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রধান কর্মী ছিলেন এবং দেশীয় শিক্ষা,

সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে বহুবিধ হিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন। মানুষ-হিসাবেও ইহার তুলনা দুলভ।]

বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য, এইরূপ একটা বাক্য আজকাল সর্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানসম্পৃক্ত যে-কোন গ্রন্থ হাতে করিলেই দেখা যাইবে যে, লেখা রহিয়াছে, প্রকৃতির রাজ্যে অনিয়মের অস্তিত্ব নাই—সর্বত্রই নিয়ম, সর্বত্রই শৃঙ্খলা। মানুষের রাজ্যে আইন আছে বটে, এবং সেই আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে; কিন্তু অনেকেই আইনকে ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভ করে। কিন্তু বিশ্বজগতে, অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যে যে সকল আইনের বিধান বর্ত্তমান, তাহার একটাকেও ফাঁকি দিবার যো নাই। কোথাও ব্যভিচার নাই; কোথাও ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভের উপায় নাই। কাজেই প্রাকৃতিক নিয়মের জয়গান করিতে গিয়া অনেকে পুলকিত হন, তাবাবেশে গদগদকণ্ঠ হইয়া থাকেন, তাঁহাদের দেহে বিবিধ সাত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়।

যাঁহারা ‘মিরাকুল’ বা অতিপ্রাকৃত মানেন, তাঁহারা সকল সময়ে এই নিয়মের অব্যভিচারিতা স্বীকার করেন না, অথবা প্রকৃতিতে নিয়মের রাজত্ব স্বীকার করিলেও, অতিপ্রাকৃত শক্তি সময়ে সময়ে সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ স্বীকার করেন। যাঁহারা মিরাকুল মানিতে চাহেন না, তাঁহারা প্রতিপক্ষকে মিথ্যাবাদী, নিব্বোধ, পাগল ইত্যাদি মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করেন।

বর্ত্তমান অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়ম-সম্বন্ধে নূতন করিয়া গম্ভীরভাবে একটা সম্ভর্ড লিখিবার সময় গিয়াছে, এরূপ মনে না করিলেও চলিতে পারে।

প্রাকৃতিক নিয়ম কাহাকে বলে? দুই-একটা দৃষ্টান্ত-দ্বারা স্পষ্ট করা যাইতে পারে। গাছ হইতে ফল চিরকালই ভূমি-পৃষ্ঠে পতিত হয়। এ পর্য্যন্ত যত গাছ দেখা গিয়াছে ও যত ফল দেখা গিয়াছে, সর্বত্রই এই নিয়ম। যে দিন লোষ্ট্রপাতিত আম্র ভূ-পৃষ্ঠে অনেঘণ না করিয়া আকাশমার্গে ধাবিত হইবে, সে ভয়াবহ দিন মনুষ্যের ইতিহাসে বিলম্বিত হউক।

ফলে—আম বন, জাম বন, নারিকেল বন, সকলে অধোমুখে ভূমিতে পড়ে, কেহই উর্দ্ধমুখে আকাশপথে চলে না। কেবল আম, জাম, নারিকেল

কেন, যে-কোন দ্রব্য উর্দ্ধে উৎক্ষেপ কর না, তাহাই কিছুক্ষণ পরে ভূমিতে নামিয়া আসে। এই সাধারণ নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম এ পর্য্যন্ত দেখা যায় না।

অতএব ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। পাখির দ্রব্যমাত্রই ভূকেন্দ্রাভিমুখে গমন করিতে চাহে। এই নিয়মের নাম ভৌম আকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণ।

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মভঙ্গ হয় না; কাজেই যদি কেহ আসিয়া বলে, দেখিয়া আসিলাম, অমূকের গাছের নারিকেল আজ বৃন্তচ্যুত হইবামাত্র ক্রমেই বেলুনের মত উপরে উঠিতে লাগিল, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগ্য ব্যক্তির উপর বিবিধ নিন্দাবাদ বর্ষিত হইতে থাকিবে। কেহ বলিবে, লোকটা মিথ্যাবাদী; কেহ বলিবে লোকটা পাগল; কেহ বলিবে, লোকটা গুলি খায়; এবং যিনি সম্প্রতি রসায়ন-নানক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি হয়ত বলিবেন, হ'তেও-বা পারে, বুঝি ঐ নারিকেলটার ভিতর জলের পরিবর্তে 'হাইড্রোজেন' গ্যাস ছিল। কেন-না তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস যে, নারিকেল—খাঁটি নারিকেল, যাহার ভিতরে জল আছে, হাইড্রোজেন নাই, এ হেন নারিকেল—কখনই প্রাকৃতিক নিয়মভঙ্গে অপরাধী হইতে পারে না।

খাঁটি নারিকেল নিয়মভঙ্গ করে না বটে, তবে হাইড্রোজেনপূর্ণ বোম্বাই নারিকেল নিয়মভঙ্গ করিতে পারে। বৃষ্টি ভূমিতে পড়ে, কিন্তু মেঘ বায়ুতে ভাসে; 'প্যারাসুট'-বিলম্বিত আরোহী নীচে নামে বটে, কিন্তু বেলুনটা উপরে উঠে।

তবে এইখানে বুঝি নিয়মভঙ্গ হইল। পূর্ব্বে এক নিঃশ্বাসে নিয়ম বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, পাখির দ্রব্যমাত্রই নিম্নগামী হয়; কিন্তু এখানে দেখিতেছি, নিয়মের ব্যতিচার আছে; যথা—মেঘ, বেলুন ও হাইড্রোজেন-পোরা বোম্বাই নারিকেল। লোহা জলে ডোবে, কিন্তু শোলা ভাসে। কাজেই প্রকৃতির নিয়মে এইখানে ব্যতিচার।

অপর পক্ষ হাটবার নহেন; তাঁহারা বলিবেন,—তা কেন, নিয়ম ঠিক আছে। পাখির দ্রব্যমাত্রই নীচে নামে, এরূপ নিয়ম নহে। দ্রব্যমধ্যে জ্বাতিভেদ আছে। গুরু দ্রব্য নীচে নামে, লঘু দ্রব্য উপরে উঠে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। লোহা গুরু দ্রব্য, তাই জলে ডোবে; শোলা লঘু দ্রব্য,

তাই জলে ভাসে, ডুবাইয়া দিলেও উপরে উঠে। নারিকেল গুরু দ্রব্য ; উহা নামে। কিন্তু বেলুন লঘু দ্রব্য ; উহা উঠে।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম খুঁজিয়া বাহির করা বস্তুতঃই কঠিন। কার সাধ্য ঠকায় ? এ জিনিষটা উপরে উঠিতেছে কেন ? উত্তর, এটা যে লঘু। ঐ জিনিষটা নামিতেছে কেন ? উত্তর, ওটা যে গুরু। যাহা লঘু, তাহা ত উঠিবেই ; যাহা গুরু, তাহা ত নামিবেই ; ইহাই ত প্রকৃতির নিয়ম।

সোজা পথে আর উত্তর দিতে পারা যায় না ; বাঁকা পথে যাইতে হয়। লোহা গুরু দ্রব্য ; কিন্তু খানিকটা পারার মধ্যে ফেলিলে, লোহা ডোবে না, ভাসিতে থাকে। শোলা লঘু দ্রব্য ; কিন্তু জল হইতে তুলিয়া উর্দ্ধমুখে নিক্ষেপ করিলে ভুতলগামী হয়। তবেই ত প্রাকৃতিক নিয়মের ভেদ হইল।

উত্তর—আরে মূর্খ, গুরু-লঘু শব্দের অর্থ বুঝিলে না। গুরু মানে এখানে পাঠশালার গুরুমহাশয় নহে, বা মন্ত্রদাতা গুরুও নহে ; গুরু অথে অমুক পদার্থ অপেক্ষা গুরু অর্থাৎ ভারী। লোহা গুরু, তাহার অর্থ এই যে, লোহা বায়ু অপেক্ষা গুরু, জল অপেক্ষা গুরু, কাজেই বায়ুমধ্যে কি জলমধ্যে রাখিলে লোহা না ভাসিয়া ডুবিয়া যায়। আর লোহা পারা অপেক্ষা লঘু ; সমান আয়তনের লোহা ও পারা নিজিতে ওজন করিলে দেখিবে, কে লঘু, কে গুরু। পারা অপেক্ষা লোহা লঘু, সে জন্য লোহা পারায় ভাসে। প্রাকৃতিক নিয়মটার অর্থই বুঝিলে না, কেবল তর্ক করিতে আসিতেছ।

এ পক্ষ বলিতে পারেন, আপনার বাক্যের অর্থ যদি বুঝিতে না পারি, সে ত আমার বুদ্ধির দোষ নহে, আপনার ভাষার দোষ। গুরু দ্রব্য নামে, লঘু দ্রব্য উঠে, বলিবার পূর্বে গুরু-লঘু কাহাকে বলে, আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। আপনার আইনের ভাষাযোজনার দোষ ঘটিয়াছে ; উহার সংশোধন আবশ্যিক।

ভাষা-সংশোধনের পর, প্রাকৃতিক আইনের সংশোধিত ধারাটা দাঁড়াইবে এই রকম :

ধারা :—কোন দ্রব্য অপর তরল বা বায়বীয় দ্রব্যমধ্যে রাখিলে, প্রথম দ্রব্য যদি দ্বিতীয় দ্রব্য অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে নিম্নগামী হইবে, আর যদি লঘু হয়, তাহা হইলে উর্দ্ধগামী হইবে।

ব্যাখ্যা :—এক দ্রব্য অন্য দ্রব্য অপেক্ষা গুরু কি লঘু, তাহা উভয়ের সমান আয়তন লইয়া নিজিতে ওজন করিয়া দেখিতে হইবে।

উদাহরণ :—রাম প্রথম দ্রব্য, শ্যাম দ্বিতীয় দ্রব্য। রামকে শ্যামের আয়তন মত ছাঁটিয়া লইয়া তুল্যদণ্ডে ওজন করিয়া দেখ ; রাম যদি শ্যাম অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে শ্যামের মধ্যে রামকে রাখিলে রাম নিম্নগামী হইবে। শ্যামকে তরল পদার্থ মনে করিতে আপত্তি করিও না।

সংশোধনের পর আইনের ভাষা অত্যন্ত সুবোধ্য হইয়া দাঁড়াইল, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। এখন দেখা যাউক, কতদূর দাঁড়াইল। পাখিব দ্রব্যমাত্রই ভূমি স্পর্শ করিতে চাহে, নিম্নগামী হয়—ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম নহে। সূতরাং উহার ব্যভিচার দেখিলে, বিস্মিত হইবার হেতু নাই ; পাখিব দ্রব্য অবস্থা-বিশেষে, অর্থাৎ অন্য পাখিব বস্তুর সন্নিধানে, কখন-বা উপরে উঠে, কখন-বা নীচে নামে। যখন অন্য কোন বস্তুর সন্নিধানে থাকে না, তখন সকল পাখিব দ্রব্য নীচে নামে। যেমন শূন্যপ্রদেশে, ‘পাম্প’-যোগে কোন প্রদেশকে জলশূন্য ও বায়ুশূন্য করিয়া সেখানে যে-কোন দ্রব্য রাখিলে, তাহাই নিম্নগামী হইবে। আর বায়ুমধ্যে, জলমধ্যে, তেলের মধ্যে, পারদমধ্যে কোন জিনিস রাখিলে, তখন লঘু-গুরু বিচার করিতে হইবে। ফলে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম ; ইহার ব্যভিচার নাই। এই অর্থে প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য।

তবে, যত দোষ এই জলের আর তেলের, পারার আর বাতাসের। উহাদের সন্নিধি এই বিষম সংশয়-উৎপাদনের হেতু হইয়াছিল। ভাগ্যে মনুষ্য বুদ্ধিজীবী, তাই প্রকৃত দোষীর সন্ধান করিতে পারিয়াছে ; নতুবা প্রকৃতিতে নিয়মের প্রভুত্বটা গিয়াছিল আর কি।

বাস্তবিকই দোষ এই তরল পদার্থের ও বায়বীয় পদার্থের। বেলুন উপরে উঠে, বায়ু আছে বলিয়া ; শোলা জলে ভাসে, জল আছে বলিয়া ; লোহা পারায় ভাসে, পারা আছে বলিয়া ;—নতুবা সকলেই ডুবিত, কেহই ভাসিত না ; সকলেই নামিত, কেহই উঠিত না।

অর্থাৎ কিনা—পৃথিবী যেমন সকল দ্রব্যকেই কেন্দ্রমুখে আনিতে চায়, তরল ও বায়বীয় পদার্থ মাত্রই তেমনি মগ্ন দ্রব্যমাত্রকেই উপরে তুলিতে চায়। প্রথম ব্যাপারের নাম দিয়াছি মাধ্যাকর্ষণ ; দ্বিতীয় ব্যাপারের নাম দাও চাপ।

মাধ্যাকর্ষণে নামায় ; চাপে ঠেলিয়া উঠায় । যেখানে উভয় বর্তমান, সেখানে উভয়ই কার্য্য করে । যাহার যত জোর । যেখানে আকর্ষণ চাপ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর নামিতে হয় ; যেখানে চাপ আকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর উঠিতে হয় । যেখানে উভয়ই সমান, সেখানে “ন যযৌ ন তস্থৌ” ।

এখন, এ পক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিবেন,—দেখিলে, প্রাকৃতিক নিয়মে আর ব্যতিক্রম আছে কি ? আমাদের প্রকৃতির রাজ্যে কি কেবল একটা নিয়ম—কেবলই কি একটা আইন ? অনেক নিয়ম ও অনেক আইন, অথবা একই আইনের অনেক ধারা । যথা,—

১ নং ধারা—পাথিব আকর্ষণে বস্তুমাত্রই নিম্নগামী হয় ।

২ নং ধারা—তরল বা বায়বীয় পদার্থের চাপে বস্তুমাত্রই উর্দ্ধগামী হয় ।

৩ নং ধারা—আকর্ষণ ও চাপ উভয়ই যুগপৎ কাজ করে । আকর্ষণ প্রবল হইলে, নামায়,—চাপ প্রবল হইলে, উঠায় ।

কাহার সাধ্য, এখন বলে যে, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার আছে ? উঠিলেও নিয়ম, নামিলেও নিয়ম, স্থির থাকিলেও নিয়ম ; নিয়ম কাটাইবার যো নাই । প্রকৃতির রাজ্য বস্তুতঃই নিয়মের রাজ্য । নারিকেল ফল যে নিয়ম লঙ্ঘন করে না, তাহা যে দিন হইতে নারিকেল ফল মনুষ্যের ভক্ষ্য হইয়াছে, তদবধি সকলেই জানে । বেলুন যে উর্দ্ধগামী হইয়াও নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিল না, তাহাও দেখা গেল । কেন-না পৃথিবীর আকর্ষণ উভয় স্থলেই বিদ্যমান ।

বান্দালীর বিশিষ্টতা

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

[১২৭৪ সালে (১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় অনুগ্ৰহণ করেন এবং ১৩৩০ সালের কান্তিক মাসে ইহার মৃত্যু হয় । ইহার জীবনের প্ৰধানংশ গভর্নমেন্ট অফিসে ও অধ্যাপনা-কার্য্যে অতিবাহিত হয় । পরে সংবাদপত্রের সম্পাদন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া ইনি পুণ্ডিত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন । “বঙ্গবাণী,” “বঙ্গমতী,” “হিতবাদী,” “নাথক ” পুণ্ডিত সংবাদপত্রের

ইনি সম্পাদক ছিলেন। “সাহিত্য,” “বিজয়া,” “সারথি,” “বঙ্গবাণী” প্রভৃতি অধুনা-লুপ্ত মাসিক পত্রে ইহার লিখিত নানাবিধয়ক উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ আছে। ইনি ‘আইন-ই আকবরী’র বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। ‘উমা’ ও ‘রূপ-লহরী’ উপন্যাস ইহার লিখিত।]

বাঙ্গালী ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের জাতি-সকল হইতে পৃথক্ এবং স্বতন্ত্র। বাঙ্গালার স্বাতন্ত্র্য বাঙ্গালার বিশিষ্টতার মূল উপাদান। বাঙ্গালার উপাসনা-পদ্ধতি, কৰ্ম্ম-পদ্ধতি, সাহিত্য, ভাষা এবং জাতি ও কুল-পরিচয় প্রভৃতি বিষয় ইংরেজী যুগে ইংরেজী-নবীশ পণ্ডিতগণের দ্বারা যথারীতি আলোচিত হয় নাই, তাই ইংরেজী-নবীশ বাঙ্গালী স্বদেশের ও স্বজাতির প্রকৃত পরিচয় রাখেন না।

বৌদ্ধযুগে ধর্ম্ম, কৰ্ম্ম, শীল ও আচার লইয়া বাঙ্গালী নানান্দার পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছিল। বাঙ্গালীর আগমনী বাঙ্গালীর নিজস্ব; আগমনী-গান ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে নাই, আর কোন জাতি অমন গান করে নাই, গান করিতে জানে-ও না।

বাংলা ভাষা বাঙ্গালীকে অপূর্ব বিশিষ্টতা দিয়াছে। সে পরিচয় পাইতে হইলে, প্রায় সহস্র বৎসরের বাংলা ভাষার উন্মেষ-পদ্ধতি বুঝিতে হয়; সিদ্ধাচার্য্য-গণের গীত ও দৌহাবলী হইতে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পর্য্যন্ত সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মন্বন প্রয়োজন। এই বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস লুকান আছে। কবির গান, পাঁচালীর গান, শ্যামাবিষয়ক গান, কীর্ত্তনগাথা প্রভৃতি কত রকমের সঙ্গীত-সাহিত্য ছিল বা আছে, তাহাদের শ্রেণী-বিভাগ, বিশ্লেষণ এবং সে-সকল হইতে ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহ এখনও কেহ করে নাই, ঘটে-ও নাই। অথচ বাঙ্গালীর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ঘটনার উল্লেখ এই সকল গানে ও ছড়ায় নিবদ্ধ আছে।

বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা এবং ব্যক্তিত্ব সমাজ-শরীরের সর্ব্ব বিষয়ে—শিল্প-কলায়, গানে-নাচে, চিকিৎসা-শাস্ত্রে, চিকিৎসা-পদ্ধতিতে, ঔষধ-নির্মাণে, লাঠি-খেলায়, নৌ-শিল্পে, কথকতায়, বয়ন-শিল্পে, তসর-গরদের বসন-প্রস্তুতিতে, গজদন্তের কারুকার্য্যে, স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারে—সভ্য জাতির সকল ব্যসন-বিলাসে যেন সদাই স্পষ্টীকৃত হইয়া আছে। মনীষী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, বাঙ্গালার ভূগর্ভ হইতে যত প্রতিমা বাহির হইতেছে, যত বৌদ্ধমুর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাদের গঠন-ভঙ্গিমা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে

সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বতন্ত্র। বান্দালীর ভাস্কর্য্য অপূর্ব ও স্বতন্ত্র। বান্দালার বাদ্যভাণ্ডের মধ্যে খুব বিশিষ্টতা প্রকট হইয়া আছে; বান্দালার কবিওয়ানাাদের ঢোল-বাজান অপূর্ব ও অনন্যসাধারণ,—এমন ভাবে ঢোল বাজাইতে ভারতবর্ষের আর কোন জাতি পারে না। বান্দালীর গৃহ-নির্মাণ-পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। এমন ঘর ছাইতে ভারতবর্ষের, বুদ্ধি বা পৃথিবীর, আর কোন জাতিতে পারে না। বান্দালার আটচালা ও চণ্ডীমণ্ডপ-সকল সত্যি বিদেশীয়েদের বিস্ময় উৎপাদন করিত; এমনটি পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না—নাই-ও। এমন কি বান্দালার জনার্দন, বিশ্বেশ্বর, জনমেজয় প্রভৃতি কর্ণকারণ যেন তোপ, কামান তৈয়ার করিতে পারিত, দিল্লীর কারিকরে তেমনটি পারিত না; জাহান-কোষা, দল-মাদল, কালে-খাঁ প্রভৃতি কামান এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বান্দালীর নৌ-শির সত্যি অপরাজ্য ছিল। এমন নৌকা চালাইতে, জাল বুনিতে ভারতের আর কোন জাতি পারিত না। বান্দালার ‘ঘাট বৈঠা’র ছিপে চড়িয়া মীরকাশেম এক রাত্রেই গোদাগিরি হইতে মুন্সেরে গিয়াছিলেন। বান্দালার আর একটা শিল্প ছিল—কুসুম-শিল্প। নানা পুষ্পের আভরণ ও অলঙ্কার বান্দালী যেন তৈয়ার করিতে পারিত, এমন আর কোন জাতি পারিত না। আরঙ্গজেব-পুত্র যুবরাজ মহম্মদ পিতাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—“কি আর মণিমুক্তা চুনি-পান্নার লোভ দেখাও পিতা, বান্দালার কুসুমভরণ দিল্লীর জড়োয়া অলঙ্কার-সকলকে হেলায় পরাজয় করে,—এমনটি তুমি দেখ নাই।” সে শিল্প লোপ পাইয়াছে।

আসল কথাটি কি জান, বান্দালী আৰ্য্যাবর্তের আৰ্য্যগণ হইতে একটা সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতি। বৈদিক যুগের সময় হইতে বান্দালায় এক স্বতন্ত্র সভ্যতা ও মনুষ্য-সমাজ বিদ্যমান ছিল। প্রাচ্যের সে সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। বান্দালায় বৈদিক ধর্ম, সভ্যতা, আচার-ব্যবহার কিছুই শিকড় গাড়িয়া বসিতে পারে নাই। যুগে যুগে বারে বারে পশ্চিম দেশ হইতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি আমদানী করিয়াও বান্দালায় যাগযজ্ঞাদির তেমন প্রচলন হয় নাই। এত আক্রমণেও বঙ্গদেশ ও বান্দালী জাতি স্বীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, উপরন্তু আগন্তুকগণকে বান্দালার বিশিষ্টতায় মগ্ন করিতে পারিয়াছিল। স্বীকার করি বটে যে, বান্দালী আৰ্য্যাবর্ত হইতে, আৰ্য্যগণের নিকট হইতে

অনেক তথ্য, অনেক সিদ্ধান্ত, অনেক বিদ্যা সংগ্রহ করিয়াছিল; কিন্তু সে-সকলকে বাঙ্গালীর মনীষা যেন বাঙ্গালার কোমল পেলব পলিমাটির আবরণ দিয়া এতই মধুর, এতই স্নিগ্ধ, এমনই রসাল করিয়াছিল যে, পরে উহা আখ্যাবস্তু হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল।

চিনিতে জানি না, চিনিতে পারি না, চিনিতে ভুলিয়াছি বলিয়া—বাঙ্গালীর ধর্ম-কর্ম, সাধন-তত্ত্ব, ভাবের ভাষা, রসের ভাষা প্রভৃতি সব ভুলিয়াছি। আমরা বাঙ্গালী হইয়াও বাঙ্গালার শ্লাঘায় আর শ্লাঘা বোধ করি না। একবার তাকাও—মালঞ্চ-বেষ্টনী-পরিবৃত্ত বাঙ্গালীর নিজ নিকেতনের প্রতি সন্মুখে একবার তাকাও,—জাতির অতীত ইতিহাসের মুকুরে স্বদেহের, স্থায়ী সমাজ-শরীরের প্রতিবিম্ব দেখিয়া অধঃপতনের গভীরতা একবার বুঝিয়া লও; তাহা হইলে আবার যেমন ছিল, তেমনই হইবে,—হারানিধি ফিরাইয়া পাইবে, তোমাদের শ্যামা জন্মভূমি তোমাদেরই হইবে।

মন্ত্রশক্তি

প্রমথ চৌধুরী

[প্রমথ চৌধুরী বা 'বীরবল' বঙ্গসাহিত্যের একজন অতিপুণ্ডিত লেখক। পাবনা জেলার হরিপুরের পুণ্ডিত চৌধুরীবাংশে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। 'সবুজ পত্র' নামক পুণ্ডিত পত্রিকার সম্পাদকরূপে ইনি কথ্যভাষায় মানা বিষয়ক পুঙ্খবদ্ধ রচনা করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে নব-রীতির পুর্নর্জন করিয়াছিলেন। ইহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'বীরবলের খাতা,' 'চার ইয়ারী কথা,' 'সনেট পঞ্চাশৎ,' 'নীললোহিত,' 'ঘোষালের ত্রিকথা' প্রভৃতি সবিশেষ পুণ্ডিত। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার।]

মন্ত্রশক্তিতে তোমরা বিশ্বাস কর না, কারণ আজকাল কেউ করে না;—কিন্তু আমি করি। এ বিশ্বাস আমার জন্মোচ্ছে, শাস্ত্র পড়ে নয়, মন্ত্রের শক্তি চোখে দেখে'।

চোখে কি দেখেছি, বলছি।

দাঁড়িয়ে ছিলুম চণ্ডীমণ্ডপের বারাণ্ডায়। জন দশ-বারো লেঠেল জমায়েত হয়েছিল পূর্ব দিকে, ভোগের দালানের ভগ্নাবশেষের স্রুমুখে; পশ্চিমে শিবের মন্দির, যার পাশে বেলগাছে একটি ব্রহ্মদৈত্য বাস করতেন, যার সাক্ষাৎ বাড়ীর দাসী-চাকরানীরা কখনো কখনো রাত দুপুরে পেত,—ধোঁয়ার মত যার ধড়, আর কুয়াসার মত যার জটা। আর দক্ষিণে পূজোর আঙ্গিনা—যে আঙ্গিনায় লক্ষ বলি হয়েছিল বলে’ একটি কবন্ধ জন্মোচ্ছিল। এঁকে কেউ দেখেননি, কিন্তু সকলেই ভয় করতেন।

লেঠেলদের খেলা দেখবার জন্য লোক জুটেছিল কম নয়। মনিরুদ্দিন সর্দার, তার সৈন্য-সামন্ত কে কোথায় দাঁড়াবে, তারই ব্যবস্থা করছিল। কি চোহারা তার! গৌরবর্ণ, মাথায় ছ-ফুটের উপর লম্বা, গালে লম্বা পাকা দাড়ি, গোঁপ-ছাঁটা। সে ছিল ওদিগের সব সেরা লকড়িওয়াল।

এমন সময় নায়েববাবু আমাকে কানে কানে বললেন, “ঈশ্বর পাটনিকে এক হাত খেলা দেখাতে হুকুম করুন না। ঈশ্বর লেঠেল নয়, কিন্তু শুনেছি, কি লাঠি, কি লকড়ি, কি সড়কি—ও হাতে নিলে, কোন লেঠেলই ওর স্রুমুখে দাঁড়াতে পারে না। আপনি হুকুম করলে, ও ‘না’ বলতে পারবে না, কারণ ও আপনাদের বিশেষ অনুগত প্রজা।”

এর পর নায়েববাবু ঈশ্বরকে ডাকলেন। ভিড়ের ভিতর থেকে একটি লম্বা ছিপছিপে লোক বেরিয়ে এল। তার শরীরে আছে শুধু হাড় আর মাংস,—চৰি এক বিন্দুও নেই। রঙ তার কালো অথচ দেখতে সুপুরুষ।

আমি তাকে বললুম, “আজ তোমাকে এক হাত খেলা দেখাতে হবে।”

লোকটা অতি ধীরভাবে উত্তর করলে, “হজুর, লেঠেলি আমার জাত-ব্যবসা নয়। বাপ-ঠাকুরদার মত—আমিও খেয়ার নোকো পারাপার করেই দু’-পয়সা কামাই। আমার কাজ লাঠি খেলা নয়, লগি ঠেলা। তাই বলছি হজুর, এ আদেশ আমাকে করবেন না।”

আমি জিজ্ঞেস করলুম, “তা হ’লে, তুমি লাঠি খেলতে জানো না?”

সে উত্তর করলে, “হজুর, জানতুম ছোকরা বয়সে—তার পর আজ বিশ-পঁচিশ বছর, লাঠিও ধরিনি, লকড়িও ধরিনি, সড়কিও ধরিনি;—তা ছাড়া—

আর একটা কথা আছে। এদের কাছে আমি ঠাকুরের স্মৃতি দিব্যি করেছি যে, আমি আর লাঠি সড়কি ছোঁব না। সে কথা ভাঙি কি করে? হজুরের হুকুম হ'লে, আমি না বলতে পারিনে, তবে—হজুর যদি আমার কথাটা শোনেন, তবে হজুর আমাকে আর এ আদেশ করবেন না।”

আমি জিজ্ঞেস করলুম, “কেন এ রকম দিব্যি করেছিলে?”

ঈশ্বর বললে, “ছেলেবেলায় এরা সব খেলা শিখতো। আমিও খেলার লোভে এদের দলে জুটে গিয়েছিলুম। আমার বয়েস যখন বছর কুড়িক, তখন কি লাঠি, কি লকড়ি, কি সড়কিতে—আমিই হয়ে উঠলুম সকলের সেরা। এরা ভাবলে যে, আমি কোনও মস্তুর-তস্তুর শিখেছি—তারি গুণে আমি সকলকে হঠিয়ে দিই। হজুর, আমি তস্তুর-মস্তুর কিছুই জানিনে, তবে আমার যা ছিল, তা এদের কারও ছিল না। সে জিনিষ হচ্ছে চোখ। আমি অন্যের চোখের ঘোরাফেরা দেখেই বুঝতুম যে, তার হাতের লাঠি, সড়কির মার কোন্ দিক থেকে আসবে। কিন্তু আমার চোখ দেখে এরা কিছুই বুঝতে পারতো না, আর শুধু মার খেতো। শেষটা এরা সকলে মিলে যুক্তি করলে যে, আমাকে কালীবাড়ী নিয়ে গিয়ে হাড়কাঠে ফেলে' বলি দেবে। তার পর, একদিন এরা রাত দুপুরে আমার বাড়ী চড়াও হয়ে', আমাকে বিছানা থেকে তুলে', আঠেপৃষ্ঠে বেঁধে' আমাকে কালীবাড়ী নিয়ে গিয়ে হাড়কাঠে ফেলে' বলি দেবার উদ্যোগ করলে। খাঁড়া ছিল ঐ গুলিখোর মিছু সর্দারের হাতে। আমি প্রাণভয়ে অনেক কান্নাকাটি করবার পর এরা বললে, 'তুমি ঠাকুরের স্মৃতি দিব্যি কর যে, আর কখনো লাঠি ছোঁবে না, তা হ'লে তোমাকে ছেড়ে দেব।' হজুর, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে এই দিব্যি করেছি; আর তার পর থেকে একদিনও লাঠি সড়কি ছুঁইনি। কথা সত্যি কি মিথ্যে—ঐ গুলিখোর মিছুকে জিজ্ঞেস করলেই টের পাবেন।”

মিছু আমাদের বাড়ীর লেঠেলের সর্দার।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, “ঈশ্বরের কথা সত্যি না মিথ্যে?” সে 'হাঁ' 'না'—কিছুই উত্তর করলে না।

ঈশ্বর এর পর বলে' উঠল, “হজুর, আমি মিথ্যে কথা জীবনে বলিনি—আর, কখনো বলবও না।”

তার পর, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, “মিছা যদি গুলিখোর হয়, ত এমন পাকা লেঠেল হ’ল কি করে’?”

ঈশ্বর বললে, “হুজুর, নেশায় শরীরের শক্তি যায়, কিন্তু গুরুর কাছে শেখা বিদ্যে ত যায় না। বিদ্যে হচ্ছে আসল শক্তি। সেদিন দেখলেন না? ঠাকুরদাস কামার অত বড় মোষটার মাথা এককোপে বেঁমানুম কাটলে, আর ঠাকুরদাস দিনে-দুপুরে গুলি খায়। আমি নেশা করিনে বটে, কিন্তু বয়সে আমার শরীরের জোর এখন কমে’ এসেছে—যেমন সকলেরই হয়। যদি এরা অনুমতি দেয়—তা হ’লে দেখতে পাবেন যে, বুড়ো হাড়েও বিদ্যে সমান আছে।”

এর পর আমি লেঠেলদের জিজ্ঞেস করলুম—তারা ঈশ্বরকে খেলবার অনুমতি দেবে কি না। তারা পরস্পর পরামর্শ করে’ বললে, “আমরা ওকে হুজুরের কথায় আজকের দিনের মত অনুমতি দিচ্ছি। দেখা যাক, ও কি ছেলে-খেলা করে।”

লেঠেলদের অনুমতি পাবার পর, ঈশ্বর কোমরের কাপড় তুলে’ বুকে বাঁধলে; আর তার ঝাঁকড়া চুল, একমুঠো ধুলো দিয়ে ঘসে’ ফুলিয়ে তুললে, তার পর মাটিতে ঘোড়াসন হয়ে বসে’, পাঁচ মিনিট ধরে’ বিড় বিড় করে’ কি বকতে লাগল। অমনি লেঠেলরা সব এই বলে’ চীৎকার করে’ উঠল, “দেখছেন, বেটা মস্তর আওড়াচ্ছে—আমাদের নজরবন্দী করবার জন্যে।” ঈশ্বর এসব চোঁচামেচিতে কর্ণপাতও করলে না। তার পর, যখন সে উঠে’ দাঁড়াল, তখন দেখি, সে আলাদা মানুষ। তার চোখে আগুন জ্বলছে ও শরীরটে হয়েছে ইম্পাতের মত।

ঈশ্বর বললে, “প্রথম এক হাত লকড়ি নিয়েই ছেলে-খেলা করা যাক। এদের ভিতর কে বাপের বেটা আছে, লকড়ি ধরুক।”

মনিরুদ্দি সর্দার বললে, “আমার ছেলে কামানের সঙ্গেই এক হাত খেলে’, তাকে যদি হারাতে পার, তা হ’লে আমি তোমাকে লকড়ি খেলা কা’কে বলে, তা দেখাব।” তার পরে একটি বছর-কুড়িকের ছোকরা এগিয়ে এল। সে তার বাপের মতই সুপুরুষ, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘাকৃতি; বাঁ হাতে ছোট একটি বেতের ঢাল আর ডান হাতে পাকা বাঁশের লাল টকটকে একখানি লকড়ি।

খেলা শুরু হ'ল; তার পর, এক মিনিটের মধ্যেই দেখি—কামানের লকড়ি ঈশ্বরের বাঁ হাতে, আর কামাল নিরস্ত্র হয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে। তখন ঈশ্বর বললে, “যে লকড়ি হাতে ধরে' রাখতে পারে না, সে আবার খেলবে কি?” একথা শুনে—মনিরুদ্দি রেগে আগুন হয়ে লকড়ি-হাতে এগিয়ে এল। ঈশ্বর বললে, “তোমার হাতের লকড়ি কেড়ে নেব না, কিন্তু তোমার গায়ে আমার লকড়ির দাগ বসিয়ে দেব।” এর পরে পাঁচ মিনিট ধরে' দু'জনের লকড়ি বিদ্যুৎবেগে চলাফেরা করতে লাগল। শেষটা মনিরুদ্দির লকড়ি উড়ে শিবের মন্দিরের গায়ে গিয়ে পড়ল। আর দেখি—মনিরুদ্দির সর্ব্বাঙ্গে লাল লাল দাগ হয়ে গিয়েছে, যেন কেউ সিঁদুর দিয়ে তার গায়ে ডোরা কেটে দিয়েছে।

মনিরুদ্দি মার খেয়েছে দেখে' হেদাউল্লা লাকিয়ে উঠে' বললে, “ধর বেটা সড়কি।” ঈশ্বর বললে, “ধরছি। কিন্তু সড়কি যেন আমার পেটে বসিয়ে দিও না। জানি তুমি খুনে। কিন্তু এ ত কাজিয়া নয়—আপোশে খেলা। আর এই কথা মনে রেখ, রক্ত যেমন আমার গায়ে আছে, তোমার গায়েও আছে।” এর পর সড়কির খেলা শুরু হ'ল। সড়কির সাপের জিভের মত ছোট ছোট ইস্পাতের ফলাগুলো অতি ধীরে ধীরে একবার এগোয় আবার পিছোয়। এ খেলা দেখতে গা কি রকম করে, কারণ সড়কির ফলা ত সাপের জিভ নয়, দাঁত। সে যাই হোক, হেদাউল্লা হঠাৎ 'বাপ রে' বলে' চীৎকার করে' উঠল।

তখন তাকিয়ে দেখি, তার কজি থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে, আর তার সড়কিখানি রয়েছে মাটিতে পড়ে'। ঈশ্বর বললে, “হজুর, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ওর কজি জখম করেছি, নইলে ও আমার পেটের নাড়ীভুঁড়ি বার করে' দিত। আমি যদি সড়কি ওর হাত থেকে খসিয়ে না দিতুম, তা'হলে তা আমার পেটে ঠিক ঢুকে যেত। এ খেলার আইন-কানুন ও বেটা মানে না, ও চায়—হয় জখম করতে, নয় খুন করতে।”

হেদাউল্লার রক্ত দেখে' লেঠেলদের মাথায় খুন চড়ে গেল, আর সমস্তরে 'মার বেটাকে' বলে' চীৎকার করে' তারা বড় বড় লাঠি নিয়ে ঈশ্বরকে আক্রমণ করলে। ঈশ্বর একখানা বড় লাঠি দু'হাতে ধরে' আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করতে লাগল। তখন আমি ও নায়েববাবু দু'জনে গিয়ে লেঠেলদের থামাতে চেষ্টা করতে লাগলুম। হজুরের হকুমে তারা সব তাদের রাগ সামলে নিলে,

—আর তা ছাড়া লাঠির ঘায়ে অনেকেই কাবু হয়েছিল। কারও কারও মাথাও ফেটে গেছিল। শুধু ঈশ্বর এদের মধ্যে থেকে অক্ষত-শরীরে বেরিয়ে এসে আমাদের বললে, “আমি শুধু এদের মার ঠেকিয়েছি—কাউকেও এক ঘা মারিনি। ওদের গায়ে-মাথায় যে দাগ দেখছেন—সে সব ওদের লাঠির দাগ। এলো-মেলো লাঠি চালাতে গিয়ে—এর লাঠি ওর মাথায় পড়েছে, ওর লাঠি এর মাথায়। আমি যে এদের লাঠিবৃষ্টির মধ্যে থেকে মাথা বাঁচিয়ে এসেছি সে শুধু হজুরের —ব্রাহ্মণের—আশীর্ব্বাদে।”

মিছু সর্দার বললে, “হজুর, আগেই বলেছিলুম, ও বেটা যাদু জানে, এখন ত দেখলেন যে আমাদের কথা ঠিক। মস্তরের সঙ্গে কে লড়তে পারবে?”

ঈশ্বর হাতযোড় করে বললে, “হজুর, আমি মস্তর-তস্তর কিছুই জানিনে। তবে লাঠি-সড়কি ধরামাত্র আমার শরীরে কি বেন ভর করে। শক্তি আমার কিছুই নেই; যিনি আমার দেহে ভর করেন, সব শক্তি তাঁরই।”

আমি বুঝলুম—লেঠেলদের কথা ঠিক। ঈশ্বরের গায়ে যিনি ভর করেন, তাঁরই নাম মন্ত্রশক্তি অথবা দেবতা। শুধু লাঠি-খেলাতে নয়, পৃথিবীর সব খেলাতেই—যথা, সাহিত্যের খেলাতে, পলিটিক্সের খেলাতে—তিনিই দিগ্বিজয়ী হন, যাঁর শরীরে এই দৈবশক্তি ভর করে। এ শক্তি যে কি, যাঁদের শরীরে তা নেই তাঁরা তা জানেন না, আর যাঁদের শরীরে আছে তাঁরাও জানেন না।

জন্মভূমি

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২৭৭ সালে (১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে) বলেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ইনি মহাশি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র। ‘বালক,’ ‘ভারতী,’ ‘সাহিত্য,’ ‘সাধনা’ প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় ইনি বহু প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়াছিলেন। ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে, ১৩০৬ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

“জননী জন্মভূমিঃ চ স্বর্গং দিপি গরীয়সী।”

অভাগিনী জন্মভূমির মুখের পানে চাহিয়া জড়-হৃদয় পাষাণও কাঁদিয়া ফেলে, কিন্তু সেই শ্যামল স্নেহে চির-বদ্ধিত সন্তানের কোমল হৃদয় ত কাঁদে

না। শ্যামলা জননীর প্রস্ফুটিত হাসিমুখ আমরা আর দেখিব না, জননীর হৃদয় শোষণ করিয়া মৃত্যু চলিয়া গিয়াছে। সে বিকশিত প্রাণ ম্লান হইয়া পড়িয়াছে; তাহার চারিপার্শ্বে আজ রোগ শোক জরা, অন্ধকার পিশাচের রুধিরোন্মত্ত চীৎকার, বেদনা-কাতর মুমূর্ষুর হাহাকার বিলাপ। নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দুর্বলের বল, শান্তিনিকেতন মাতৃকোড়ে অরণ্যের পশু ধর বাঁধিয়াছে; রোদ্রপীড়িত ক্ষুধাকাতর সন্তানেরা প্রবৃত্তির ছলনায় পরস্পরকে বঞ্চিত করিয়া অগীম সুখলাভ করিতেছে—দরিদ্রা মায়ের কথা হৃদয়ে আর ঠাঁই পায় না। আজি একবার আগ্রবিচ্ছেদ ডুলিয়া, উচচনীচ অহঙ্কার অভিমান তুলিয়া, এক হৃদয়ে যদি আমরা মায়ের পূজা করিতে পারি, কাল প্রভাত-কিরণে হাসিমুখে অনুপূর্ণ। অনু চালিয়া দিবেন—ক্ষুধার যন্ত্রণা আর সহিতে হইবে না। জননী জন্মভূমির শুক হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে; সে হৃদয়োচ্ছ্বাসে যে অমৃত ঝরিবে, পান করিয়া তাহা কেহ নিঃশেষ করিতে পারিবে না। এ রক্তের নদী বহিবে না, এ কঙ্কালের স্তূপ জমিবে না; হিমাচল-নিঃসৃত শান্তিবারি পান করিয়া পৃথিবী শীতল হইবে।

আমাদের জন্ম দিয়া পুণ্যভূমি চির-দুঃখিনী। ভিখারীর মত আমরা পদে পদে পরের দুয়ারে মান ভিক্ষা করিতে যাই—স্বজাতিকে পদ-দলিত করিয়া, সহোদরের মস্তক অবনত করিয়া, মাতার নাম কলঙ্কিত করিয়া, আমরা মনে করি মান বাড়িল। পরে দেখিয়া হাসে, আমরা ভাবে গদগদ হই। দরিদ্রা জননীর কাছে শতবার প্রার্থনা করিয়া বিফল হইলে অপমান নাই, কিন্তু পরের নিকট ভিক্ষা পূর্ণ হইলেও অপমান ষুচে না। সেখানে মেহের বন্ধন নাই, প্রেমের টান নাই, আদুরে ছেলের মত কথায় কথায় আবদার করিতে গেলে শুনিবে কে? দুই একবার ভিক্ষা মিলিবে, তাহার পর উপহাস-বিদ্রূপ, অবশেষে সম্মার্জনী। ভিক্ষা জীবনের মূলভিত্তি হইয়া উঠিলে এ জীর্ণ কঙ্কাল প্রতিদিন শীর্ণ হইবে বৈ উনুতি করিবে না। ক্ষণিক সুখমোহে জীবনের উনুতিহ্যাত রুদ্ধ হইয়া যাইবে। ক্রন্দন থামিয়া আসিবে, কিন্তু হাসি ফুটিবে না—বাক্য শুদ্ধ হইবে, কিন্তু নয়নে আনন্দজ্যোতি প্রকাশ পাইবে না—ধীরে ধীরে অবসান ঘনাইয়া আসিবে। এ ভারতভূমিতে তাহা হইলে চিতা আর নিভিবে না; চারিদিকে শ্মশান, শবদাহ, শৃগাল-কুকুরের যুদ্ধ, শকুনি-গৃধিনীর পাল বিরাজ করিবে।

অভাগিনার কপালে কি আছে কে জানে? যেখানে মাতার শীর্ণ দেহ,
 স্নান মুখ দেখিয়া সন্তানের হৃদয়ে শোক উথলে না, অত্যাচার-প্রপীড়িত মাতার
 কাতর ক্রন্দনে হাই উঠিয়া থাকে, পরের মনস্তাট-সাধনের জন্য সন্তানেরা পরস্পরের
 বিপক্ষে দাঁড়াইতে সম্মত হয়, সেখানে মঙ্গলের আশা কোথায়? মাতার দারিদ্র্য
 দেখিয়া যেখানে সন্তান আপনাকে ধনী মামী বিবেচনা করিতে পারে, যেখানে
 তুচ্ছ স্বার্থের জন্য দুই বেলা মিথ্যা সম্মানিত হয়, সামান্য পৃষ্ঠ-থাবড়ানিতে
 সমস্ত অপমান-জ্বালা ঘুচিয়া যায়, সেখানে মঙ্গল আসিতে চায় না। জন্যভূমি
 জননীর সম্মানেই আমাদের সম্মান, জন্যভূমির শ্রীবৃদ্ধিতেই আমাদের শ্রীবৃদ্ধি।
 আমরা যখন জননীকে ভক্তি করিতে শিখিব, অপরে তখন তাঁহাকে তাচ্ছিল্য
 করিতে সাহস করিবে না। সেদিন প্রভাতে জগৎ স্তম্ভিত হইয়া শুনিবে,
 ভারতবর্ষের বুকের মধ্য হইতে একস্বরে মায়ের নাম উঠিতেছে—সন্তানেরা মা
 বৈ আর জানে না, মায়ের নামে সকলেই এক। সেদিন কলহ-বিবাদ থাকিবে
 না, সমস্ত পৃথিবীকে আমরা ভায়ের মত আলিঙ্গন করিতে পারিব—পৃথিবী
 আমাদের নিকট সরিয়া আসিবে।

আজ একবার মায়ের মুখের পানে চাহিয়া দেখ, আপনাদের দারিদ্র্য হৃদয়ঙ্গম
 হইবে। ঐ স্নেহ-মধুর অধরে আজ কেন বিষাদের রেখা ফুটিয়াছে?—ঐ পবিত্র
 সৌন্দর্য্যে শোকের ছায়া পড়িয়াছে? সে শুভ্র উষার মত কান্তি স্নান, সে
 জ্যোতির্গয়ী দেবীমূর্ত্তি বিষণ্ণ। অনুপূর্ণার অনু সন্তানেরা আর দেখিতে
 পায় না। অবনতমুখে জননী সন্তানের দুর্দশা দেখিয়া চোখের জল মুছিতেছেন।
 দুর্বল সন্তানের দুর্দশা দেখিয়া জননীর চোখের জল ভিনু দিবার আর আছে
 কি? সন্তানেরা আপনাদের মধ্যেই কলহ করিতেছে; ভাইকে বঞ্চিত করিয়া
 ভাই বড় হইতে চায়। ন্যায়ের পথে না চলিলে এখন আর উপায় নাই—
 সমূলে বিনষ্ট হইতে হইবে। জন্যভূমি! ভারতের অধিষ্ঠাত্রী-দেবি ভারতি!
 দুর্বল সন্তানের হৃদয় তোমার পবিত্র ভাবে পূর্ণ কর। সেখানে মহেশ্বের বীজ
 অপর কর মা, অনেকতা একতায় পরিণত হোক। মায়ের মখ উজ্জ্বল করিতে
 সন্তান যেন পশ্চাৎপদ না হয়।

অতীত স্মৃতির স্বপ্নে ভোর হইয়া ঘরের কোণে কানাকানি করিলে চলিবে
 না, মায়ের পূজা করিতে হইবে। ভীষ্মদ্রোণের নাম লইলে হইবে না, হৃদয়ের

মধ্যে তাঁহাদের প্রভাব অনুভব করা চাই। ভগবানের নামে বাধাবিপত্তি কাটিয়া যাইবে। ভারতবর্ষের শূন্য মন্দিরে আমরা পুনরায় মায়ের প্রতিষ্ঠা করিব। চারিদিক্ হইতে এখানে লোকে মাতৃভক্তি শিখিতে আসিবে। এখানে আসিয়া সকলে স্বাধীনতা শিক্ষা করিবে—নরহত্যা শিখিবে না। শিখিবে, মায়ের সেবা করিতে; শিখিবে, সত্যের সম্মান রাখিতে। ভারতীর বীণাধ্বনি জগতে ব্যাপ্ত হইবে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের নামে শত শত উন্নত শির নত হইয়া থাকিবে। আমাদের গৃহে সেদিন মায়ের প্রতিষ্ঠা।

মাফটার মহাশয়

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

[১২৭৯ সালে (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। দার্জিলিং, রঙ্গপুর ও গয়াতে কয়েক বৎসর প্র্যাক্টিস্ করিয়া ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতায় আসিয়া ‘মানসী ও মর্ম্বাবাণী’ পত্রিকার অন্যতর সম্পাদকরূপে বাঙ্গালা ভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ইহার প্রণীত গল্পগুলির মধ্যে ‘ঘোড়শী,’ ‘দেশী ও বিলাতী,’ ‘নবকথা,’ ‘পত্রপুষ্প,’ এবং উপন্যাসগুলির মধ্যে ‘রত্নদীপ,’ ‘রমাসুন্দরী,’ ‘সিন্দুর-কোটা’ প্রভৃতি সাহিত্য-সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গল্প-রচনায় বঙ্গসাহিত্যে ইনি প্রভূত বশের অধিকারী হইয়াছিলেন। ১৩৩৮ সালের ২২এ চৈত্র ইনি পরলোক-গমন করেন।]

১

কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে, বর্দ্ধমান সহর হইতে ঘোল ক্রোশ দূরে, দামোদর নদের অপর পারে, নন্দীপুর ও গোঁসাইগঞ্জ নামক পাশাপাশি দুইটি বন্ধিসু গ্রাম ছিল; এবং উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর একটি প্রাচীন স্তূপহৎ বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান ছিল। এখন সে গ্রাম দু’খানিও নাই, বটবৃক্ষটিও অদৃশ্য—দামোদরের বন্যা সে সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

ফাল্গুন মাস ; এক প্রহর বেলা হইয়াছে। গোঁসাইগঞ্জের মাতব্বর প্রজা এবং গ্রামের অভিভাবক-স্থানীয় কায়স্থ-সন্তান শ্রীযুক্ত হীরলাল দাস দত্ত মহাশয় হাঁকা হাতে করিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। প্রতিবেশী শ্যামাপদ মুখুষ্য ও কেনারাম মল্লিক (ইঁহার ও বড় প্রজা) নিকটে বসিয়া, এ বৎসর চৈত্র মাসে বারোয়ারী অনুপূর্ণা-পূজা কিরূপভাবে নিব্বাহ করিতে হইবে, তাহারই পরামর্শ করিতেছিলেন। পার্শ্ববর্তী নন্দীগ্রামেও প্রতিবৎসর চাঁদা করিয়া ধূমধামের সহিত অনুপূর্ণা-পূজা হইয়া থাকে। গোঁসাইগঞ্জবাসিগণের একবাক্যে ইহাই মত যে, তিন পুরুষ ধরিয়া গোঁসাইগঞ্জ কোনও বিষয়েই নন্দীপুরের নিকটে হটে নাই—এবং আজিও হটিবে না।

আগামী বারোয়ারী পূজা-সম্বন্ধে যখন গ্রামস্থ তিন জন প্রধান ব্যক্তির মধ্যে গভীর ও গূঢ় আলোচনা চলিতেছিল সেই সময়ে রামচরণ মণ্ডল হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেইখানে আসিয়া পেঁচিছিল এবং হাতের লাঠিটা আছড়াইয়া ফেলিয়া ধপাস করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া হীরা দত্ত সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হে মোড়লের পো, অমন করে’ বসে’ পড়লে কেন? কি হয়েছে?”

রামচরণ দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, “কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করছেন দত্তজা, কি হ’তে আর বাকী আছে? হায় হায় হায়!—কান্তিক মাসে যখন আমার জ্বরবিকার হয়েছিল, তখনই আমি গেনাম না কেন? এই দেখবার জন্যে কি আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিলি, হা—রে বিধেতা, তোর পোড়া কপাল!”

শ্যামাপদ ও কেনারামও ঘোর দুশ্চিন্তায় রামচরণের পানে চাহিয়া রহিলেন। দত্তজা বলিলেন, “কি হয়েছে, কি হয়েছে? সব কথা খুলে’ বল। এখন আসছ কোথা থেকে?”

দীর্ঘনিঃশ্বাস-জড়িত স্বরে রামচরণ উত্তর করিল, “নন্দীপুর থেকে। হায় হায়, শেষকালে নন্দীপুরের কাছে মাথা হেঁট হয়ে গেল। হা—রে কপাল!” —বলিয়া রামচরণ সজোরে নিজ ললাটে করাঘাত করিল।

দত্তজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন, কেন? নন্দীপুরওয়ালারা কি করেছে?”

“বলছি। বলবার জন্যেই এসেছি। এই রোদ্দুরে মশাই, এক কোশ পথ ছুটেতে ছুটেতে এসেছি। গনাটা শুকিয়ে গেছে, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। এক ঘণ্টা জল—”

দন্তজ্ঞার আদেশে অবিলম্বে এক ঘড়া জল এবং একটি ঘণ্টা আসিল। রামচরণ উঠিয়া রোয়াকের প্রান্তে বসিয়া, সেই জলে মুখ হাত পা ধুইয়া ফেলিল; কিঞ্চিৎ পানও করিল। তারপর হাত মুখ মুছিতে মুছিতে নিকটে আসিয়া বসিয়া, গভীর বিধাদে মাথাটি ঝুঁকাইয়া রহিল।

হীরা দন্ত বলিলেন, “এবার বল কি হয়েছে, আর দন্ধে’ মেরো না বাপু।”

রামচরণ বলিল, “কি হয়েছে? যা হবার নয়, তাই হয়েছে। বড় বড় সহরে যা হয় না, নন্দীপুরে তাই হয়েছে। এ সব পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনও যা স্বপ্নেও ভাবেনি, তাই হয়েছে। তারা ইস্কুল বসিয়েছে।”

তিন জনেই সমবেত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কি আবার। ইস্কুল কি?”

রামচরণ বলিল, “আরে ছাই, আমিই কি জানতাম আগে ইস্কুল কার নাম? আজ না শুনলাম। ইঞ্জিরি পড়ার পাঠশালাকে ইস্কুল বলে।”

দন্তজ্ঞা বলিলেন, “ও—ইস্কুল খুলেছে বুঝি?”

“হ্যাঁ গো হ্যাঁ—তাই খুলেছে। একজন ম্যাষ্টার নিয়ে এসেছে। ইঞ্জিরি পাঠশালার গুরু মহাশয়কে নাকি ম্যাষ্টার বলে। দাশু ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে ইস্কুল বসেছে। স্বচক্ষে দেখে এলাম, ম্যাষ্টার বসে—দশ-বার জন ছেলেকে ইঞ্জিরি পড়াচ্ছে।”

হীরা দন্ত একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎকণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ম্যাষ্টার কোথা থেকে এনেছে, তা কিছু শুনলে?”

“সব খবরই নিয়ে এসেছি। বর্দ্ধমান থেকে এনেছে। বামুনের ছেলে—হারান চক্রবর্তী। পনের টাকা মাইনে, বাসা, খোরাক। সব খবরই নিয়ে এসেছি।”

বাহিরে এই সময়ে একটা কোলাহল শুনা গেল। পরক্ষণেই দেখা গেল, পিলুপিলু করিয়া লোক সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছে। রামচরণ পথে

আসিতে আসিতে, নন্দীপুরের হস্তে গোঁসাইগণ্ডের এই অভূতপূর্ব পরাভব-সংবাদ প্রচার করিয়া আসিয়াছিল। সকলে আসিয়া চীৎকার করিয়া নানা ছন্দে বলিতে লাগিল, “এ কি সর্বনাশ হ'ল। নন্দীপুরের হাতে এই অপমান। আমাদের ইস্কুল খোলবার এখন কি উপায় হ'বে?”

হীকু দত্ত সেই রোগাকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া, হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—

“ভাই সকল। তোমরা কি মনে করেছ, তিন পুরুষ পরে আজ গোঁসাইগণ্ড নন্দীপুরের কাছে হ'টে যাবে? কখনই না। এ দেহে প্রাণ থাকতে নয়। আমরাও ইস্কুল খুলবো। ওরা বা কি ইস্কুল খুলেছে, আমরা তার চতুও ৭ ভাল ইস্কুল খুলবো। তোমরা শান্ত হয়ে' ঘরে যাও। আজই খাওয়া-দাওয়া করে' আমি বেরুচি, কলকাতা যাবার রেল খুলেছে, আর ত কোন ভাবনা নেই। আমি কলকাতা গিয়ে ওদের চেয়েও ভাল মাষ্টার নিয়ে আসবো। ওরা ১৫৭ টাকা দিয়ে মাষ্টার এনেছে? আমরা ২৫৭ টাকা মাইনে দেবো। ওদের মাষ্টারকে পড়াতে পারে এমন মাষ্টার আমি নিয়ে আসবো। আজ থেকে এক হপ্তার মধ্যে, আমার এই চণ্ডীমণ্ডপে ইস্কুল বসাবো বসাবো বসাবো—তিন সত্য ক'রলাম। এখন যাও, তোমরা বাড়ী যাও, স্নানাহার করগে।”

“জয় গোঁসাইগণ্ডের জয়। জয় হীকু দত্তের জয়!”—সোল্লাসে চীৎকার করিতে করিতে তখন সেই জনতা প্রস্থান করিল।

২

কলিকাতা হইতে মাষ্টার নিযুক্ত করিয়া হীকু দত্ত চতুর্থ দিবসে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

মাষ্টার মহাশয়ের নাম ব্রজগোপাল মিত্র। বয়স্ ত্রিশ বৎসর, খর্ব্বাকার কৃশকায় ব্যক্তি, বড় মিষ্টভাষী। ইংরাজি বলিতে-কহিতে, লিখিতে-পড়িতে তিনি নাকি ভারি ওস্তাদ। ইংরাজিটা তাহার এতই বেশী অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে মাঝে মাঝে ইংরাজি কথা মিশাইয়া ফেলেন—অজ্ঞ লোকের সুবিধার্থ আবার তাহা বাঙ্গালা করিয়া বুঝাইয়াও দেন। বলেন, পূর্ব পিতার জীবিতকালে একদিন কলিকাতার গঙ্গার ধারে

মাষ্টার মহাশয় নাকি বেড়াইতেছিলেন, তথায় এক সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়। সাহেব তাঁহার ইংরাজি শুনিয়া, লাট সাহেবের নিকট সে গল্প করিয়াছিলেন। লাট সাহেব মাষ্টার মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইয়া, ডেপুটি কালেক্টারি পদ তাঁহাকে দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তখন তিনি বাপের বেটা, সংসারের চিন্তা ছিল না, সেই প্রস্তাব তিনি বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আজ অভাবে পড়িয়া এই ২৫ টাকার চাকরি তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল। পুরুষস্যা ভাগ্যং।—মাষ্টার মহাশয়ের মুখে এইরূপ কথাবার্তা শুনিয়া এবং তাঁহার ইংরাজিয়ানা চাল-চলন দেখিয়া গ্রামের লোক একেবারে মোহিত হইয়া গেল।

হীকু দত্তের প্রতিজ্ঞা-অনুসারে পর দিনই ইস্কুল খুলিল। পনের-ঘোলটি ছাত্র লইয়া মাষ্টার মহাশয় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। কলিকাতা হইতে (দত্তজার ব্যয়ে) তিনি প্রচুর পরিমাণে সেলেট, পেন্সিল ও মরে সাহেবের ‘স্পেলিং বুক’ পুস্তক খরিদ করিয়া আনিয়াছিলেন, ছাত্রগণের উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ সেগুলি তাহাদিগকে বিনামূল্যেই দেওয়া হইতে লাগিল।

গোঁসাইগঞ্জের লোকের সঙ্গে নন্দীপুরের লোকের পথে-ঘাটে দেখা হইলে উভয় গ্রামের মাষ্টার-সম্বন্ধে আলোচনা হইত। গোঁসাইগঞ্জ বলিত—“বর্দ্ধমানের মাষ্টার, ও জানেই বা কি, আর পড়াবেই বা কি।” নন্দীপুর বলিত—“হ’লই বা আমাদের মাষ্টারের বর্দ্ধমানে বাড়ী, তিনিও ত কলকাতাতেই লেখাপড়া শিখেছেন। ওঁরা যখন প’ড়তেন, তখন কি বর্দ্ধমানে ইংরাজি ইস্কুল ছিল? কলকাতায় গিয়ে ইংরাজি প’ড়তে হ’ত।”

যথাসময়ে উভয় গ্রামের বারোয়ারী পূজার উৎসব আরম্ভ হইল। উভয় গ্রামই উভয় গ্রামের লোকদিগকে প্রতিমা-দর্শন, প্রসাদ-ভক্ষণ, এবং যাত্রা ও চপ-সঙ্গীত-শ্রবণের নিমন্ত্রণ করিল। এই উপলক্ষে উভয় মাষ্টারের দেখা-সাক্ষাৎ হইয়া গেল এবং সভাস্থলে প্রকাশ পাইল, উভয়ে পূর্বাধি পরিচিত।

পূজাস্তে গোঁসাইগঞ্জ একটা কথা শুনিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। নন্দীপুরের মাষ্টার নাকি বলিয়াছেন—“ঐ বেজা বুঝি ওদের মাষ্টার হয়ে এসেছে, তা এদিন জানতাম না। ওটা ত মহামুখ। ছেলেবেলায় কলকেতায় আমরা এক-কেলাসে প’ড়তাম কি না। আমরা যখন ‘সেকেন বুক’ পড়ি, সেই

সময়েই ও ইস্কুল ছেড়ে দেয়। তারপর আর ত ও ইংরেজি পড়েনি। বড়বাজারে এক মহাজনের আড়তে খাতা লিখত, মাইনে ছিল সাত টাকা। গেল-বছরও ত কলকাতায় ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়; তখনও ত ঐ চাকরি ক'রছে।”

গোঁসাইগঞ্জবাসীরা ব্রজ মাষ্টারকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এ কি শুনছি?”

ব্রজ মাষ্টার এ প্রশ্ন শুনিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, “একেই বলে কলিকাল! সেকেন বুক পড়ার সময়ে আমি ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছিলাম, না ও-ই ছেড়ে দিয়েছিল? হ'য়েছিল কি জ্ঞান না বুঝি? মাষ্টার কেলাসে রোজ পড়া জিজ্ঞাসা ক'রতো, ও একদিনও ব'লতে পারতো না। মাষ্টার একদিন ওকে একটা ‘কোষ্টেন’ জিজ্ঞাসা ক'রলে, ও ‘এন্সার’ ক'রতে পারলে না। আমায় জিজ্ঞাসা ক'রতেই আমি বললাম। মাষ্টার আমায় বলে, ‘দাও ওর কান মলে’।’ আমি কান মলে’ দিতেই ওর মুখচোখ রাগে রাঙ্গা হয়ে গেল। ও ব'লতে লাগলো, ‘আমি হ'লাম বানুনের ছেলে, ও কায়েত হয়ে কি না আমার কানে হাত দেয়।’ সেই অপমানে ও-ই ত ইস্কুল ছেড়ে দিলে। আমি তারপর পাঁচ-ছ বছর সেই ইস্কুলে পড়ে, একেবারে লায়েক হয়ে' তবে বেরুলাম।”

অতঃপর গোঁসাইগঞ্জের লোক নন্দীপুর কর্তৃক ব্যক্ত ঐ অপবাদে প্রতীবাদ করিতে লাগিল। অবশেষে হারান মাষ্টার বলিলেন, “আমরা ইস্কুলে যে মাষ্টারের কাছে প'ড়তাম, তিনি আজও বেঁচে আছেন। গোঁসাইগঞ্জ থেকে তোমরা দু'জন মাতব্বর লোক আমার সঙ্গে চল তাঁর কাছে; তাঁকে জিজ্ঞাসা করে' দেখ —কার কথা সত্যি, কার কথা মিথ্যে।”

এ কথা শুনিয়া ব্রজ মাষ্টার হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “অঁ্যা। এই কথা ব'লেছে? ও সব ত বিলকুল ‘ফল্গো’—মিথ্যে কথা। সেই মাষ্টারের কাছে নিয়ে গিয়ে ভজিয়ে' দেবে? তিনি কি আর বেঁচে আছেন? গেল বছরের আগের বছর, তিনি যে ‘হেভেন’—স্বর্গে গেলেন। তাঁর শ্রাদ্ধে আমি ‘ইন্ডাইট’—নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি, বেশ মনে আছে। আমাকে বড় ভালবাসতেন যে। একেবারে ‘সন্ ইকোয়েল’—পুত্রতুল্য। তাঁর ছেলেরা আজও আমায় বেজো দাদা বলতে ‘ইগ্নোরেন্ট’—অজ্ঞান।”

উভয় মাষ্টারের পরস্পরের প্রতি এই তীব্র অপবাদ-প্রয়োগের ফল এই হইল, উভয় গ্রামই স্ব স্ব মাষ্টারের অসাধারণ পাণ্ডিত্য-সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল।

অবশেষে স্থির হইল, কোনও প্রকাশ্য স্থানে দুই জনের মধ্যে বিচার হউক—কে কাহাকে পরাণ্ড করিতে পারে, দেখা যাউক।

উভয় গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া পরামর্শ করিলেন, উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর যে প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে, তাহারই নিম্নে বিচার-সভা বসিবে। কিন্তু উভয় গ্রামের লোকেই ইংরাজিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং যাহাতে জয়-পরাজয়-সম্বন্ধে কাহারও মনে কিছুমাত্র সংশয় না থাকে, এমন একটি সরল বিচার-প্রণালী স্থির করা আবশ্যিক। উভয় গ্রামের সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, মাষ্টারেরা পরস্পরকে একটি ইংরাজি কথার মানে জিজ্ঞাসা করিবেন, অপরকে তাহার মানে বলিতে হইবে। যদি উভয়েই বলিতে পারেন, তবে উভয়ে তুল্যমূল্য। একজন অন্যকে ঠকাইতে পারিলে, তিনিই জয়পত্র পাইবেন।

বিচারের দিন স্থির হইল—আগামী বৈশাখী পূর্ণিমা; স্থান—উপরি-উক্ত বটবৃক্ষ-তল; সময়—সূর্যাস্ত।

৩

ধার্য্য-দিনে সূর্যাস্তের পূর্বেই গোসাইগঞ্জের মাতব্বর ব্যক্তিগণ ব্রজ মাষ্টারকে সঙ্গে লইয়া বটবৃক্ষ-অভিমুখে শোভাযাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া প্রভৃতি বাদ্যকরণ আছে এবং এক ব্যক্তি একটা বৃহৎ রামশিলা লইয়া চলিয়াছে—ঈশ্বরেচ্ছায় যদি জয় হয়, তবে ঢাক ঢোল বাজাইয়া আনন্দ করিতে করিতে গ্রামে ফিরিয়া আসিতে হইবে। পথে যাইতে যাইতে ব্রজ মাষ্টারের পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন, “কি হে মাষ্টার, মুখ রাখতে পারবে ত? বেছে বেছে খুব শক্ত একটা কিছু ঠিক করে’ রাখ, হারান মাষ্টার যেন কিছুতেই তার মানে বলতে না পারে।” ব্রজবাবু বলিলেন, “আপনারা ভাবছেন কেন? দেখুন না কি করি! এমন ‘কোষ্টেন’ জিজ্ঞাসা ক’রবো যে তা শুনেই হারান মাষ্টারের আঙুল গুড়ুম হয়ে’ যাবে—মানে বলা ত দূরের কথা।” দস্তজা বলিলেন, “দেখো ভায়া, আজ যদি মুখ রাখতে পার,

তবে তোমার পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবো।” কেহ স্পষ্ট না বলিলেও ব্রজ মাষ্টার ইহা বিনক্ষণ জানিতেন যে, আজ যদি তাঁহার পরাজয় ঘটে, তবে এ গ্রাম কনাই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

সূর্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বেই গোঁসাইগণ্ডের দল বটবৃক্ষ-তলে উপনীত হইল। শপ-মাদুর-শতরঞ্চি-প্রভৃতি-বাহকেরা তৎপূর্বেই আসিয়া, নিজ গ্রামের সীমা-রেখার নিকট সেগুলি বিছাইয়া রাখিয়াছে। দূরে পদ্মপালের মত নন্দীপুরবাগিগণ আসিতেছে, দেখা গেল। তাহাদের সঙ্গেও শপ, মাদুর প্রভৃতি ও ঢাক, ঢোল ইত্যাদি আসিতেছে।

ক্রমে নন্দীপুর আসিয়া নিজ সীমানার নিকট শপ, মাদুর বিছাইয়া বসিয়া গেল। উভয় গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সম্মুখে বসিয়াছেন, মধ্যে দুই-তিন হাত মাত্র খালি জমি।

এখন প্রশ্ন উঠিল, কোন্ মাষ্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবেন। উভয় গ্রামই প্রথম জিজ্ঞাসার অধিকার দাবী করিল। কোনও পক্ষই নিজ দাবী ত্যাগ করিতে সম্মত নহে। অবশেষে বৃদ্ধগণ মীমাংসা করিয়া দিলেন, হীৰু দত্ত মহাশয় একটা ছড়ি ঘুরাইয়া উদ্ধে ছুড়িয়া দিন, ছড়ি যে গ্রামের অভিমুখে মাথা করিয়া পড়িবে, সেই গ্রামের মাষ্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার পাইবেন।

“আমার ছড়ি লউন—আমার ছড়ি লউন” বলিয়া উভয় গ্রামের অনেকেই ছুটিয়া আসিল। হাতের কাছে যে ছড়িটি পাইলেন, তাহা লইয়া হীৰু দত্ত সজোরে ঘুরাইয়া উদ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলেন।

ক্রমে ছড়ি আসিয়া ভূমিতে পতিত হইল। সকলে দেখিল, তাহার মাথাটি নন্দীপুরের দিকে হেলিয়া রহিয়াছে।

নন্দীপুর ইহা দেখিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল; গোঁসাইগণ্ডের মুখটি চুণ হইয়া গেল। সকলে সাগ্রহে বিচার-ফলের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

নন্দীপুরের হারান মাষ্টার তখন বুক ফুলাইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রজ মাষ্টারও উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার বুকটি দুরু দুরু করিতে লাগিল, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় মুখে সে ভাবকে তিনি প্রকাশ পাইতে দিলেন না।

হারান মাষ্টার তখন বলিলেন, “আচ্ছা, বল দেখি, এর মানে কি—
‘HORNS OF A DILEMMA’.”

সৌভাগ্যক্রমে ব্রজ মাষ্টার এই কুট-প্রশ্নের অর্থ অবগত ছিলেন। তিনি
বক ফুলাইয়া, সহাস্য বদনে বলিলেন, “এর মানে—

‘উভয়-সঙ্কট’

—কেমন কিনা?”

“পেরেছে—পেরেছে—আমাদের মাষ্টার পেরেছে”—বলিয়া গোঁসাইগঞ্জ
তুমুল কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। দলপতিগণ অনেক কষ্টে তাহাদের
থামাইলেন। এখন ব্রজ মাষ্টারের প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার পালা আগিল।

ব্রজ মাষ্টার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—

“শোন হারানবাবু, আমি তোমায় কোনও কঠিন প্রশ্ন ক’রতে চাইনে,
বরং খুব সহজ দেখেই একটা জিজ্ঞাসা ক’রবো। এ অঞ্চলে, মনে কর, তুমি
আর আমি এই দু’জন যা ইংরেজিনবীশ আছি। একটা শক্ত কথার মানে
জিজ্ঞাসা করে’ তোমায় ঠকিয়ে’ দেবো সেটা আমার মনঃপূত নয়। এতে হয়ত
গোঁসাইগঞ্জ রাগ ক’রতে পারেন—কিন্তু আমি নিজে একজন ইংরেজিনবীশ
হয়ে’, আর একজন ইংরেজিনবীশের প্রকাশ্য সভায় অপমান ত ক’রতে পারিনে।
আচ্ছা, খুব সহজ একটা কথার মানে জিজ্ঞাসা করি—বেশ হেঁকে উত্তর দাও,
যাতে দুই গ্রামের সকলে শুনতে পায়। আচ্ছা, এর মানে কি বল দেখি—
তুমি জান নিশ্চয়ই—আচ্ছা, এর মানে বল—

‘I DON’T KNOW’.”

হারান মাষ্টার উচ্চস্বরে বলিলেন—

“আমি জানি না।”

শ্রবণমাত্র নন্দীপুরের সকলের মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল।
সেই মুহূর্ত্তে গোঁসাইগঞ্জের দল একসঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিপুল বেগে নৃত্য ও
চীৎকার করিতে লাগিল—“হো হো জানে না—নন্দীপুর জানে না—হেরে
গেল—দুও—দুও।”

হারান মাষ্টার মহাবিপন্নভাবে সকলকে কি বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু
ঠিক সেই সময়ে গোঁসাইগঞ্জের ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া ও রামশিঙ্গা সমবেতভাবে

গর্জন করিয়া উঠিল। তাঁহার কথা আর কাহারও শ্রুতিগোচর হইবার সম্ভাবনা রহিল না।

গৌঁসাইগঞ্জনিবাসী কয়েক জন বলশালী লোক আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল, এবং তন্মধ্যে এক জন ব্রজ মাষ্টারকে স্বন্ধের উপর তুলিয়া লইয়া গ্রামাভিমুখে চলিল। সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে করিতে বাদ্যভাণ্ডের সহিত গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

পর দিন শুনা গেল, হারান মাষ্টার নন্দীপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তথায় স্কুলটি বন্ধ হইয়া গেল। গৌঁসাইগঞ্জে ব্রজ মাষ্টার অপ্রতিহত-প্রভাবে মাষ্টারি এবং অপত্য-নিব্বিশেষে গ্রামস্থ সকলের ক্ষীর ননী ছানা ভোজন করিতে লাগিলেন।

সমুদ্রবক্ষে সাইক্লোন

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্তমান যুগের উপন্যাস-লেখকদিগের অগ্রণী। ইনি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি 'কাশীনাথ' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাসখানি লেখেন। তাহার পর চৌদ্দ হইতে বাইশ বৎসরের মধ্যে 'বড়দিদি,' 'চন্দ্রনাথ' ও 'দেবদাস' রচিত হয়। 'পথনির্দেশ' ও 'বিন্দুর ছেলে' ইহার ছত্রিশ বৎসর বয়সের রচনা। ইহার পর 'চরিত্রহীন,' 'পরিণীতা,' 'বিরাজ বো,' 'পণ্ডিত মশাই,' 'মেজদিদি,' 'ছবি,' 'রানের স্মৃতি,' 'সুভদা,' 'হরিনক্ষত্রী,' 'দর্পচূর্ণ,' 'আঁধারে আলো,' 'পল্লীসমাজ,' 'শ্রীকান্ত' (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্ব), 'অরক্ষণীয়া,' 'নিকৃতি,' 'গৃহদাহ,' 'দেনা পাওনা,' 'বামুনের মেয়ে,' 'নববিধান,' 'দস্তা,' 'শেষ পুশু,' 'পথের দাবী,' 'বিপ্লবদাস' প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাস রচিত হয়। ইহার কয়েকখানি উপন্যাস নাট্যকাকারে রূপান্তরিত হইয়া ('বিরাজ বো,' 'ঘোড়শী,' 'রমা,' 'বিজয়া,' 'চরিত্রহীন,' 'বিপ্লবদাস' প্রভৃতি) রঙ্গমঞ্চে লাফল্য লাভ করিয়াছে। ইনি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় পরলোক-গমন করেন।]

সারাদিন আকাশে ছেঁড়া মেঘের আনাগোনার বিরাম ছিল না; এখন অপরাহ্নের কাছাকাছি একটা গাঢ়, কালো মেঘ দিক্-চক্রবাল আচ্ছন্ন করিয়া

ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইল, সমস্ত খালাসীদের মুখে-
চোখেই কেমন যেন একটা উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছে। তাহাদের চলা-ফেরার
মধ্যেও এক প্রকার ব্যস্ততার লক্ষণ—যাহা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করি নাই।

একজন বৃদ্ধ গোছের খালাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, চৌধুরীর
পো, আজ রাত্রেও কি কালকের মত ঝড় হবে মনে হয়?

বিনয়ে চৌধুরীর পুত্র বশ হইল। দাঁড়াইয়া কহিল, কোর্তা, নীচে যাও,
কাপ্তান কইচে, ছাইক্রোন হোতি পারে।

মিনিট-পোনের পরেই দেখিলাম, কখাটা অমূলক নয়। উপরের যত যাত্রী
ছিল, সকলকে একরকম জোর করিয়া খালাসীরা হোল্ডের মধ্যে নামাইয়া
দিতে লাগিল। দুই চারিজন আপত্তি করায়, সেকেও অফিসার নিজে আসিয়া
ধাক্কা মারিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া দিয়া বিছানা-পত্র পা দিয়া গুটাইয়া দিতে
লাগিল। আমার তোরঙ্গ, বিছানা খালাসীরা ধরাধরি করিয়া নীচে লইয়া
গেল; কিন্তু আমি নিজে আর একদিকে সরিয়া পড়িলাম। শুনিলাম, যে
হতভাগ্যেরা দশ টাকার বেশী ভাড়া দিতে পারে নাই, তাহাদিগকে জাহাজের
খোলার মধ্যে পুরিয়া, গর্ভের মুখ আঁটিয়া বন্ধ করা হইবে। তাহাদের মঙ্গলের
জন্যও বটে, জাহাজের মঙ্গলের জন্যও বটে, এইরূপ বিধি। আমার কিন্তু
নিজের জন্য এই কল্যাণের ব্যবস্থা কিছুতেই মনঃপূত হইল না। ইতিপূর্বে
সাইক্রোন বস্ত্রটি সমুদ্রে কেন, ডাঙ্গাতেও দেখি নাই। কি ইহার কাজ, কেমন
ইহার রূপ, অমঙ্গল ঘটাইবার কতখানি ইহার শক্তি—কিছুই জানি না। মনে
মনে ভাবিলাম, ভাগ্যবলে যদি এমন জিনিসেরই আবির্ভাব আসনু হইয়াছে,
তবে, না দেখিয়া ইহাকে ছাড়িব না,—তাঁ অদৃষ্টে যা ঘটে তা ঘটুক। আর
ঝড়ে জাহাজ যদি মারা-ই যায়, ত অমন প্লুগের ইঁদুরের মত পিঁজরায় আবদ্ধ
হইয়া, মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া জল খাইয়া মরিতে যাই কেন? যতক্ষণ পারি,
হাত পা নাড়িয়া, চেউয়ের উপরে নাগরদোলা চাপিয়া, ভাসিয়া গিয়া, এক
সময়ে টুপ করিয়া ডুব দিয়া পাতালের রাজবাড়ীতে অতিথি হইলেই
চলিবে।

অনেকক্ষণ হইতেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। গন্ধ্যার কাছাকাছি
বাতাস এবং বৃষ্টির বেগ উভয়ই বাড়িয়া উঠিল; এমন হইয়া উঠিল যে, পলাইয়া

বেড়াইবার আর যো রহিল না, যেখানে হোক, সুবিধামত একটু আশ্রয় না লইলেই নয়। সন্ধ্যার আঁধারে যখন স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম, তখন উপরের ডেক জনশূন্য। মাস্তুলের পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ঠিক সম্মুখেই বুড়ো কাপ্তেন দূরবীণ হাতে ব্রিজের উপর ছুটাছুটি করিতেছেন। হঠাৎ তাঁর স্ননজরে পড়িয়া গিয়া পাছে এ কষ্টের পরেও আবার সেই গর্ভে গিয়া ঢুকিতে হয়, এই ভয়ে একটা সুবিধা-গোছের জায়গা অনুেষণ করিতে করিতে একেবারে অচিন্তনীয় আশ্রয় মিলিয়া গেল। একধারে অনেকগুলো ভেড়া, মুরগী ও হাঁসের খাঁচা উপরি-উপরি রাখা ছিল, তাহারই উপরে উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল, এমন নিরাপদ জায়গা বুঝি সমস্ত জাহাজের মধ্যে আর কোথাও নাই। কিন্তু, তখনও অনেক কথাই জানিতে বাকী ছিল।

বৃষ্টি, বাতাস, অন্ধকার এবং জাহাজের দোলন সব কাটিই ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সমুদ্র-তরঙ্গের আকৃতি দেখিয়া মনে হইল, এই বুঝি সাইক্লোন; কিন্তু সে যে সাগরের কাছে গোপদমাত্র, তাহা অস্বিমজ্জায় হৃদয়ঙ্গম করিতে আর একটু অপেক্ষা করিতে হইল।

হঠাৎ বুকের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়া জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। উপরের দিকে চাহিয়া মনে হইল, মস্তবলে যেন আকাশের চেহারা বদলাইয়া গেছে। সেই গাঢ় মেঘ আর নাই,—সমস্ত ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া কি করিয়া সমস্ত আকাশটা যেন হালকা হইয়া কোথাও উধাও হইয়া চলিয়াছে; পরক্ষণেই একটা বিকট শব্দ সমুদ্রের প্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া কানে বিঁধিল, যাহার সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দিই এমন কিছুই জানি না।

ছেলেবেলায় অন্ধকার রাত্রে ঠাকুরমার বুকের ভিতরে ঢুকিয়া সেই যে গল্প শুনিলাম, কোন্ এক রাজপুত্র একডুবে পুকুরের ভিতর হইতে রূপার কোটা তুলিয়া সাতশ রাক্ষসীর প্রাণ সোনার ভোম্‌রা হাতে পিঘিয়া মারিয়াছিল, এবং সেই সাতশ রাক্ষসী মৃত্যু-যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে পদভরে সমস্ত পৃথিবী মাড়াইয়া-গুঁড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, এ-ও যেন তেমনি কোথায় কি একটা বিপ্লব বাধিয়াছে। তবে রাক্ষসী সাতশ নয়, শতকোটি; উন্মত্ত-কোলাহলে এ দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। আসিয়াও পড়িল। রাক্ষসী নয়,—ঝড়। তবে, এর চেয়ে বোধ করি তাদের আসাই ঢের ভাল ছিল।

এই দুর্জয় বায়ুর শক্তি বর্ণনা করা ত ঢের দূরের কথা, সমগ্র চেতনা দিয়া অনুভব করাও যেন মানুষের সামর্থ্যের বাহিরে। জ্ঞান-বুদ্ধি সমস্ত অভিভূত করিয়া শুদ্ধমাত্র এমনি একটা অস্পষ্ট অথচ নিঃসন্দেহ ধারণা মনের মধ্যে জাগিয়া রহিল যে, দুনিয়ার মেয়াদ একেবারে নিঃশেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। পাশেই যে লোহার খুঁটি ছিল, গলার চাদর দিয়া নিজেকে তাহার সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিয়া-ছিল। অনুক্ষণ মনে হইতে লাগিল, এইবার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আমাকে সাগরের মাঝখানে উড়াইয়া লইয়া ফেলিবে।

হঠাৎ মনে হইল, জাহাজের গায়ে কালো জল যেন ভিতরের ধাক্কায় বজ্র বজ্র করিয়া ক্রমাগত উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে। দূরে চোখ পড়িয়া গেল—দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিলাম না। একবার মনে হইল, এ বুঝি পাহাড়, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভ্রম যখন ভাঙিল, তখন হাত জোড় করিয়া বলিলাম, ভগবান্! এই চোখ দটি যেমন তুমিই দিয়াছিলে, আজ তুমিই তাহাদের সার্থক করিলে। এতদিন ধরিয়া ত সংসারের সর্বত্র চোখ মেলিয়া বেড়াইতেছি; কিন্তু তোমার এই সৃষ্টির তুলনা ত কখনও দেখিতে পাই নাই। যতদূর দৃষ্টি যায়, এই যে অচিন্তনীয় বিরাটকায় মহাতরঙ্গ মাথায় রক্ত-শুভ্র কিরীট পরিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, এত বড় বিস্ময় জগতে আর আছে কি।

সমুদ্রে ত কত লোকই যায় আসে; আমি নিজেও ত আরও কতবার এই পথে যাতায়াত করিয়াছি। কিন্তু এমনিটি ত আর কখনও দেখিতে পাইলাম না। তা ছাড়া, চোখে না দেখিলে, জলের চেউ যে কোন গতিকেই এত বড় হইয়া উঠিতে পারে, এ কথা কল্পনার বাপের সাধ্যও নাই কাহাকেও জানায়।

মনে-মনে বলিলাম, হে চেউ-সম্রাট! তোমার সংঘর্ষে আমাদের যাহা হইবে সে ত আমি জানি-ই; কিন্তু এখনও ত তোমার আসিয়া পৌঁছিতে অন্ততঃ আধ মিনিট কাল বিলম্ব আছে, সেই সময়টুকু বেশ করিয়া তোমার কলেবরখানি যেন দেখিয়া লইতে পারি। একটা জিনিষের সুবিপুল উচ্চতা ও ততোধিক বিস্তৃতি দেখিয়াই কিছু এ ভাব মনে আসে না; কারণ তা' হইলে হিমালয়ের যে কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গই ত যথেষ্ট। কিন্তু, এই যে বিরাট ব্যাপার জীবন্তের মত ছুটিয়া আসিতেছে, সেই অপরিমেয় গতি ও শক্তির অনুভূতিই আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু সমুদ্র-জলে ধাক্কা দিলে বাহা জলিয়া জলিয়া উঠিতে থাকে, সেই জল। নানা প্রকারের বিচিত্র রেখায় ইহার মাথার উপর খেলা করিতে না থাকিলে, এই গভীর কৃষ্ণ জলরাশির বিপুলত্ব এই অন্ধকারে হয় ত তেমন করিয়া দেখিতেই পাইতাম না। এখন যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূরই এই আলোকমালা, যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ জালিয়া এই ভয়ঙ্কর স্তূপের মুখ আমার চক্ষের সন্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিল।

জাহাজের বাঁশী অসীম বায়ুবেগে থর থর করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতেই লাগিল; এবং ভয়ার্ত খালসীর দল আল্লার কণ্ঠে তাহাদের আকুল আবেদন পৌছাইয়া দিতে গলা ফাটাইয়া সমস্তরে চীৎকার করিতে লাগিল। যাহার শুভাগমনের জন্য এত ভয়, এত ডাক-হাঁক, এত উদ্যোগ-আয়োজন—সেই মহাতরঙ্গ আসিয়া পড়িলেন। একটা প্রকাণ্ড-গোছের ওলট-পালটের মধ্যে হরবল্লভের মত আমারও প্রথমটা মনে হইল,—নিশ্চয়ই আমরা ডুবিয়া গেছি, সুতরাং দুর্গ নাম করিয়া আর কি হইবে। আশে পাশে, উপরে নীচে চারিদিকেই কালো জল। জাহাজ-শুদ্ধ সবাই বে পাতালের রাজবাড়ীতে নিমগ্ন খাইতে চলিয়াছি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন ভাবনা শুধু এই যে, খাওয়া-দাওয়াটা তথায় কি জানি কিরূপ হইবে। কিন্তু মিনিটখানেক পরে দেখা গেল, না—ডুবি নাই, জাহাজ-শুদ্ধ আবার জলের উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছি। অতঃপর তরঙ্গের পর তরঙ্গেরও আর শেষ হয় না, আমাদের নাগরদোলা-চাপারও আর সমাপ্তি হয় না। এতকণ্ঠে টের পাইলাম, কেন কাপ্তেন সাহেব মানুষগুলোকে জানোয়ারের মত গর্ভে পুরিয়া ঢাবি বদ্ধ করিয়াছেন। ডেকের উপর দিয়া মাঝে মাঝে যেন জলের স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল। আমার নীচে হাঁস-মুরগীগুলো বারকতক ঝট্-পট্ করিয়া এবং ভেড়াগুলো কয়েকবার ম্যা-ম্যা করিয়া ভবলীলা সাদ্ধ করিল; আমি শুধু তাহাদের উপরতলা আশ্রয় করিয়া লোহার খুঁটি সবলে জড়াইয়া ধরিয়া ভবলীলা বজায় করিয়া চলিলাম। কিন্তু এখন আর এক প্রকারের বিপদ জুটিল। শুধু যে জলের ছাট্ ছুঁচের মত গায়ে বিধিতে লাগিল, তাই নয়, সমস্ত জামা-কাপড় ভিজিয়া প্রচণ্ড বাতাসে এমনি শীত করিতে লাগিল যে, দাঁতে দাঁতে ঠক্-ঠক্ করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে হইল, জলে-ডোবার হাত হইতে যদি-বা সম্প্রতি নিস্তার পাই, নিউমোনিয়ার হাত হইতে

পরিভ্রাণ পাইব কিরূপে? এই ভাবে আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে যে পরিভ্রাণ পাওয়া সত্যই অসম্ভব হইয়া পড়িবে, তাহা নিঃসংশয়ে অনুভব করিলাম। সুতরাং যেমন করিয়া হোক এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া এমন কোথাও আশ্রয় লইতে হইবে, যেখানে জলের ছাঁট বল্লমের ফলার মত গায়ে বেঁধে না। একবার ভাবিলাম, ভেড়ার খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলে কিরূপ হয়? কিন্তু তাই-বা কতটুকু নিরাপদ? তার মধ্যে যদি সেইরূপ লোনা জলের শ্রোত ঢুকিয়া পড়ে ত নিতান্তই যদি না ম্যা-ম্যা করি, মা-মা করিয়াও অন্ততঃ ইহ-নীলা সমাপ্ত করিতে হইবে।

শুধু এক উপায় আছে। জাহাজের পার্শ্ব-পরিবর্তনের মধ্যে ছোট দিবার একটু অবকাশ পাওয়া যায়; অতএব এই সময়টুকুর মধ্যে আর কোথাও গিয়া যদি ঢুকিয়া পড়িতে পারি, হয় ত বাঁচিতেও পারি। যে কথা, সেই কাজ। কিন্তু খাঁচা হইতে অবতরণ করিয়া তিনবার ছুটিয়া ও তিনবার বসিয়া যদি-বা সেকেও ক্লাস কেবিনের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম, দ্বার বন্ধ। লোহার কপাট হাজার ঠেলাঠেলিতেও পথ দিল না। সুতরাং আবার সেই পথ তেমনি করিয়া অতিক্রম করিয়া ফার্ট ক্লাসের দোরগোড়ায় আসিয়া হাজির হইলাম। এবার ভাগ্য-দেবতা সুপ্রসন্ন হইয়া একটা নিরীলা ঘরের মধ্যে আশ্রয় দিলেন। লেশমাত্র দ্বিধা না করিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া খাটের উপর ঝুপ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

রাত্রি বারোটার মধ্যেই ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গেল বটে, কিন্তু পরদিন ভোরবেলা পর্যন্ত সমুদ্রের রাগ পড়িল না।

আমার জিনিষপত্রের এবং সহযাত্রীদের অবস্থা কি হইল, জানিবার জন্য সকালবেলা নীচে নামিয়া গেলাম। তাহাদের অবস্থা দেখিলে সত্যই কান্না পায়। এই তিন চারশ যাত্রীর মধ্যে সমর্থ থাকা ত দূরের কথা, বোধ করি, অক্ষত কেহই ছিল না। মেয়েরা শিলের উপর নোড়া দিয়া যেমন করিয়া বাটনা বাটে, কল্যকার সাইক্লোন এই তিন চারশ লোক দিয়া ঠিক তেমনি করিয়া সারারাত্রি বাটনা বাটিয়াছে। সমস্ত জিনিষপত্র, বাক্স-পেঁটরা লইয়া এই লোকগুলি সমস্ত রাত্রি জাহাজের এধার হইতে ওধার গড়াইয়া বেড়াইয়াছে।

মেজদিদি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১

কেষ্টার মা মুড়ি-কড়াই ভাজিয়া, চাহিয়া চিস্তিয়া, অনেক দুঃখে কেষ্টধনকে চোন্দ-বছরেরটি করিয়া মারা গেলে, গ্রামে তাহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। বৈমাত্র বড়বোন কাদম্বিনীর অবস্থা ভাল। সবাই কহিল, “যা কেষ্ট, তোর দিদির বাড়ীতে গিয়ে থাক্গে। সে বড়মানুষ, বেশ থাক্বি, যা।”

মায়ের দুঃখে কেষ্ট কাঁদিয়া কাটিয়া অর করিয়া ফেলিল। শেষে ভাল হইয়া, ভিক্ষা করিয়া, শ্রাদ্ধ করিল। তার পরে ন্যাড়া মাথায় একটি ছোট পুঁটুসি সঞ্চন করিয়া, দিদির বাড়ী রাজহাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিদি তাহাকে চিনিত না। পরিচয় পাইয়া এবং আগমনের হেতু শুনিয়া একেবারে অগ্নিমুগ্ধ হইয়া উঠিল। সে নিজের নিয়মে ছেলেপুলে লইয়া ঘরসংসার পাতিয়া বসিয়া ছিল—অকস্মাৎ এ কি উৎপাত!

কাদম্বিনীর স্থানী নবীন মুখজ্যের ধান-চালের আড়ত ছিল। তিনি বেলা বারোটোর পর বাড়ী ফিরিয়া কেষ্টাকে বক্র কটাক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া, প্রশ্ন করিলেন, “এটি কে?” কাদম্বিনী মুখ ভারি করিয়া জবাব দিলেন, “তোমার বড়-কুটুম গো, বড়-কুটুম। নাও, খাওয়াও পরাও, মানুষ কর—পরকালের কাজ হোক। বড়-কুটুম যে গো। একে তার মত রাখতে হবে ত। এতে আমার পাঁচুগোপালের বরাতে এক বেলা এক সন্ধ্যা জোটে ত তাই চের। নইলে অধ্যাতিতে দেশ ভ’রে যাবে।” বলিয়া পাশের বাড়ীর দোতলা ঘরের বিশেষ একটা খোলা জানালার প্রতি রোষকষায়িত লোচনের অগ্নিবৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এই বরটা তাঁহার মেজ-যা হেমাজিনীর।

কেষ্ট বারান্দায় একবারে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। কাদম্বিনী তাঁড়ারে ঢুকিয়া একটা নারিকেলমালায় একটুখানি তেল আনিয়া, তাহার পাশে ধরিয়া দিয়া কহিলেন, “আর মায়া-কান্না কাঁদতে হবে না; যাও, পুকুর থেকে ডুব দিয়ে এসোগে—বলি, ফুলেল তেল-টেল মাখা অভ্যাস নেই

ত?" স্বামীকে উদ্দেশ্য করিয়া চেষ্টাইয়া বলিলেন, "তুমি চান কর্তে যাবার সময় বাবুকে ডেকে নিয়ে যেয়ো গো, নইলে ডুবে ম'লে-ট'লে বাড়ীশুদ্ধ লোকের হাতে দড়ি পড়বে।"

কেষ্ট ভাত খাইতে বসিয়াছিল। সে স্বভাবতঃই ভাতটা কিছু বেশী খাইত। তাহাতে কাল বিকাল হইতে খাওয়া হয় নাই, আজ এতখানি পথ হাঁটিয়া আগিয়াছে--বেলাও হইয়াছে। নানা কারণে পাতের ভাতগুলি নিঃশেষ করিয়াও তাহার ঠিক ক্ষুধা মিটে নাই। নবীন অদূরে খাইতে বসিয়াছিলেন; লক্ষ্য করিয়া স্ত্রীকে কহিলেন, "কেষ্টাকে আর দুটি ভাত দাও গো।"--"দিই" বলিয়া কাদম্বিনী উঠিয়া গিয়া পরিপূর্ণ একখানা ভাত আনিয়া সমস্তটা তাহার পাতে ঢালিয়া দিয়া, উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন, "তবেই হয়েছে। এ হাতীর খোরাক নিত্য যোগাতে গেলে যে, আমাদের আড়ত খালি হ'য়ে যাবে। ওবেলা দোকান থেকে মণ দুই মোটা চাল পাঠিয়ে দিয়ো, নইলে দেউলে হ'তে হবে, তা ব'লে রাখছি।"

মর্মান্তিক লজ্জায় কেষ্টের মুখখানি আরও ঝুঁকিয়া পড়িল। সে এক মায়ের এক ছেলে। দুঃখিনী জননীর কাছে সরু চাল খাইতে পাইয়াছিল কিনা, সে খবর জানি না, কিন্তু পেট ভরিয়া ভাত খাওয়ার অপরাধে কোন দিন যে লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হয় নাই, তাহা জানি। তাহার মনে পড়িল, হাজার বেশী খাইয়াও কখন মায়ের মনের সাধ মিটাইতে পারে নাই। মনে পড়িল, এই সে দিনও ঘুড়ি লাটাই কিনিবার জন্য দু'মুঠা ভাত বেশী খাইয়া পয়সা আদায় করিয়া লইয়াছিল।

তাহার দুই চোখের কোণ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ভাতের খালার উপর নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, সে সেই ভাত মাথা গুঁজিয়া গিলিতে লাগিল। বাঁ-হাতটা তুলিয়া মুছিতে পর্য্যন্ত সাহস করিল না, পাছে দিদির চোখে পড়ে। অনতিপূর্বেই মায়া-কান্না কঁাদার অপরাধে বকুনি খাইয়াছিল। সেই ধমক তাহার এত বড় মাতৃ-শোকেরও ঘাড় চাপিয়া রাখিল।

পাশের দোতারা বাড়ীটা মেজভাই বিপিনের। ছোট ভায়ের অনেক দিন মৃত্যু হইয়াছিল। বিপিনেরও ধান-চালের কারবার। তাহার অবস্থাও ভাল, কিন্তু বড় ভাই নবীনের সমান নয়; তথাপি ইহার বাড়ীটাই দোতারা। মেজবউ হেমাঙ্গিনী সহরের মেয়ে। সে দাসদাসী রাখিয়া, লোকজন খাওয়াইয়া, জাকজমকে থাকিতে ভালবাসে। পয়সা বাঁচাইয়া গরিকী চালে চলে না বলিয়াই বছর চারেক পূর্বে দুই যায়ে কলহ করিয়া পৃথক্ হইয়াছিল। সেই অবধি প্রকাশ্য কলহ অনেকবার হইয়াছে, অনেকবার মিটিয়াছে, কিন্তু মনো-মালিন্য একটি দিনের জন্যও ঘুচে নাই। কারণ, সেটা বড়-যা কাদম্বিনীর একলার হাতে। তিনি পাকা লোক, ঠিক বুঝিতেন, ভাঙা হাঁড়ি জোড়া লাগে না; কিন্তু, মেজবউ অত পাকা নয়, অমন করিয়া বুঝিতেও পারিত না।

আজ বেলা তিনটা সাড়ে তিনটার সময় হেমাঙ্গিনী এ বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কুপের পার্শ্বে সিমেন্ট বাঁধান বেদির উপর রোদে বসিয়া কেষ্ট সাবান দিয়া একরাশ কাপড় পরিষ্কার করিতেছিল; কাদম্বিনী দূরে দাঁড়াইয়া, অল্প সাবান ও অধিক গায়ের জোরে কাপড় কাচিবার কোণলটা শিখাইয়া দিতেছিলেন। মেজ-যাকে দেখিবামাত্রই বলিয়া উঠিলেন, “নাগো,— ছোঁড়াটা কি নোঙরা কাপড়-চোপড় নিয়েই এসেছে!”

কথাটা সত্য। কেষ্টার সেই লাল পেড়ে ধুতিটা পরিয়া এবং চাদরটা গায়ে দিয়া, কেহ কুটুমবাড়ী যায় না। দুটাকে পরিষ্কার করার আবশ্যক ছিল বটে, কিন্তু রজকের অভাবে ঢের বেশী আবশ্যক হইয়াছিল, পুত্র পাঁচুগোপালের জোড়া দুই এবং তাহার পিতার জোড়া দুই পরিষ্কার করিবার। কেষ্টা আপাততঃ তাহাই করিতেছিল। হেমাঙ্গিনী চাহিয়াই ঢের পাইল, বস্ত্রগুলি কাহাদের। কিন্তু, সে উল্লেখ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ছেলেটি কে দিদি?” ইতিপূর্বে নিজের ঘরে বসিয়া আড়ি পাতিয়া সে সমস্তই অবগত হইয়াছিল। দিদি ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া পুনরায় কহিল, “দিব্যি ছেলেটি ত! মুখের ভাব তোমার মতই দিদি। বলি, বাপের বাড়ীর কেউ নাকি?” কাদম্বিনী বিরক্ত গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন, “হঁ, আমার বৈমাত্র ভাই। ওরে, ও কেষ্ট, তোর মেজদি’কে একটা প্রণাম কর্ না রে। কি অসভ্য ছেলে বাবা।” কেষ্ট ষতমত খাইয়া উঠিয়া আসিয়া কাদম্বিনীর পায়ের কাছেই নমস্কার করাতে তিনি

ধমকাইয়া উঠিলেন, “আ মন্, হাবা কালা নাকি? কাকে প্রণাম করতে বল্লুম, কাকে এসে করলে।”

বস্তুতঃ, আসিয়া অবধি তিরস্কার ও অপমানের অবিশ্রান্ত আঘাতে তাহার মাথা বে-ঠিক হইয়া গিয়াছিল। তাহার ঝাঁঝে ব্যস্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া হেমাঙ্গিনীর পায়ে কাছের সরিয়া আসিয়া শির অবনত করিতেই সে হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিয়া, তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল, “থাক্ থাক্, হয়েছে ভাই— চিরজীবী হও।” কেটে মূঢ়ের মত তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। এ দেশে এমন করিয়া যে কেহ কথা বলিতে পারে, ইহা যেন তাহার মাথায় ঢুকিল না।

তাহার সেই কুণ্ঠিত, ভীত, অসহায় মুখখানির পানে চাহিবামাত্রই হেমাঙ্গিনীর বুকের ভিতরটা যেন মুচড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল। নিজে কে আর সামলাইতে না পারিয়া, সহসা এই হতভাগ্য অনাথ বালককে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, তাহার পরিশ্রান্ত ঘর্ম্মাপ্লুত মুখখানি নিজের আঁচলে মুছাইয়া দিয়া, যাঁকে কহিল, “আহা, একে দিয়ে কি কাপড় কাচিয়ে নিতে আছে দিদি, একটা চাকর ডাকনি কেন?”

কাদম্বিনী হঠাৎ অবাক্ হইয়া গিয়া, জবাব দিতে পারিলেন না; কিন্তু নিমিষে সামলাইয়া লইয়া রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, “আমি ত তোমার মত বড় মানুষ নই মেজবউ যে, বাড়ীতে দশ-বিশটা দাসদাসী আছে। আমাদের গেরস্ত ঘরে—” কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই হেমাঙ্গিনী নিজের ঘরের দিকে মুখ তুলিয়া মেয়েকে ডাকিয়া কহিল, “উমা, শিবুকে একবার এ বাড়ীতে পাঠিয়ে দে ত মা, বট্টাকুর আর পাঁচুর ময়লা কাপড়গুলো পুকুর থেকে কেচে এনে শুকোতে দিক্।” বড়-যাঁয়ের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, “এবেলা কেটে আর পাঁচুগোপাল আমার ওখানে খাবে দিদি। সে ইস্কুল থেকে এলেই পাঠিয়ে দিয়ো, আমি ততক্ষণ একে নিয়ে যাই।” কেটেকে কহিল, “ওঁর মত আমিও তোমার দিদি হই কেটে—এসো আমার সঙ্গে”—বলিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া নিজেদের বাড়ী চলিয়া গেল।

কাদম্বিনী বাধা দিলেন না। অধিকন্তু, হেমাঙ্গিনী-প্রদত্ত এত বড় খোঁচাটাও নিঃশব্দে হজম করিলেন। তাহার কারণ, যে ব্যক্তি খোঁচা দিয়াছে, সে এ বেলার খরচটাও বাঁচাইয়া দিয়াছে। কাদম্বিনীর পয়সার বড় সংসারে আর কিছু

ছিল না। তাই গাভী দুধ দিতে দাঁড়াইয়া পা ছুঁড়িলে তিনি সহিতে পারিতেন।

৩

সন্ধ্যার সময় কাদম্বিনী প্রশ্ন করিলেন, “কি খেয়ে এলি রে কেটে?”

কেটে সলজ্জ নতমুখে কহিল, “লুচি।”—“কি দিয়ে খেলি?” কেটে তেমনি ভাবে বলিল, “ঝুই মাছের মুড়োর তরকারি, সন্দেশ, রসগো—”

“ইস্। বলি মেজ-ঠাক্করণ মুড়োটা কার পাতে দিলেন?”

হঠাৎ এই প্রশ্নে কেটের মুখখানি পাণ্ডুর হইয়া গেল। উদ্যত প্রহরণের সম্মুখে রজ্জুবন্ধ জানোয়ারের প্রাণটা যেমন করিয়া উঠে, কেটের বুকের ভিতরটায় তেমনিধারা করিতে লাগিল। দেবী দেখিয়া কাদম্বিনী কহিলেন, “তোমার পাতে বুঝি?”

গুরুতর অপরাধীর মত কেটে মাথা হেঁট করিল।

অদূরে দাওয়ায় বসিয়া নবীন তামাক খাইতেছিলেন। কাদম্বিনী সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বলি, শুন্লে ত?” নবীন সংক্ষেপে ‘হঁ’ বলিয়া হঁকায় টান দিলেন।

কাদম্বিনী উগ্রার সহিত বলিতে লাগিলেন, “খুড়ী, আপনার লোক, তার ব্যাভারটা দ্যাখো। পাঁচুগোপাল আমার ঝুইমাছের মুড়ো বল্তে অজ্ঞান, সে কি তা’ জানে না? তবে কোন্ আক্কেলে তার পাতে না দিয়ে ব্যান্য বনে মুক্ত ছড়িয়ে দিলে? বলি হাঁরে কেটে, সন্দেশ-রসগোল্লা খুব পেট ভ’রে খেলি? গত জন্ম কখনও তুই এ সব চোখেও দেখিস্ নি।” স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “যারা দুটি ভাত পেলে বেঁচে যায়, তাদের পেটে লুচি-সন্দেশ কি হবে। কিন্তু আমি বল্চি তোমাকে, কেটাকে মেজগিনী বিগ্ড়ে না দেয় ত আমাকে কুকুর ব’লে ডেকো।” নবীন মোন হইয়া রহিলেন। কারণ, স্ত্রী বিদ্যমানে মেজবউ তাহাকে বিগ্ড়াইয়া ফেলিতে পারিবে, এরূপ দুর্ঘটনা তিনি বিশ্বাস করিলেন না।

পরদিন হইতে দুটো চাকরের একটাকে ছাড়ান হইল; কেটে নবীনের ধান-চালের আড়তে কায করিতে লাগিল। সেখানে সে ওজন করে, বিক্রী

করে, চার পাঁচ কোশ পথ হাঁটিয়া নমুনা সংগ্রহ করিয়া আনে, দুপুর বেলা নবীন ভাত খাইতে আসিলে, দোকান আগ্লাম। দিন দুই পরে, তিনি আহা-নিদ্রা সমাপ্ত করিয়া ফিরিয়া গেলে, সে ভাত খাইতে আসিয়াছিল। তখন বেলা তিনটা। কেটে পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল, দিদি ঘুমাইতেছেন। তাহার তখনকার ক্ষুধার তাড়নায় বোধ করি বাঘের মুখ হইতেও খাবার কাড়িয়া আনিতে পারিত, কিন্তু, দিদিকে ডাকিয়া তুলিবে, এ সাহস হইল না।

রান্নাঘরের দাওয়ার একধারে চুপটি করিয়া দিদির ঘুম ভাঙার আশায় বসিয়া ছিল, হঠাৎ ডাক শুনি—“কেটে!” সে আহ্বান কি স্নিগ্ধ হইয়াই তাহার কানে বাজিল। মুখ তুলিয়া দেখিল, মেজদি’ তাঁহার দোতালার ঘরের জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কেটে একটীবার চাহিয়াই মুখ নামাইল। খানিক পরে হেমাঙ্গিনী নামিয়া আসিয়া, স্নমুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ক-দিন দেখিনি ত? এখানে এমন চুপ ক’রে ব’সে কেন, কেটে?” একে ত ক্ষুধায় অগ্নেই চোখে জল আসে, তাহাতে এমন স্নেহাঙ্গুর কণ্ঠস্বর। তাহার দু’চোখ টল্‌টল করিতে লাগিল, সে ষাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল, উত্তর দিতে পারিল না।

মেজখুড়ীমাকে সব ছেলে-মেয়েরা ভালবাসিত। তাঁহার গলা শুনিয়া কাদম্বিনীর ছোট মেয়ে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়াই চেঁচাইয়া বলিল, “কেটে মামা, রান্না-ঘরে তোমার ভাত ঢাকা আছে, খাওগে। মা খেয়ে-দেয়ে ঘুমোচেচ।” হেমাঙ্গিনী অবাক হইয়া কহিলেন, “কেটের এখনো খাওয়া হয়নি, তোর মা খেয়ে ঘুমোচেচ কি রে? হাঁ কেটে, আজ এত বেলা হ’ল কেন?”

কেটে ষাড় হেঁট করিয়াই রহিল। টুনি তাহার হইয়া জবাব দিল, “কেটে মামার রোজ ত এমনি বেলাই হয়। বাবা খেয়ে-দেয়ে দোকানে ফিরে গেলে তবে ত ও খেতে আসে।” হেমাঙ্গিনী বুঝিলেন, কেটেকে দোকানে কাজে লাগান হইয়াছে। তাহাকে বসাইয়া খাওয়ান হইবে, এ আশা অবশ্য তিনি করেন নাই, কিন্তু, একবার এই বেলার দিকে চাহিয়া, একবার এই ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আর্ন্ত শিশু-দেহের পানে চাহিয়া, তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন। মিনিট দুই পরে

একবারটি দুধ হাতে ফিরিয়া আসিয়া, রান্নাঘরে ঢুকিয়াই শিহরিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন।

কেষ্টে খাইতে বসিয়াছিল। একটা পিতলের খানার উপর ঠাণ্ডা শুকনো ডালা পাকান ভাত। একপাশে একটুখানি ডাল, ও কি-একটু তরকারির মত। দুধটুকু পাইয়া তাহার মলিন মুখখানি হাসিতে ভরিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কেষ্টে খাওয়া শেষ করিয়া পুকুরে আঁচাইতে চলিয়া গেলে একবারটি মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, পাতে গোনা একটিও ভাত পড়িয়া নাই। ক্ষুধার জ্বালায় সে সেই অনু নিঃশেষ করিয়া খাইয়াছে। হেমাঙ্গিনীর ছেলে ললিতও প্রায় সেই বয়সী। নিজের অবর্তমানে নিজের ছেলেকে এই অবস্থায় হঠাৎ কর্তব্য করিয়া ফেলিয়া কান্নার টেউ তাঁহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ফেনাইয়া উঠিল। তিনি সেই কান্না চাপিতে চাপিতে বাড়ী চলিয়া গেলেন।

৪

সন্দি উপলক্ষ করিয়া হেমাঙ্গিনীর মাঝে মাঝে জ্বর হইত, দিন দুই থাকিয়া আপনি ভাল হইয়া যাইত। দিন কয়েক পরে এমন একটু জ্বর-বোধ হওয়ায় সন্ধ্যার পর বিছানায় পড়িয়া ছিলেন। ঘরে কেহ ছিল না, হঠাৎ মনে হইল, কে যেন অতি সম্ভর্পণে কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। ভাকিলেন, “কে রে ওখানে দাড়িয়ে, ললিত?” কেহ সাড়া দিল না। আবার ভাকিতে, আড়াল হইতে জবাব আসিল, “আমি।”—“কে আমি রে? আয়, ঘরে এসে বোস্।” কেষ্টে সসঙ্কোচে ঘরে ঢুকিয়া দেয়াল ঘেসিয়া দাঁড়াইল। হেমাঙ্গিনী উঠিয়া বসিয়া সন্মুখে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন রে কেষ্টে?” কেষ্টে আর একটু সরিয়া আসিয়া, মলিন কোঁচার খুঁট খুলিয়া দুইটি আধপাকা পেয়ারা বাহির করিয়া বলিল, “জ্বরের উপর খেতে বেশ।” হেমাঙ্গিনী সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া বলিলেন, “কোথায় পেলি রে? আমি কাল থেকে লোকের কত ঝগামোদ কচিচ, কেউ এনে দিতে পারেনি”— বলিয়া পেয়ারাশুদ্ধ কেষ্টের হাতখানি ধরিয়া কাছে বসাইলেন। কেষ্টে লজ্জায় আত্মা আত্মা আরক্ত মুখ হেঁট করিল।

যদিও এটা পেয়ারার সময় নয়, হেমাঙ্গিনীও খাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন নাই, তথাপি এই দুইটি সংগ্রহ করিয়া আনিতে দুপুর বেলার সমস্ত রোদটা কেষ্টের মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাঁ কেষ্ট, কে তোকে বল্লে, আমার জর হয়েছে?” কেষ্ট জবাব দিল না। “কে বল্লে রে আমি পেয়ারা খেতে চেয়েছি?” কেষ্ট তাহারও জবাব দিল না। সে সেই যে মুখ হেঁট করিল, আর তুলিতেই পারিল না। ছেলেটি যে অতিশয় লাজুক ও ভীকৃষভাব, হেমাঙ্গিনী তাহা পূর্বেই টের পাইয়া-ছিলেন। তখন তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিয়া, আদর করিয়া, ‘দাদা’ বলিয়া ডাকিয়া, আরও কত কি কৌশলে তাহার ভয় ভাঙাইয়া, অনেক কথা জানিয়া লইলেন। বিস্তর অনুসন্ধান, পেয়ারা সংগ্রহ করিবার কথা হইতে শুরু করিয়া, তাহাদের দেশের কথা, মায়ের কথা, এখানে খাওয়া-দাওয়ার কথা, দোকানে কি কি কাজ করিতে হয়, তাহার কথা—একে একে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া লইয়া, চোখ মুছিয়া বলিলেন, “এই তোর মেজদি’কে কখনও কিছু লুকোস্নে, কেষ্ট, যখন যা’ দরকার হবে, চুপি চুপি এদে চেয়ে নিগ—নিবি ত?” কেষ্ট আহ্লাদে মাথা নাড়িয়া কহিল, “আচ্ছা।”

সত্যকার স্নেহ যে কি, তাহা দুঃখী মায়ের কাছে কেষ্ট শিখিয়াছিল। এই মেজদি’র মধ্যে তাহাই আশ্রয় করিয়া কেষ্টের রুদ্ধ মাতৃ-শোক আজ গলিয়া ধরিয়া গেল। উঠিবার সময় সে মেজদি’র পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া যেন বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে বাহির হইয়া আসিল।

কিন্তু তাহার দিদির আক্রোশ তাহার প্রতি প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। কারণ, সে সংসার ছেলে, সে নিরুপায়। আবশ্যক হইলে অখ্যাতির ভয়ে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়াও যায় না, বিলাইয়া দেওয়াও যায় না। সুতরাং যখন রাখিতেই হইবে, তখন যতদিন তাহার দেহ বহে, ততদিন কঘিয়া খাটাইয়া লওয়াই ঠিক। সে ঘরে ফিরিয়া আসিতেই দিদি ধরিয়া পড়িলেন, “সমস্ত দুপুর দোকান পালিয়ে কোথা ছিলি রে কেষ্ট?” কেষ্ট চুপ করিয়া রহিল। কাদম্বিনী ভয়ানক রাগিয়া বলিলেন, “বল্ শীগ্গীর।” কেষ্ট তথাপি নিরুত্তর হইয়া রহিল। মৌন থাকিলে যাহাদের রাগ পড়ে, কাদম্বিনী সে দলের নহেন।

অতএব কথা বলাইবার জন্য তিনি যতই জেদ করিতে লাগিলেন, বলাইতে না পারিয়া তাঁহার ক্রোধ এবং রোধ ততই চড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে পাঁচুগোপালকে ডাকিয়া, তাহার দুই কান পুনঃপুনঃ মলাইয়া দিলেন এবং তাহার জন্য রাত্রে হাঁড়িতে চাল লইলেন না।

আঘাত যতই গুরুতর হোক, প্রতিহত হইতে না পাইলে লাগে না। পর্বতশিখর হইতে নিক্ষেপ করিলেই হাত-পা ভাঙে না, ভাঙে শুধু তখনই, যখন পদতলস্পৃষ্ট কঠিন ভূমি সেই বেগ প্রতিরোধ করে। ঠিক তাহাই হইয়াছিল কেঁটের। মায়ের মরণ যখন পায়ের নীচের নির্ভরস্থলটুকু তাহার একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিল, তখন হইতে বাহিরের কোন আঘাতই তাহাকে আঘাত করিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারিল না। সে দুঃখীর ছেলে, কিন্তু কখনও দুঃখ পায় নাই। লাঞ্ছনা-গণ্ডনার সহিত তাহার পূর্ব-পরিচয় ছিল না, তথাপি এখানে আসা অবধি কাদম্বিনীর দেওয়া কঠোর দুঃখকষ্ট সে যে অনায়াসে সহ্য করিতে পারিতেছিল, সে শুধু পায়ের তলায় অবলম্বন ছিল না বলিয়াই। কিন্তু আজ আর পারিল না। আজ সে হেমাঙ্গিনীর মাতৃ-স্নেহের স্নকঠিন ভিত্তির উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাই, আজিকার এই অত্যাচার-অপমান তাহাকে একেবারে ধরাশায়ী করিয়া দিল। মাতাপুত্র এই নিরপরাধ নিরাশ্রয় শিশুকে শাসন করিয়া, লাঞ্ছনা করিয়া, অপমান করিয়া, দণ্ড দিয়া, চলিয়া গেলেন,— সে অন্ধকার ভূশূন্যায় পড়িয়া আজ অনেক দিনের পর আবার মাকে স্মরণ করিয়া, মেজদিদি'র নাম করিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

৫

পরদিন সকালেই কেঁট হঠাৎ গুটি গুটি ঘরে ঢুকিয়া হেমাঙ্গিনীর পায়ের কাছে বিছানার এক পাশে আসিয়া বসিল। হেমাঙ্গিনী পা দুটো একটু গুটাইয়া লইয়া স্নেহে বলিলেন, “দোকানে যাগ্নি কেঁট?”

কেঁট। এইবার যাব।

হেমা। দেরি করিস্নে দাদা, এই বেলা যা। নইলে এফপি আবার গালাগালি করবে।

কেষ্টের মুখ একবার আরক্ত, একবার পাণ্ডুর হইল। ‘যাই’ বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার ইতস্ততঃ করিয়া কি একটা বলিতে গিয়া চুপ করিল।

হেমাঙ্গিনী তাহার মনের কথা যেন বুঝিলেন, বলিলেন, “কিছু বল্‌বি আমাকে রে?”

কেষ্টে মাটির দিকে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, “কাল কিছু খাইনি মেজদি’—”

“কাল থেকে খাস্‌নি। বলি’ কি কেষ্ট?” কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত হেমাঙ্গিনী স্থির হইয়া রহিলেন, তাহার পর দুই চোখ জলে পূর্ণ হইয়া গেল। সেই জল ঝরঝর করিয়া ঝরিতে লাগিল। তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আর একবার কাছে বসাইয়া, একটি একটি করিয়া সব কথা শুনিয়া লইয়া বলিলেন, “কাল রাত্তিরেই কেন এলিনে?”

কেষ্টে চুপ করিয়া রহিল। হেমাঙ্গিনী আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, “আমার মাথার দিব্যি রইল, ভাই, আজ থেকে আমাকে তোর সেই মরা যা ব’লে মনে কর্‌বি।”

যথাসময়ে সমস্ত কথা কাদম্বিনীর কানে গেল। তিনি নিজের বাড়ী হইতে মেজবউকে ডাক দিয়া বলিলেন, “ভাইকে আমি কি খাওয়াতে পারিনে যে, তুমি অত কথা তাকে গায়ে প’ড়ে বলতে গেছ?” কথার ধরণ দেখিয়া হেমাঙ্গিনীর গা-জ্বালা করিয়া উঠিল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিল, “যদি গায়ে প’ড়েই ব’লে থাকি, তাতেই বা দোষ কি?” কাদম্বিনী প্রশ্ন করিলেন, “তোমার ছেলেকে ডেকে এনে আমি যদি এমনি ক’রে বলি, তোমার মানটি থাকে কোথায় শুনি? তুমি এমন ক’রে ‘নাই’ দিলে আমি তাকে শাসন করি কি ক’রে বল দেখি?”

হেমাঙ্গিনী আর সহ্য করিতে পারিল না। বলিল, “দিদি, পনের ঘোল বছর এক সঙ্গে ঘর কর্‌চি—তোমাকে আমি চিনি। পেটে মেরে আগে তোমার নিজের ছেলেকে শাসন কর, তার পরে পরের ছেলেকে ক’রো, তখন গায়ে প’ড়ে কথা কইতে যাব না।”

কাদম্বিনী অবাক্ হইয়া বলিলেন, “আমার পাঁচুগোপালের সঙ্গে ওর

তুলনা? দেবতার সঙ্গে বান্দরের তুলনা? এর পরে আরও কি যে তুমি ব'লে বেড়াবে, তাই ভাবি মেজবউ।”

মেজবউ উত্তর দিল, “কে দেবতা, কে বান্দর, সে আমি জানি। কিন্তু আর আমি কিছুই বলব না দিদি, যদি বলি ত এই যে, তোমার মত নিষ্ঠুর, তোমার মত বেহায়া মেয়েমানুষ আর সংসারে নেই।” বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই জানানো বন্ধ করিয়া দিল।

সেই দিন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে অর্থাৎ কতারা ঘরে ফিরিবার সময়টিতে, বড়বউ নিজের বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া দাসীকে উপলক্ষ করিয়া উচ্চকণ্ঠে তর্জন-গর্জন আরম্ভ করিয়া দিলেন—“যিনি দিন-রাত কচেচন, তিনিই এর বিহিত করবেন। মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী। আমার ভাইয়ের মর্গ আমি বুঝিনে, বোঝে পরে। কখন ভাল হবে না—ভাইবোনে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখলে ধর্ম্ সইবেন না—তা' ব'লে দিচ্চি”—বলিয়া তিনি রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

উভয় যারের মধ্যে এই ধরণের গালিগালাজ, শাপশাপাত্ত অনেকবার অনেক রকম করিয়া হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ ঝাঁজটা কিছু বেশী। অনেক লময়ে হেমাদ্বিনী শুনিয়াও শুনিত না, বুঝিয়াও গায়ে মাখিত না, কিন্তু আজ নাকি তাহার দেহটা খারাপ ছিল, তাই উঠিয়া আসিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া কহিল, “এর মধ্যেই চুপ করলে কেন দিদি? ভগবান্ হয় ত শুনতে পাননি—আর খানিকক্ষণ ধ'রে আমার সর্বনাশ কামনা কর,—বট্টাকুর ঘরে আসুন, তিনি শুনুন, ইনি ঘরে এসে শুনুন,—এর মধ্যেই হাঁপিয়ে পড়লে চলবে কেন?”

কাদম্বিনী উঠানের উপর ছুটিয়া আসিয়া মুখ উঁচু করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, “আমি কি কোন সর্বনাশীর নাম মুখে এনেছি?” হেমাদ্বিনী স্থিরভাবে জবাব দিল, “মুখে আনবে কেন দিদি, মুখে আনবার পাত্রী তুমি নও। কিন্তু তুমি কি ঠাওরাও, একা তুমিই সেয়ানা আর পৃথিবী-শুদ্ধ ন্যাকা? ঠেস্ দিয়ে দিয়ে কার কপাল ভাঙ্চ, সে কি কেউ টের পায় না?”

কাদম্বিনী এবার নিজমুত্তি ধরিলেন। মুখ ভ্যাংচাইয়া হাত-পা নাড়িয়া বলিলেন, “টের পেলেই বা। যে দোষে থাক্বে, তারই গায়ে লাগ্বে। আর একা তুমিই টের পাও, আমি পাইনে? কেটা যখন এলো, সাত চড়ে রা

করত না, যা বলতুম, মুখ বুজে তাই করত—আজ দুপুর বেলা কার জোরে কি জবাব দিয়ে গেল, জিজ্ঞাসা ক’রে দ্যাখো, এই প্রসন্নর মাকে”— বলিয়া দাসীকে দেখাইয়া দিলেন।

প্রসন্নর মা কহিল, “সে কথা সত্যি মেজবউ-মা। আজ সে ভাত ফেলে উঠে যেতে, মা বল্লেন, ‘এই পিণ্ডিই না গিল্লে যখন যমের বাড়ী যেতে হবে, তখন এত তেজ্ব কিসের জন্যে?’ সে ব’লে গেল, ‘আমার মেজদি’ থাকতে কাউকে ভয় করি নে’।”

কাদম্বিনী সদর্পে বলিলেন, “কেমন, হ’ল ত? কার জোরে এত তেজ্ব শুনি? আজ আমি স্পষ্ট ব’লে দিচ্ছি, মেজবউ, ওকে তুমি একশ বার ডেকো না। আমাদের ভাইবোনের কথার মধ্যে থেকো না।”

হেমাদ্বিনী আর কথা কহিল না। কেঁচো সাপের মতন চক্র ধরিয়া কামড়াইয়াছে শুনিয়া, তাহার বিস্ময়ের সীমা-পরিমীমা রহিল না। জানালা হইতে আসিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল, কত বড় পীড়নের দ্বারা ইহাও সম্ভব হইতে পারিয়াছে।

আবার মাথা ধরিয়া অর-বোধ হইতেছিল, তাই অসময়ে শয্যায় আসিয়া নিজীবের মত পড়িয়া ছিল। তাহার স্বামী ঘরে ঢুকিয়া, ইহা লক্ষ্য না করিয়াই ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলেন, “বো-ঠানের ভাইকে নিয়ে আজ কি কাণ্ড বাধিয়ে ব’সে আছ? কারু মানা শুন্বে না, যেখানে যত হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া আছে, দেখলেই তার দিকে কোমর বেঁধে দাঁড়াবে, রোজ রোজ আমার এত হাদ্যমা সহ্য হয় না, মেজবউ। আজ বো-ঠান আমাকে না-হক্ দশটা কথা শুনিয়ে দিলেন।”

হেমাদ্বিনী শ্রান্তকণ্ঠে বলিল, “বো-ঠান হক-কথা কবে বলেন যে, আজ তোমাকে না-হক্ কথা বলেচেন?”

বিপিন বলিলেন, “কিন্তু, আজ তিনি ঠিক কথাই বলেচেন। তোমার স্বভাব জানি ত। সেবার বাড়ীর রাখাল ছোঁড়াটাকে নিয়ে এই রকম করলে, মতি কামারের ভাগ্নের অমন বাগানখানা তোমার জন্যেই মুঠোর ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল, উল্টে পুলিশ থামাতে একশ দেড়শ ঘর থেকে গেল। তুমি নিজের ভাল-মন্দও কি বোঝ না? কবে এ স্বভাব যাবে?”

হেমাঙ্গিনী এবার উঠিয়া বসিয়া, স্বামীর মুখপানে চাহিয়া কহিল, “আমার স্বভাব যাবে মরণ হ’লে, তার আগে নয়। আমি মা,—আমার কোলে ছেলেপুলে আছে, মাথার ওপর ডগবান্ আছে। এর বেশী আমি গুরুজনের নামে নালিশ করতে চাইনে। আমার অসুখ করেছে—আর আমাকে বকিও না—তুমি যাও।” বলিয়া গায়ের রূপারখানা টানিয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল।

বিপিন প্রকাশ্যে আর তর্ক করিতে সাহস করিলেন না ; কিন্তু, মনে মনে স্ত্রীর উপর এবং বিশেষ করিয়া ঐ গলগ্রহ দুর্ভাগাটার উপর আজ মর্মান্তিক চটিয়া গেলেন।

আল্‌হাম্‌রা

কাজি ইমদাদুল হক

[খুলনা জেলার অন্তর্গত মালেক-পট্টেরকাঠী গ্রামে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে খাঁ বাহাদুর কাজি ইমদাদুল হক জন্মগ্রহণ করেন। বি.এ. এবং বি.টি. পাস করার পর ১৯০৬ সালে ইনি শিক্ষা-বিভাগে নিযুক্ত হন, এবং ১৯২৬ সালে যখন ইহার মৃত্যু হয় তখন ইনি ঢাকার ইন্টারমিডিয়েট ও সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ডের সেক্রেটারির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি ‘নবনূর,’ ‘ভারতী,’ ‘মোগলেন-ভারত’ পুস্তি পত্রিকায় নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং ‘নব-কাহিনী,’ ‘প্রবন্ধমালা,’ ‘সরল সাহিত্য-সংগ্রহ’ পুস্তি অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।]

তুমারাবৃত সিয়েরা নেভাডা (Sierra Nevada) গিরিশ্রেণীর পাদমূলে, বিশাল “ভেগা” (Vega) প্রান্তরের উপকলে, গ্রাণাডা-রাজ্যের রাজধানী গ্রাণাডা মহানগরী অবস্থিত। ইহারই এক প্রান্তে মূর-কীন্তিমুকুটের উজ্জ্বলতম রত্ন আল্‌হাম্‌রা প্রাসাদ নিম্নিত হইয়াছিল। ইহার অবভেদী চূড়া হইতে, বহু-স্রোতস্বিনী-সলিল-ধৌত, দ্রাক্ষা-নারঙ্গ-কাননপূর্ণ, ইত্যন্ত বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিরশ্যামল কুসুমকুণ্ড-সমন্বিত সেই বিস্তীর্ণ “ভেগা”র মনোহর শোভা নয়নগোচর হয়। সুশীতল মৃদুসমীরণ চিরহিমাবৃত “চন্দ্রগিরি”-শিখর হইতে অবতীর্ণ হইয়া, “ভেগা”-খণ্ডের প্রফুল্ল-কুসুমরাজির সৌরভ-ভার বহন করিতে

করিতে লোহিতপ্রাসাদের সুপ্রশস্ত গবাক্ষপথে যখন প্রবিষ্ট হয়, তখন নিদাঘ-প্রখর উষ্ণ মধ্যাহ্নও মাধবী-সন্ধ্যার ন্যায় সুখশীতল হইয়া উঠে।

আল্‌হাম্রা প্রাসাদ একটি অসমতল উচ্চভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার চতুর্পার্শ্বে অত্যুচ্চ দুর্ভেদ্য প্রাচীর, এবং স্থানে স্থানে দৃঢ় দুর্গ দ্বারা সুসংরক্ষিত। উত্তরে দারো (Duero) নদী ইহার পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। আল্‌হাম্রার অনেকগুলি প্রবেশদ্বার; তন্মধ্যে “ন্যায়দ্বার” সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। লোহিত এবং বাসন্তী বর্ণে সুরঞ্জিত একটি প্রকাণ্ড দুর্গ ভেদ করিয়া এই দ্বার আল্‌হাম্রার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। মুর-খলিফাগণ এই “ন্যায়দ্বারে” বিচারাসনে উপবিষ্ট হইতেন। এই পথে প্রাসাদে প্রবেশ করিলে, সম্মুখে একটি চতুর্কোণ প্রাঙ্গণ নয়নগোচর হয়। তাহার পর সুন্দর মার্চলপুঞ্জে সুশোভিত মার্চলপ্রাসাদ। এই রমণীয় প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথে কিয়দূর অগ্রসর হইলে, প্রায় শতহস্ত দীর্ঘ এবং তদর্দ্ধপরিমিত প্রস্থ একটি সুদৃশ্য প্রাঙ্গণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যস্থলে সুবর্ণমৎস্যপরিপূর্ণ একটি জলাশয় আছে; এবং যখন বালসূর্য্যারশ্মিজাল সেই সকল ক্রীড়ারত মৎস্যগাত্র হইতে প্রতিকলিত হইতে থাকে, তখন এক অতি অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য প্রকটিত হয়। নানাকারুকার্য্যখচিত এবং বিচিত্র চিত্রে শোভিত স্তম্ভসমূহে প্রাঙ্গণটি বেষ্টিত; ইহার উত্তরে চতুর্কোণ কোমারিস দুর্গ উর্দ্ধমুখে গগনমণ্ডল চুম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

আল্‌হাম্রার এই অংশ প্রগাঢ় শান্তিময়; এত নিস্তব্ধ যে, বহির্জগতের অস্তিত্বমাত্রও এখানে অনুমিত হয় না। ক্ষুদ্র একটি জলস্রোত নিঃশব্দে অতি মৃদুগতি জলাশয়ে প্রবেশ করে এবং তদ্রূপ নিঃশব্দে ভিনুপথে পুনরায় চলিয়া যায়। সমীরণের মৃদুতম একটি হিল্লোলও এ স্থানের লতাপত্রাদিকে এক বিন্দু কম্পিত করিতে সাহসী হয় না; কীটপতঙ্গের উল্লাস-রবের ক্ষীণতম একটি কম্পনও এ নীরবতা ভেদ করিতে পারে না,—এ স্থান এমনি নিস্তব্ধ। চারিদিক্ যেন একটি অচিন্তনীয় গম্ভীর স্তব্ধরাজ্য;—কিন্তু তাই বলিয়া এ নিস্তব্ধতার মধ্যে ধ্বংস ও মৃত্যুর নিদারুণ বিতীর্ণিকার ছায়া অনুভূত হয় না। শতাব্দীর পর শতাব্দী জগতের শত শত কীত্তিরামি বহন করিয়া কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষও সেই প্রাচীনকালের মাহাত্ম্য-মুকুট

শিরে পরিয়া অদ্যাপি দণ্ডায়মান রহিয়াছে,—সে যেন সর্বগ্রাসী কালের সহিত শত শত বর্ষ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণের অস্তিত্বটুকু জ্ঞাপন করিবার জন্য সদা সর্বদা ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছে।

রাজসভাগৃহে প্রবেশ করিলে মনে হয়, যেন অদূরে বহুকীৰ্ত্তিপ্রথিত মুর-সম্রাট রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া নীরবে আপনার প্রাচীন মহিমা বিস্তার করিতেছেন, এবং তাঁহার সভাসদগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া তেমনি নীরবে তাঁহার পুরাতন কীৰ্ত্তিকলাপ সন্ধান ছন্দে গাহিয়া যাইতেছেন। সে কি অপূর্ব গভীর করুণাগর্ভ স্মৃতিবিদারক নিস্তব্ধতা! মুহূর্ত্তের জন্য সে চিত্র মানসচক্ষে অঙ্কিত করিলে, নিমেষমধ্যে শত-শত-বর্ষ-পুরাতন মোস্লেমসৌভাগ্য-সূর্য্যের মধ্যাহ্নকিরণপ্রতাপে করুণা-প্রবণ অবশচিত্ত অভিভূত হইয়া যায়।

উপরি-উক্ত বিশাল প্রকোষ্ঠের প্রাচীরগাত্রে কারুকার্যখচিত নানাবর্ণের বহুমূল্য প্রস্তরসমূহ গ্রথিত রহিয়াছে; তদুপরি গগনস্পর্শী অর্ধমণ্ডলাকৃতি ছত্রতল, সূচিচিত্রিত গ্রহতারাди লইয়া যেন অনন্ত আকাশমণ্ডলের অনুকরণেচ্ছায় বিপুল দেহ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। সূদৃশ্য সুপ্রশস্ত গবাক্ষশ্রেণী কক্ষটি আলোকিত করিতেছে। এই সকল গবাক্ষের মধ্যে প্রবাদ-নিদ্বিষ্ট একটি গবাক্ষের নিকটবর্তী হইয়া সম্মুখস্থ দারো নদীর স্থূল রক্তরেখার উপর মুগ্ধদৃষ্টি ক্ষণকাল আবদ্ধ রাখিলে, স্মৃতি মন্বন করিয়া শত শত অতীত ঘটনার স্পষ্টচ্ছায়া চক্ষুর সম্মুখ দিয়া বহিয়া যায়। মনে হয়, পঁচিশত বর্ষ পূর্ব্বে বেগম আয়েষা তাঁহার শিশুপুত্র শাহজাদা আবু আবদুল্লাকে এই গবাক্ষপথে কোশলে নিম্নে অবতারণ করাইয়া, —বুঝি সে অতুলনীয় রাজ্য-সম্পদ ভবিষ্যতে তাঁহারই দুই হাত দিয়া নষ্ট করাইবার জন্য—একদিন গুপ্তহস্তার হস্ত হইতে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। আবার যখন মনে পড়ে, এই আবদুল্লাকে লক্ষ্য করিয়া সহৃদয় সম্রাট পঞ্চম চার্লস্ একদিন গভীর সহানুভূতির সহিত কহিয়াছিলেন,—“যাহার হস্ত হইতে এ অসীম সম্পদ চিরদিনের জন্য স্থলিত হইয়া গিয়াছে, হায়, সে কত না দুর্ভাগ্য।”—তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে বলিতে ইচ্ছা করে—“হায়, সেই গুপ্তহস্তার হস্তে কেন এ হতভাগ্য শিশুকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল না।” আবার যখন মুর-সুলতানগণের সম্পদগৌরবের কথা চিন্তা হইতে ক্রমে অপসৃত হইয়া, পরবর্তী ইসাই রাজত্বকালের দুই একটি চিত্র উদিত হইতে থাকে, তখন সহসা

মনে পড়িয়া যায়, স্বনামধন্য মহাত্মা কলম্বুস তাঁহার কল্পিত নূতন পৃথিবী আবিষ্কারার্থ একদিন রাণী ইসাবেলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিফল-মনোরথ হইয়া কোন বিদেশীয় সহৃদয় নরপতির নিকট আবেদন করিবার কথা করনা করিতে করিতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, সে-ও ত এই ঐতিহাসিক গবাক্ষেরই সম্মুখ দিয়া ।

অপ্রশস্ত ঘূণিত সোপানপথে উল্লিখিত প্রকোষ্ঠের উচ্চ শিখর-দেশে আরোহণ-কালে মনে হয়, ভেগা-প্রান্তরে কোন যুদ্ধ হইবার সময়ে সৈন্যগণের গতিবিধি-দর্শনমানসে কত সুন্দরী রাজকন্যা এবং কত বীরশ্রেষ্ঠ রাজপুত্র এই সোপান অতিক্রম করিয়া প্রাসাদশীর্ষে আরোহণ করিতেন, আর সুন্দরীগণের সুকোমল চরণস্পর্শে সেই সোপানাবলী কত মৃদুমধুর শব্দ করিত এবং বীরপুরুষগণের পদভরে কিরূপ গৌরবান্বিত হইত ! শীর্ষদেশ হইতে ভেগার বিশাল বক্ষে দৃষ্টি স্থাপিত করিলে, তাহার কোন্ কোন্ অংশে পুরাকালে ইসাই এবং মোন্সেনমগণ আল্‌হাম্রার অধিকার লইয়া বারবার সমরে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা প্রবাদবাক্য-দ্বারা নির্দ্ধারিত করিবার জন্য চিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠে । সঙ্ক্ষে সঙ্ক্ষে সেই বহু-পুরাতন জনশ্রুতিগুলি স্মরণ করাইয়া দেয় যে, রাণী ইসাবেলা একবার কলম্বুসের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া, পুনরায় তাঁহাকে ডাকিয়া আনাইবার জন্য যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে ত ঐ স্থানে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া, দেশত্যাগোন্মুখ ভগ্নহৃদয় কলম্বুসকে ফিরাইয়া আনিয়াছিল । প্রচলিত প্রবাদমাত্রই এই সকল ঐতিহাসিক স্থান চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে । কিন্তু তাহাতে কি আসে যায় ? এই কিংবদন্তীগুলি আল্‌হাম্রার এক একটি প্রধান অঙ্গ-স্বরূপ ; কেন-না, ইহারা আল্‌হাম্রার অনন্ত সৌন্দর্য্য একটি করনা-মুখর গাভীরোঁ এবং একটি বিচিত্র বহস্যময় ইন্দ্রজালে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে ।

অতীত স্মৃতির এই প্রিয় নিভৃত আবাসভূমি পশ্চাতে রাখিয়া আল্‌হাম্রার আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, মুর-সুলতানগণের অন্তঃপুর প্রাপ্ত হওয়া যায় । তত্রত্য গবাক্ষপথে ভেগা-প্রান্তরের নয়নাভিরাম শ্যামল শোভা, দূরদূরবর্তন অধিকতর মনোহর বলিয়া অনুভূত হয় । এ অন্তঃপুরের কক্ষগুলির তদনুশীল তুমারধবল মর্মরে মণ্ডিত । ইহার প্রত্যেকটির দ্বারসন্নিধানে কক্ষতলে কতকগুলি করিয়া সজ্জীর্ণ ছিদ্র আছে । শুনা যায়, ইহার নিম্নদেশে নানাজাতীয় গন্ধদ্রব্য

প্রজ্বালিত হইত এবং তদুপিত সুরভি ধুমুরাজি ঐ সকল রত্নপথে সুলতানাগণের কক্ষসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া, সমস্ত অন্তঃপুর এক স্বর্গীয় পরিমলে আমোদিত করিয়া তুলিত। এই প্রবাদ হইতে প্রাচীন মুরজাতির বিলাসিতার কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রত্যেক কক্ষে একখানি বহৎ প্রস্তরখণ্ড হইতে খোদিত এক একটি স্নানাগার সংলগ্ন আছে; এগুলি বিচিত্র বর্ণে ও কারুকার্যে সুচিত্রিত এবং গোলাপ ও নক্ষত্রাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে আলোকিত। অন্তঃপুরের মধ্যে একটি কুসুমিত-লতাগুল্মাশোভিত প্রস্তরময় ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ দৃষ্ট হয়। ইহারও একপার্শ্বে কতকগুলি স্নানাগার রহিয়াছে। এই স্নানাগারগুলিতে যে চিত্র-নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা অতীব বিস্ময়জনক। সুলতানাগণের স্নানকালে এবং স্বর্ণশয্যায় বিশ্রামকালে তাঁহাদিগের চিত্তবিনোদনার্থ যখন গীতবাদ্য হইত, তখন এই প্রাঙ্গণমধ্যস্থিত একটি উৎস হইতে তাহার সহিত তালে তালে শ্রুতিমধুর সলিল-কল্লোল উথিত হইত।

আল্‌হাম্‌রার সিংহপ্রাসাদই সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও প্রসিদ্ধ। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যত সৌন্দর্য্য যেন তিল তিল করিয়া এই প্রাসাদে মাখাইয়া রাখিয়াছে। পূর্ব-বর্ণিত মার্টলপ্রাসাদ অপেক্ষা ইহার আয়তন কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রতর। ১২৮টি মর্মর-স্তম্ভে সিংহপ্রাসাদ সুশোভিত। ইহার প্রাঙ্গণে একটি বৃহৎ শূন্য-জলপাত্রের উপর দ্বাদশটি সিংহের প্রস্তরমূর্ত্তি সজ্জিত রহিয়াছে বলিয়া ইহার নাম সিংহপ্রাসাদ। এক সময়ে এই দ্বাদশটি সিংহমূর্ত্তিনিঃসৃত সুবাসিত সলিলে শূন্যপাত্রটি সর্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। অন্যগুলির ন্যায় এ প্রাসাদ তেমন উচ্চ না হইলেও, ইহার বিচিত্র নির্মাণপ্রণালী, অমলধবল স্তম্ভশ্রেণীর গঠনপারিপাট্য এবং সুনিপুণ শিল্পী-চিত্রিত স্বর্ণ ও অন্যান্য বিবিধ বর্ণের চিত্ররাজির ধ্বংসাবশেষেরও অদ্ভুত পরিষ্ফুটত্ব, প্রথম দর্শনে ইহাকে কল্পনাসর্ব্বস্ব কবির স্বপ্নদৃষ্ট কোন পরীরাজ্যের সুন্দরী রাজকন্যাদিগের বিলাসপ্রাসাদের ছায়ামাত্র বলিয়া সহসা ভ্রম জন্মাইয়া দেয়।

দেশের সেবা

অনুরূপা দেবী

[অনুরূপা দেবী সুপুষ্ক সাহিত্যিক ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের কন্যা । ইনি বাল্যে পিতামহ ও পিতার নিকটে সংস্কৃত কাব্য ও দর্শনাদি শিক্ষা করেন । ইহার স্বামী উত্তরপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশুবিদ্যালয়ের স্নবর্ণ-পদকধারী, গণিত-শাস্ত্রে পুণ্ডিত ও মজঃফরপুরের লক্ষপুতিষ্ঠ ব্যবহারাজীব । ইনি স্বামীর নিকটে ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যাদিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন । এইরূপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ইনি বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন । ইনি বহু উপন্যাস ও গল্পের রচয়িত্রী হইলেও, ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি নানা-বিষয়ক যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া সাহিত্যে যশোভাগিনী হইয়াছেন । ইহার প্রণীত উপন্যাসগুলির মধ্যে ‘মদ্রাজি,’ ‘মহানিশা,’ ‘মা,’ ‘পোষ্যপুত্র,’ ‘পথের সাথী,’ ‘বাগ্‌দস্তা,’ ‘গরীবের মেয়ে,’ ‘পথহারা,’ ‘উত্তরায়ণ,’ ‘চক্র,’ ‘বিবর্তন’ প্রভৃতি সর্বজনপ্রিয় সুপরিচিত গ্রন্থ; ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচখানি নাট্যকাব্যে রূপান্তরিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে সাফল্য অর্জন করিয়াছে ।]

বারীংপুর একখানি গ্রাম হইলেও, নিতান্ত গওগ্রাম নহে । গঙ্গাতীর হইতে ইহার শোভাটিও নেহাৎ হতশ্রী দেখায় না । গ্রামের মধ্যে দুচার ঘর মধ্যবিত্তের বাস থাকায়, এই গ্রামে একটা স্কুল, একটা ছোট গোছের লাইব্রেরী, ও সম্প্রতি গ্রামের মেয়েদের জন্য একটা বালিকা-বিদ্যালয়ও সংস্থাপিত হইয়াছে । রামদয়াল গুপ্ত পুরুষানুক্রমে এই গ্রামেই বাস করিয়া আসিতেছেন । সাধারণের সকল কার্যে—যেমন, স্কুল-সংস্থাপন ও পরিচালনে, লাইব্রেরী-স্থাপনায়, মিউনিসিপ্যাল যে কোন ব্যাপারে—সকল বিষয়েই রামদয়াল অগ্রণী ছিলেন । ইহার জন্য, এবং সংসারের নানাবিধ ব্যয়বাহুল্যে, পয়সা খরচ তাঁহাকে কম করিতে হয় নাই । এইভাবে তাঁহার স্বল্প সঞ্চয় নিঃশেষ হইয়াছিল ।

গ্রামের একজন জমিদার ছিলেন । বহুকাল তিনি অন্যান্য জমিদার-জাতীয় জীবদিগের মতই অসত্য পল্লীজীবনের মায়া কাটাইয়া সহরবাসী । তাঁহাদের পুরানো ফ্যাসানের বৃহৎ অট্টালিকাটার সদর দেউড়ী খোলা থাকিলেও, ভিতরে একটা দুঃস্থ আত্মীয় ব্যতীত আর বড় কেহ থাকিত না । এই পরিবারটির দারিদ্র্য-খ্যাতি এ অঞ্চলের মধ্যে সর্বত্র ব্যাপার । জমিদারগৃহে বাস করিয়াও

উহারা একাহারী, অনাহারী থাকিয়া দিনপাত করিতেছেন—সে কথা গোপন করিবার কোন প্রয়োজন বোধ করিতেন না।

একদা বহুকালবিস্মৃত পিতৃ-ভূমে এক জমিদার-পুত্রের আবির্ভাব হইল। দেশের লোক কোতূহলী হইয়া ভিড় করিল; কিন্তু বিরক্তি ও নৈরাশ্য লইয়া ফিরিয়া গেল। জমিদার-পুত্রের চেহারাটা ছাড়া, আর কোনখানটাতেই তাহার জমিদারত্ব ব্যক্ত হইতেছিল না। ছেলেটির ষাড় টাঁচিয়া কামানো,—সামনে কোঁকড়া চুলের সুন্দর স্তর।—উজ্জ্বল চক্ষু সোনার বাঁধনে বাঁধা চশমায় মণ্ডিত।—গায়ে সাদাসিদা পিরান ও ধুতী। সে আসিয়া বড়রকম একটা ভোজ্য দিল না;—খাজনা মাপ দিল না। একদিন লাইব্রেরীর বারান্দায় লোক জড়ো করাইয়া, সবার নিকট—কলিকাতায় যেখানে সে নিজে থাকে, সেইখানেরই কি একটা অজ্ঞাত প্রয়োজন-সাধনের নিমিত্ত যে সভা তাহারা করিয়াছে (যাহার সঙ্গে এ গ্রামের কোনই লাভ-ক্ষতির সম্বন্ধ জড়িত নয়), তাহারই জন্য—টাঁদার বহি বাহির করিয়া ধরিল। গ্রাম্য-বৃদ্ধগণ প্রকাশ্যে নিন্দা করিলেন, অপ্রকাশ্যে গালি দিলেন। যুবার দল কেহ-বা টাঁদা দিয়া জমিদারের সহিত সখ্য করিল, কেহ-বা জমিদারের সঙ্গে এবং তাঁর সঙ্গীদের সহিত বচসা আরম্ভ করিয়া দিল। জমিদার নিজে আসিয়া বলিল, “এ দেশের কাজ,—এতে সকলে যোগ না দিলে পাপ হইবে। অতএব তোমাদের আত্মার কল্যাণের জন্যই তোমাদের ইহাতে যোগ দিতে ডাকিতেছি।”

উহারা বলিল, “দেশের যদি কাজ হইত, তাহা হইলে দেশ ইহার ফলভাগী হইত। তোমার কলিকাতার রাস্তায় গিয়া তুমি হাত-পা নাড়িয়া বজুতা করিবে, তাহাতে কি আমার ঘরে অর্থ আসিবে, না আমার গ্রামের ম্যালেরিয়া দূর হইবে, না ভাত-কাপড় সম্ভা হইবে?” জমিদার ঘৃণার সহিত হাসিয়া বলিল, “দেশের আইডিয়াটাই তোমাদের কত ক্ষুদ্র। দেশ বলিতে কি এই গ্রামখানিই বুঝায়? সমস্ত ভারতবর্ষই তো আমার দেশ। ভারতলক্ষ্মী আমার দেশ-মাতা। শুধু গ্রামের উন্নতি, ঘরের উন্নতি খুঁজিলে দেশের কার্য্য করা হয় না। আমাদের এখন স্বরাজ চাই, স্বাধীনতা চাই, নিজেদের সব স্বাধ বিসর্জন দিয়া, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, ঐ বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে।”

অপর পক্ষ চটিয়া বলিল, “রেখে দাও তোমার স্বরাজ। রেখে দাও

তোমার স্বাধীনতা। নিজের গাঁয়ের ভিটে মাটি হ'চ্ছে। গাঁয়ে খাবার জলের অভাবে লোকে পচা জল খাচ্ছে। মড়কে মানুষ ম'রে গ্রাম শূণ্য হ'চ্ছে।—একটা ডাক্তারখানা নেই, অতিথিশালা নেই,—এইটুকুই পেরে ওঠেন না, আর ওঁরা সমস্ত ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবেন। সে অমনি ছেলের হাতের মোয়া কি না।”

জমিদারের দল উত্তেজিত হইয়া জবাব দিল, “ছোট কাজ করবার অবসর অনেকেরই হয়। একটা মহত্তর ব্যাপার সংঘটিত ক'রে তোলা মুখের কথা নয়। আগে স্বরাজ আদায় হ'ক, এসব তখন আপনিই ঘ'টে যাবে।”

বিপ্লবগণ এ কথা মানিতে চাহিল না। তাহারা সেকালের নিরাড়ম্বর দেশ-প্রীতির দু'একটা উদাহরণ দিতে বসিয়া গেল,—যখন সভা-সমিতির খুব জাঁক ছিল না, কিন্তু কাজ ছিল—ধর্মের নামে জনহিতকর কার্য্য হইত—জমিদারের বাড়ীতে চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম থাকিত—নিত্য নিত্য ক্রিয়া-কলাপে গরীবসাধারণ ভালমন্দ খাইতে পাইত—পুণ্যের লোভে লোকে পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠায় উত্তম পান-জলের ব্যবস্থা করিত—বৃক্ষ-ছায়ায় পথিকের তাপ দূর করিত। কেহ কেহ দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এই গ্রামেরই রামদয়াল গুপ্তের নাম করিল; বলিল, “এখনও তো ঐ একটা বৃদ্ধ বেঁচে রয়েছেন। কোন ধুমধাম না ক'রেই সকল ভাল কাজের মধ্যে আছেন। স্কুল চাই? আচ্ছা, স্কুল নাও। পুকুর ম'জে উঠেছে? আচ্ছা, কাটিয়ে দিচ্চি। রাস্তা বে-মেরামত? তৈরি হ'ল।—তা যতটা শক্তি—অর্থ দিয়ে, যতটা শক্তি—সামর্থ্য দিয়ে, আর যতটা পারা যায়—দৃষ্টান্তে ও মিষ্টি কথায় পাঁচজনের মন ভুলিয়ে। একেই বলি দেশের কাজ। প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক পল্লীতে যদি এরই অনুকরণ হয়, তবেই ত দেশে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা আপনি হবে।”

নবীন জমিদার দলবলকে বলিয়া দিল, “ওহে, রামদয়ালের কাছে গেলে, হয় ত বেশ বড় রকম একটা চাঁদা আদায় হবে। তা'ছাড়া, ধ'রে ক'রে পাঁচজনের কাছে থেকেও কিছু কিছু—”

বৃদ্ধ জীর্ণ রামদয়ালের সহিত এই নবীন, এবং জীবনের উদ্যম-চাঞ্চল্যে সতেজ, তরুণটির অনেক কথাই হইল। রামদয়াল উহার চাঁদার খাতায় সহি দিলেন না; তবে সঙ্গে-সঙ্গেই পাঁচশটি টাকা নগদ গণিয়া উহার হাতে দিলেন।

ছেলেটা খুঁৎ খুঁৎ করিয়া জানাইল, তাঁহার বদান্যতা-সম্বন্ধে সে এর চাইতে ঢের বেশী গুজব শুনিয়াছিল। রামদয়াল ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—লোকে সাধারণতঃ একটু বেশি করিয়াই বলিয়া থাকে। আপাততঃ এখানে একটা মেয়ে-স্কুল করিবার কল্পনা আছে; সেজন্যও কিছু টাকা খরচের প্রয়োজন। গ্রামের কাজ ফেলিয়া গ্রামান্তরের কাছে হাত দেওয়া, তাঁহার মতে একটুখানি অসঙ্গত,—অবশ্য যদি সেটা বেশী প্রয়োজনীয় না হয়।

ছেলেটা বুঝিল, ইতঃপূর্বে যাহারা এই গ্রাম্য-প্রীতি লইয়া তর্ক করিয়াছিল, তাহারা এই বৃদ্ধ ব্যক্তিটিরই ছাত্র। কিছু বিরক্ত হইয়া কহিল, “দেখুন ‘আইডিয়াল’টা (আদর্শ) একটু ‘হাই’ (উচ্চ) হওয়ায় দোষ কি? এই যে সব সঙ্কীর্ণ মতগুলো আপনারা প্রচার ক’রে থাকেন, দেশের এই নূতন উদ্যমের দিনে এটা কি ভাল?”

রামদয়াল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন্টা?”

ছেলেটা উত্তর করিল, “এই—গ্রামকেই সর্বস্ব মনে করা। এক ত আমাদের দেশের লোকে এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া যাওয়াকে ‘বিদেশ যাত্রা’ মনে করে; নিজ শ্রেণীর বাইরেই ব্রাহ্মণে-ব্রাহ্মণে এক পংক্তিতে খায় না,—ব্রাহ্মণ-কায়স্থে ত কথাই নাই। এখনও যদি আপনারা, এই সব জটিল এবং কুটিল শিক্ষার কুহক থেকে দেশকে মুক্তি দেবার চেষ্টা না ক’রে, তাকে এক বিশাল ভারতবর্ষ—এক বৃহত্তম ভারতীয় নেশনে পরিপূর্ণিত হ’তে না দিয়ে, শুধু নিজের পরিবারে—স্ব-গ্রামে বদ্ধ রাখতে চান, তা’হলে আমাদের স্ব-রাজ-প্রাপ্তির আশা কি শুদ্ধ আকাশ-কুসুমেরই পর্যাবসিত হবে না?”

বৃদ্ধ ব্যক্তিটি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিয়াছেন, এমন বোধ হইল না। বৃদ্ধহাস্যে তাঁহার শীর্ণ মুখে এক অপূর্ব আলোক-দ্যুতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি তরুণের আবেগোত্তেজিত, আরক্ত সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া স্নেহ-মধুর কণ্ঠে কহিলেন, “বাবা, তুমি যা বল্ছো, সব ঠিক। কিন্তু নিজের পরিবারকে—স্ব-গ্রামকে যদি দুর্দশার মধ্যে ফেলে রাখতে চাও, তা’হলে তোমার স্ব-রাজকে তুমি প্রতিষ্ঠা করবে কোন্ সহরের কোন্ টাউন হলে? প্রত্যেকে যদি তোমরা তোমাদের দরিদ্র আত্মীয়ের, দরিদ্র মুখ প্রতিবেশীর অঙ্গতা, রোগ, অভাব বিদূরিত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হও,—যদি জাতিকে বিদ্যা দান কর, নৈতিক

চরিত্রে উন্নতি দানের চেষ্টা কর,—যদি তাদের মানুষ ক'রে গ'ড়ে নেবার জন্য আত্মোৎসর্গ কর,—যে ম্যালেরিয়া সোনার বাংলাকে যমের দক্ষিণ দুয়ারে পরিণত ক'রে তুলছে, তার উচ্ছেদকেই যদি জীবনের প্রধান তপস্যা ক'রে তোল,—যদি পাশ্চাত্য শক্তির সঙ্গে প্রাচ্যের ধর্মপ্রাণতায় নিজেদের অলঙ্কৃত ক'রে তোল—তা'হলে তার চেয়ে বড় স্ব-রাজ আর কে কোথায় পেয়ে থাকে ? ”

পাষাণের কথা

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

[১২৯২ সালে (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে) রাখালদাস জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই ইনি ভারতীয় পুস্তকতত্ত্বের চর্চায় নিযুক্ত হন। মুদ্রাতত্ত্ব ও পুস্তকলিপিতত্ত্ব, এই দুই বিষয়ে ইহার অসামান্য প্রতিভা ও অভিজ্ঞতা ছিল। কয়েক বৎসর ইনি ভারতীয় পুস্তকতত্ত্ব-বিভাগের সহকারী পরিদর্শক-পদে নিযুক্ত ছিলেন। নোহেন্-জো-দড়োর আবিষ্কার ইহার অক্ষয় কীৰ্ত্তি। বাদালা ও ইংরাজীতে ইনি বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার রচিত ' The Palas of Bengal ' নামক গ্রন্থ কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে এবং ' History of Orissa ' নামক গ্রন্থ প্রবাসী প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ' পাষাণের কথা ' ইহার রচিত প্রথম বাদালা গ্রন্থ। ইহার ' বাদালা ইতিহাস ' বাদালা ইতিহাস-সাহিত্যের একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। ইহার ' প্রাচীন মুদ্রা ' পুস্তকে ভারতীয় প্রাচীন মুদ্রাতত্ত্বের বিবরণ বিশেষ পাণ্ডিত্য-সহকারে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার ' শশাঙ্ক ' ও ' ধর্মপাল ' বাদালা ঐতিহাসিক উপন্যাসকে এক নূতন রূপ দান করিয়া স্মৃতিসমাজে প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। ১৩৩৭ সালে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।]

আমার সময়ের ধারণা নাই, স্মৃতির আঁশ আমার জন্ম-মুহূর্ত্ত হইতে কত কাল অতীত হইয়াছে তাহা আমি বলিতে পারি না। যতদূর স্মরণ আছে তাহাই বলিতেছি। শৈশবের কথা এইমাত্র মনে পড়ে যে, প্রশস্ত সমুদ্রসৈকতে আমি ও আমার ভ্রাতৃবর্গ খেলা করিয়া বেড়াইতাম—বায়ুভরে উড়িয়া যাইতাম, ধন-বাতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতাম; কখন বা সমুদ্রের জলে পতিত হইতাম;

জল সরিয়া গেলে—ভূমি শুক হইয়া গেলে পুনরায় ফিরিয়া আসিতাম। সে সমুদ্রের বিশালতা ধারণা করিবার শক্তি তোমাদের নাই; সে সমুদ্রসৈকতের বিস্তৃতি তোমাদিগের মহাপ্রদেশসমূহের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অধিক। যে সকল জলজন্তু সেই মহাসমুদ্রে বাস করিত, যোবনের মূর্ছাভঙ্গের পর তাহাদিগকে আর দেখি নাই। আমার শৈশবে আমি একবার মূর্চিহীন হইয়াছিলাম। মূর্ছাভঙ্গে দেখি আমি যোবনপ্রাপ্ত হইয়াছি। শুনিয়াছি, তোমাদিগের এই সংগ্রহশালায় সেই মহাসমুদ্রের জীবজন্তুর অস্থি আছে। কিছুকাল পূর্বে শ্বেতকায়, বিরলকেশ একজন সাধক পর্বত ভেদ করিয়া সেই সকল জীবজন্তুর অস্থি লইয়া আসিয়াছিলেন।

কতদিন সমুদ্রসৈকতে উড়িয়া বেড়াইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। অবস্থান্তর-প্রাপ্তির পূর্বের কথা সামান্যমাত্র আমার মনে পড়ে। একদিন মধ্যাহ্নে প্রখর-সূর্য্যাতপ্ত বায়ু আমাকে অপর কতকগুলি বালুকণার সহিত সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করিয়াছিল। সে দিন যত দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, জীবনে আর কোন দিন তত দূর আসিতে পারি নাই। আমার জীবনযাত্রায় সেই প্রথম পাদক্ষেপ। সে দিন বুঝিতে পারি নাই যে, পরে অতীতকালের সাক্ষিস্বরূপ বহুযুগের ইতিহাস বহন করিয়া আমাকে সংগ্রহশালায় আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। সে দিন যে স্থানে আসিয়াছিলাম, সে স্থান হইতে সমুদ্রের জল সরে না, সুতরাং শৈশবের আবাস-ভূমি আর কখনও দেখি নাই।

সমুদ্রগর্ভে অপরাপর বালুকণার সহিত বহুকাল বাস করিয়াছি। কত অপরূপ জলজন্তু আমাদের বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া যাইত। আমরা তাহাদের অনুমুখ্য দেখিতাম। বালুকাময় সমুদ্রগর্ভে তাহাদের জন্ম হইত। তাহারা আমরণ সেই বালুকাক্ষেত্রেই বাস করিত। জীবনান্তে তাহাদের অস্থিগুলি শুভ্র বালুকাক্ষেত্রটিকে শুভ্রতর করিয়া তুলিত। সেই সকল অস্থি তোমাদের অতীত জীববিদ্যার মূল। তোমরা সেই যুগের কোন জীবেরই সমগ্র কঙ্কাল সংগ্রহ করিতে পার নাই, একখানি দুইখানি অস্থি লইয়া তোমরা অতীত যুগের জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিতে চাহ; কিন্তু তাহা হয় না। অতীতের সাক্ষী, আমি—সেই সকল জীব দেখিয়াছি। আমি তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছি; তাহাদিগের জীবনের প্রারম্ভ হইতে তাহাদিগের চৈতন্যের শেষ সীমা পর্য্যন্ত

তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছি ; জীবনান্তে বহুযুগ তাহাদের অস্থিচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়াছি—আমি বলিতেছি, তাহা হয় না। তোমরা অতীত যুগের জীবনসমূহের যে চিত্রাবলী রাখিয়াছ, তাহা হাস্যোদ্দীপক। বালুকণার যদি উচ্চহাস্য করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আমার উচ্চহাস্যে তোমাদের এই গৃহ ধ্বনিত হইয়া উঠিত। আমি দেখিয়াছি, আমার স্মরণ আছে, কিন্তু আমার মনের ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই, তোমাদের মত বলিবার বা লিখিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং সব জানিয়াও আমার কিছু বলা হইল না।

সমুদ্রগর্ভস্থ বালুকাক্ষেত্রে কত দিন বাস করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না ; কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার সময়ের ধারণা নাই। শৈশবে যে আমার মূর্ছা হইয়াছিল তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। একদিন সূর্যাস্তকালে কোন দারুণ আঘাতে সমুদ্রগর্ভ বিদীর্ণ হইয়া গেল, গভীর আলোড়নে বিশাল জলরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, বহু জলজন্তুর জীবনান্ত হইল—আমি মূচ্ছিত হইলাম। তাহার পর কালপ্রবাহ কি ভাবে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা কেমন করিয়া বলিব ? অজ্ঞান অবস্থায় আমি যেন অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিতাম, যেন দুঃখবহ যাতনা অনুভূত হইত, বোধ হইত যেন কেহ ভীষণ বলে আমার ক্ষুদ্র দেহখানি ক্ষুদ্রতর করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত আর কিছুরই স্মরণ নাই। মূচ্ছাভঙ্গে দেখি, অজ্ঞাত শক্তির প্রয়োগে বালুকাক্ষেত্রে বিষম বিপর্যয় ঘটিয়াছে। সেই সমুদ্রসৈকত, সেই বিশাল জলরাশি, সেই সব জীবজন্তু, উদ্ভিদ সমস্তই অস্তিত্ব হইয়াছে। সে জগৎ আর নাই ; অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে লক্ষ লক্ষ বালুকাকণা একত্র হইয়া রক্তবর্ণ প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে,—আমার স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে।

চেতনার প্রারম্ভে দেখিলাম, নূতন জগতে তৃণশপ্প, তরুলতা, জীবজন্তু প্রভৃতি সমস্তই পরিবর্তিত হইয়াছে। সে নূতন জগতের আকার অনেকটা বর্তমান জগতের ন্যায়। তাহার পর স্থানে স্থানে পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র। আমি তখন যে প্রস্তরখণ্ডের দেহে লীন হইয়া ছিলাম, মূচ্ছা-অবস্থানে দেখি, তাহার দেহ স্নিগ্ধ শ্যাম-দূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত ; নূতন আকারের চতুষ্পদ জীব তাহার উপরে বিচরণ করিতেছে। সময়ে সময়ে মসীকৃষ্ণবর্ণ ছাগচর্মাচ্ছাদিত তোমাদের স্বশ্রেণীর জীবগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিত। তাহারা

নখ, দস্ত বা উপলব্ধের সাহায্যে চতুষ্পদ জীবগুলিকে জয় করিবার চেষ্টা করিত ও লোকবলের আধিক্যে অনেক সময়ে তাহাদিগকে নিধন করিতে সমর্থ হইত ; কিন্তু কখনও কখনও শৃঙ্গের তাড়নায় পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেও বাধ্য হইত । আমার নিকটে ইহাই মানব-জীবনের ইতিহাসের সূত্রপাত । মনুষ্য আমার নিকটে তখন নবজাত জীব । আমি যখন জ্ঞানলাভ করি তখন মনুষ্যজাতি উন্নতির পথে কিয়দূর অগ্রসর হইয়াছে, সুতরাং মনুষ্য-জীবনের প্রারম্ভের কথা বলিতে আমি অক্ষম । আমি সর্বপ্রথমে মনুষ্যজাতীয় যে সকল জীব দেখিয়াছিলাম, তাহারা অত্যন্ত খর্বাকৃতি ছিল এবং মৃগয়াই তাহাদিগের উপজীবিকা ছিল বলিয়া বোধ হইত । শুনিয়াছি, তৎসংশীয়েরা দক্ষিণ-সমুদ্রের উপকূলে অদ্যাপি বাস করিয়া থাকে । অপেক্ষাকৃত বলবান্ জাতি কর্তৃক তাড়িত হইয়া তাহারা এখন বৃক্ষশাখা আশ্রয় করিয়াছে ; বৃহদাকার জন্তর অভাবে তাহারা কীটপতঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা জঠরানল নিবৃত্তি করিয়া থাকে । ইহারাই এই দেশের প্রকৃত অধিপতি, কারণ মনুষ্য-জীবনের প্রারম্ভে ইহারাই শুষ্ক ভূমির এই অংশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল । পরে তোমাদের পূর্বপুরুষ প্রভৃতি যে সকল জাতি আসিয়া এ দেশে বাস করিতেছে তাহারা সকলেই দস্যু ও অধর্মাচারী । যে কৃষ্ণবর্ণ খর্বকায় মনুষ্যজাতির কথা বলিলাম, তাহারা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প ছিল—শতাধিক ব্যক্তিকে কখনও একত্র হইতে দেখি নাই । তাহারা ধাতুর ব্যবহার জানিত না, শিলাখণ্ডই তাহাদিগের একমাত্র আয়ুধ ছিল । কিছুকাল পরে সে জাতীয় মনুষ্য এ প্রদেশ হইতে অন্তহিত হইল । তাহারা কোথায় গেল, কেন গেল, তাহা বলিতে পারি না, কারণ তখনও আমরা ভূগর্ভ-নিহিত ছিলাম । তোমরা অনুমান কর, সত্যতর জাতি আসিয়া তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের সাহায্যে পূর্বোক্ত কৃষ্ণবর্ণ খর্বাকার মনুষ্যজাতির ধ্বংস-সাধন করিয়াছিল । তাহার কতকটা সত্য হইতে পারে, কারণ ইহার পরবর্তী মনুষ্যেরা উজ্জ্বল ধাতুময় অস্ত্রের সাহায্যে মৃগয়া করিত । একদিন একজন ঐরূপ অস্ত্রের সাহায্যে আমাদিগকে ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল । দূরে পাটলীপুত্রবাসী তিস্রু-দন্ত যে স্তম্ভ দেখিতেছে, উহার একপার্শ্বে অদ্যাবধি সেই অগ্ন্যধাতের চিহ্ন বর্তমান আছে । পরে জানিয়াছি, ঐ ধাতু তাম্র । শুনিয়াছি, যে জাতীয় মনুষ্য তাম্র-নির্মিত অস্ত্র ব্যবহার করিত, তাহাদিগের বংশধরেরা বিস্তীর্ণ দক্ষিণাত্যে

এখনও বাস করিতেছে। তোমাদের সংগ্রহ-শালায় তাম্রনির্মিত আয়ুধের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প, কিন্তু তুমি বোধ হয় এই জাতীয় অস্ত্র অনেক দেখিয়াছ। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যখন লৌহনির্মিত অস্ত্রের সাহায্যে ভারতবর্ষ অধিকার করেন, তখন পূর্ববাসীরা তাড়িত হইয়া বিদ্যা পর্বতের দক্ষিণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ক্রমে বিজিতেরাও লৌহ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাম্রের ব্যবহার রহিত হইয়া যায়। একদিন রাত্ৰিকালে তাম্রনির্মিত অস্ত্রধারী কতকগুলি লোক আমাদের বন্ধের উপর আসিয়া কয়েক স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। বহুকাল পরে সেই দিন ঐ আলোক দর্শন করিলাম। ইহার পূর্ববর্তী ঘটনা যাহা বলিয়াছি তাহা পার্শ্ববর্তী বালুকাকণার নিকট শুনিয়াছিলাম। অগ্নির সাহায্যে ক্রমে আমাদের বন্ধ ও পার্শ্বস্থিত তৃণক্ষেত্র ভস্মো পরিণত হইল। দারুণ উত্তাপে আমরা বিদীর্ণ হইয়া গেলাম ও জনগণ পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। ক্ষণকাল পরেই শ্বেতবর্ণ, দীর্ঘকায়, সুদীর্ঘ পিঙ্গলবর্ণ-কেশধারী কতকগুলি মনুষ্য পার্শ্ববর্তী বনভূমি হইতে নির্গত হইয়া আসিল। তাহারা আসিবামাত্র চতুর্দিক হইতে কৃষ্ণবর্ণ তাম্রনির্মিত-অস্ত্রধারী পুরুষ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। শ্বেতকায় ব্যক্তিগণ আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া মৃত্যুকালে অগ্নি ও আকাশকে লক্ষ্য করিয়া নূতন ভাষায় গভীর শব্দে কি বলিয়া গেল। সেই শব্দমালার গাভীর্য্য এত অধিক যে, আক্রমণকারীদের মধ্যে কয়েকজন ভীত হইয়া পলায়ন করিল। শ্বেত-কৃষ্ণ মনুষ্যের বিবাদের ফলে আমি অগ্নির আলোক দর্শন করিলাম। পরে কতবার সেরূপ আলোক দেখিয়াছি, কতবার উজ্জ্বলতর অগ্নি আমার নিকট প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, কিন্তু প্রথম সে আলোক-দর্শনে যে আনন্দ তাহা পরে আর অনুভব করি নাই। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রক্ততত্ত্ব বর্ণাবৃত, স্তূতীক্স অস্ত্রধারী শ্বেতকায় সৈনিকগণ দলে দলে আসিয়া ভস্মরাশি বেষ্টন করিয়া ফেলিল—বিলাপে পর্বতের সানুদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দলে দলে সৈনিকবর্গ কাষ্ঠ-অনুঘণে চলিয়া গেল। কেবল কয়েকজন মাত্র মৃতদেহের পাশে বসিয়া রহিল।

কিয়ৎকাল মধ্যে চিতাধূম গগন স্পর্শ করিল, অরণ্যবাসী শ্বেতকায় মনুষ্য-গুলির দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। দণ্ডাবশিষ্ট অস্থিগুলি একটি ক্ষুদ্র মৃন্ময় পাত্রে রক্ষিত হইল, দলে দলে শ্বেতকায় মনুষ্য আসিয়া তাহাতে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া গেল।

সন্ধ্যাকালে একটি গুরুভার দণ্ডের সহিত ভগ্নাধারটি ভূগর্ভে প্রোথিত হইল। ইহার পর কয়েক দিবস চারি পার্শ্বের পর্বতশ্রেণী হইতে গভীর আর্তনাদ উবিত হইত। শুনিতে পাইতাম, কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যজাতির শোণিতে পর্বতের সানুদেশে রঞ্জিত হইতেছে, ভীষণ প্রতিহিংসার প্রাবল্যে শ্বেতকায় সৈনিকগণ কৃষ্ণকায় জাতির ধ্বংস-সাধন করিতেছে, বৃদ্ধ ও বালক, স্ত্রী ও পুরুষ দলে দলে নিহত হইতেছে, পর্বতের উপত্যকাগুলি ক্রমশঃ জনশূন্য হইতেছে। বায়ু আসিয়া ভগ্নাশিকের উড়াইয়া লইয়া গেল, ভগ্নসিঞ্চিত ভূমির উর্বরতা বন্ধিত হইল, অতি অল্পকালের মধ্যে উপত্যকা আবার স্নিগ্ধশ্যাম বনরাজিতে আবৃত হইল। ইহার পর আমরা আর সর্বদা মানুষের মুখ দেখিতে পাইতাম না, কৃষ্ণকায় মনুষ্যেরা অতি সাবধানে নৃগণ্য করিতে আসিত, অধিক-সংখ্যক কৃষ্ণকায় মনুষ্য আর কখনও দেখি নাই। কখন অরণ্যবাসী জটীশাশ্রুধারী পুরুষগণ সমিধ-পুষ্পাহরণের জন্য গভীর বনে আসিতেন, কখন বা প্রতিহিংসাপরবশ কৃষ্ণকায় অলক্ষ্যে শ্বেতকায় বনচারীর পশ্চাদ্গমন করিত। কিন্তু সে পর্বতের সানুদেশে বা উপত্যকায় বহুকাল পর্য্যন্ত মনুষ্যের বাস ছিল না।

শুনিয়াছি, ক্রমে শ্বেতকায় মনুষ্যে দেশ প্রাণিত হইয়া গেল, কৃষ্ণকায় মানব-জাতি ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল; যাহারা অবশিষ্ট রহিল, তাহারা অধীনতা স্বীকার করিয়া নবাগত জাতির অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল ও ক্রমে শ্বেত জনসঙ্গে মিশিয়া গেল। শ্বেতজাতি জনগণের চরম উৎকর্ষের অবস্থা দেখি নাই। আমি যখন পুনরায় মনুষ্যসমাজের সংসর্গে আনীত হইয়াছিলাম, তখন শ্বেতকায় জাতির অবনতি সূচিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, এই জাতির যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, এতদেশবাসী অপর কোন জাতিরই সেরূপ হয় নাই। তাহারা বৃহৎ কাষ্ঠের দ্বারা গৃহ নির্মাণ করিত, স্ত্রীকৃত অস্ত্রের দ্বারা হস্ত্যাবলী চিত্রশোভিত করিত; ক্রমে কাষ্ঠের পরিবর্তে পর্বতগাত্রে ছেদন করিয়া গৃহ-নির্মাণের জন্য পাখাণ লইয়া যাইত, অস্ত্রসাহায্যে তাহার মলিনত্ব দূর করিয়া তাহার ঔজ্জ্বল্য সাধন করিত। তাহারা কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে জলরাশি উত্তীর্ণ হইত, বৃহদাকার কাষ্ঠখণ্ডের নিম্নে বর্তুলাকার কাষ্ঠখণ্ড সংলগ্ন করিয়া গো, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতি বনবাসী জীবসমূহকে ভারবহনে নিযুক্ত করিত। যে ব্যক্তি বর্তুলাকার কাষ্ঠ-খণ্ডের পরিবর্তে রথে চক্র যোজন করিয়াছিল তাহার নাম অদ্যাপি তোমরা করিয়া

থাক। ক্রমে সূর্য্যের প্রখর উজ্জ্বলে ও কৃষ্ণকায় জাতির সহিত মিশ্রণে তাহাদের বর্ণের পরিবর্তন হইতে লাগিল। যখন মনুষ্য-সমাজে নীত হইলাম তখন দেখিলাম, নবাগত জাতির বর্ণের বৈষম্য ঘটিয়াছে, আচার-ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, বনেরও লাঘব হইয়াছে।

বহুকাল পরে পার্শ্বদেশে দারুণ ক্রেশ অনুভব করিলাম। শুনিয়াছি, পাষণ যে ক্রেশ অনুভব করে তাহা তোমরা এখন স্বীকার কর। দেখিলাম, মলিনবেশধারী অনেক মনুষ্য আমার পার্শ্ব লৌহকীলক প্রোথিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেক চেষ্টার পর, অনেকগুলি কীলক ভগ্ন হইবার পর একটি কীলকের কিয়দংশ আমার পার্শ্ব প্রবেশ করিল। আমার যন্ত্রণা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা নাই, রোধ করিবার ক্ষমতা নাই, সমস্ত ঘটনা স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু তথাপি বলিতে পারি, একরূপ অসহ্য যন্ত্রণা কখনও ভোগ করি নাই; একরূপ অসহনীয় যন্ত্রণা সমুদ্রগর্ভে বাসকালে মুচ্ছার প্রারম্ভেও বোধ হয় অনুভব করি নাই; পরবর্তী জীবনে একবার মাত্র ভোগ করিতে হইয়াছিল। ক্রমে সংবাদ আসিল যে, পর্ব্বতের নানাস্থানে মনুষ্যগণ কীলক প্রোথিত করিবার চেষ্টা করিতেছে; দারুণ যন্ত্রণায় সকলেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। একটি, দুইটি, তিনটি, ক্রমে দশটি কীলক সমরোথায় প্রোথিত হইল। আমাদের আক্রমণকারী লৌহদণ্ডধারী আরও কয়েকজন মনুষ্যকে আহ্বান করিয়া আনিল। কীলকমূলে লৌহদণ্ড-প্রয়োগে ও মনুষ্যবর্গের সমবেত চেষ্টায় আমরা সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া গেলাম। আমাদেরকে অপসারিত করিয়া আততায়ীরা পুনরায় কীলক প্রোথিত করিতে লাগিল। ক্রমে পর্ব্বতের সানুদেশে সমস্ত স্থান হইতেই এই নিষ্ঠুর বিদারণের শব্দ আসিতে লাগিল; আমরা জানিতে পারিলাম যে, উপত্যকার সর্ব্বস্থানেই পাষণের উপর অত্যাচার হইতেছে। এইরূপে সন্ধ্যাগমের পূর্বেই পর্ব্বতসানুর আকার অন্যরূপ হইয়া গেল। অন্ধকারের আগমনের সহিত চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল, বনভূমি বহুকাল পরে মনুষ্য কর্তৃক প্রজ্বলিত অগ্নিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

পরে জানিয়াছিলাম, স্তূপনির্মাণের জন্য নগর হইতে সহস্রাধিক ব্যক্তি পাষণ ছেদন করিতে পর্ব্বতের নিকটে আসিয়াছিল। তাহারা সমস্ত দিন পাষণ ছেদন করিয়া পর্ব্বতের সানুদেশে রাত্রি যাপন করিত। সূর্য্যোদয়

হইতে সন্ধ্যার সমাগম পর্য্যন্ত পাষাণ-ছেদনের শব্দ ও সেই শব্দের প্রতিধ্বনিতে শৈলশ্রেণী কম্পিত হইত। স্থাপদসঙ্কুল বনাবৃত সানুদেশ জীবশূন্য হইয়া উঠিল। মানবগণ মাসব্যয় পর্বতপার্শ্ব হইতে শিলাছেদনে ব্যাপ্ত ছিল। শিলাছেদন শেষ হইলে নগর হইতে শত শত গো-যান আসিয়া উপস্থিত হইল; গো-যানের যাতায়াতের জন্য উপত্যকা হইতে নিম্ন-ভূমি পর্য্যন্ত পথ প্রশস্ত করা হইয়াছিল। দলে দলে বৃহৎকায় হস্তিগণ পর্বতনিম্নে আনীত হইল ও দিনের পর দিন হস্তিগণ বৃহৎ পাষাণখণ্ডসমূহ শুণ্ডে উঠাইয়া গো-যানে স্থাপন করিতে লাগিল।

দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বের হীনবল মানবজাতি কিরূপে এই গুরুভার পাষাণরাশি পর্বতশ্রেণী হইতে বহু দূরবর্তী নগরের সান্নিধ্যে লইয়া গিয়াছিল, বাস্পীয় যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত গুরুভার পাষাণ কিরূপে ভূমি হইতে উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া তোমরা বিস্মিত হও, কিন্তু আমি তখন আশ্চর্য্যজনক বিশেষ কিছুই দেখি নাই। আমি কিসে বিস্ময় বোধ করি শুনিবে? আমার বিস্ময় বোধ হইয়াছিল গো-শকট দেখিয়া, গো-শকটের চক্র দেখিয়া, চক্রের প্রবর্তন দেখিয়া। আমি ভাবিয়াছিলাম, কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্ষুদ্র চক্র গুরুভার পাষাণের ভার বহন করিতে সমর্থ হইবে না; ভারবহনেও যদি সমর্থ হয়, শকট চলিতে সমর্থ হইবে না, নিশ্চয়ই কোন না কোন বিপদ ঘটবে। কিন্তু সামান্য চেষ্টাতেই শকট চলিল, চক্র আবর্তিত হইতে লাগিল, ক্রমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পথ অতিবাহিত হইতে লাগিল। সেরূপ গো-শকট তোমরা এখন আর ব্যবহার কর না, দুই একজন মাত্র তাহার পাষাণে খোদিত চিত্র দেখিয়া থাকিবে। তাহা বর্তমান কালে প্রচলিত গো-শকটের ন্যায় নহে। বর্তমানের গো-শকট দ্বিচক্র, কিন্তু সেগুলি চারি বা ততোধিক চক্রের উপরে স্থাপিত হইত। রথচক্র কোন স্থানে ভূমিতে প্রবেশ করিলে বা পথের কোন স্থান কর্দমান্ত থাকিলে হস্তিবৃন্দ আসিয়া সাহায্য করিত, শুণ্ডে রথচক্র মুক্ত করিত, কখন বা ভারবাহী গোসমূহকে সাহায্য করিত। এইরূপে গো-শকটে সহস্রাধিক শিলাখণ্ড নূতন পথ ধরিয়া শতাধিক যোজন পথ আনীত হইল; শিলাবাহী শকটসমূহ যেদিন নগরের প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিল, সে দিন নগরে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। দলে দলে নগরবাসিগণ আসিয়া আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনেকে

এরূপ দীর্ঘকায় প্রস্তর পূর্বের কখনও দেখে নাই ; তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। ক্রমে শকটশ্রেণী নগর-প্রাকার অতিক্রম করিয়া নগরে প্রবেশ করিল এবং পথ রোধ করিয়া ফেলিল। মুষ্টিমেয় রাজপুরুষের চেষ্টায় পথ মুক্ত হইল না ; তখন অতি বৃদ্ধ, লোলচর্চ, মুণ্ডিতর্ণীষ কাষায়বস্ত্রপরিহিত একজন মনুষ্য আসিয়া ভগবান্ বুদ্ধের নাম উচ্চারণ করিয়া পথ মুক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। বুদ্ধের ও রাজপুরুষগণের চেষ্টায় পথ মুক্ত হইল। শকটসমূহ নগর অতিক্রম করিয়া পুনরায় নগর-প্রাকারের বাহিরে এক প্রান্তরে আসিয়া সমবেত হইল।

এই সময়ে দেখিলাম মনুষ্যজাতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে ; অনেক উন্নতি হইয়াছে, অনেক বিষয়ে অবনতিও হইয়াছে। নূতন নাম, নূতন আচার-ব্যবহার, নূতন অস্ত্র ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী আসিয়া আমার পূর্ব-পরিচিত শ্বেতকায় জাতিতে অনেক পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। বুদ্ধ, স্ববির, ভিক্ষু, গম্ভ, গম্ভারাম, চীবর, কাষায় প্রভৃতি কথা পূর্বের কখনও শুনি নাই। মনুষ্যজাতির আবাসস্থল নগরসমূহ সুদৃশ্য গগনস্পর্শী আবাসভবনে পরিপূর্ণ হইয়াছে ; রাজ-পথসমূহ প্রস্তরচচ্ছাদিত হইয়াছে ; বিশাল নগরে জলাভাব দূর করিবার জন্য কৃত্রিম নদীসমূহ খনিত হইয়াছে ; হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতি জীবগণ নরজাতির বশীভূত হইয়া তাহাদিগকে বহন করিতেছে ; উষ্ট্র ও অশ্ব-বাহিত শকটের শব্দে শ্রুতিরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে ; নগরমধ্যে জলপথে বিচিত্র তরণীসমূহ ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতেছে ; আমি এরূপ নগর পূর্বের কখন দেখি নাই। ক্রমে হস্তিযুথের সাহায্যে শকট হইতে প্রস্তরসমূহ ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইল। সমুদায় প্রস্তর নামাইতে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। শকটের পশ্চাতে যে বিশাল জনসম্মেলন প্রান্তরে আসিয়াছিল, তাহারা একে একে নগরে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল।

ক্রমে বিশাল প্রান্তর জনশূন্য হইয়া গেল। পূর্বের নগর ও নাগরিক কখনও দেখি নাই। সেদিন সহস্র সহস্র নাগরিকের কথোপকথন কর্ণগোচর হইয়াছিল ; তাহার কতক বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কতক পারি নাই। তবে এইমাত্র নিশ্চয় জানিয়াছিলাম যে, মানবজাতির ভাষার অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। পূর্বের কৃষ্ণকায় বনবাসী মানবজাতির মুখে যে ভাষার প্রয়োগ শুনিয়াছিলাম, সে ভাষার অবিমিশ্র

প্রয়োগ আর শুনি নাই। পূর্বের নবাগত শ্বেতকায় জাতির মুখে যে ভাষা শুনিলাম, সে ভাষাও আর শুনি নাই। এখন নাগরিকগণকে যে ভাষা ব্যবহার করিতে শুনিলাম, তাহা প্রাচীন শ্বেতকায় জাতির ভাষার ন্যায়, কিন্তু সেরূপ পুরুষ নহে, অপেক্ষাকৃত কোমল ও সূক্ষ্ম।

বহুকাল পরে মনুষ্যজাতি দেখিলাম। আমি বৃদ্ধ—অতি বৃদ্ধ; আমার বয়সের পরিমাণ করিবার যদি আমার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে, আমার বয়স শুনিয়া তোমরা বিস্মিত হইতে। বৃদ্ধগণ সাধারণতঃ প্রগল্ভ হইয়া থাকে; নগরবাসী মনুষ্যজাতিকে কি প্রকার দেখিলাম তাহা বলিতেছি, তুমি চিন্তা সংযত কর, আমার প্রগল্ভতায় বিরক্ত হইও না। শকটবাহিত পাষণ দেখিতে নানাবিধ মনুষ্য আসিয়াছিল। যাহারা রাজপথে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ, বৃদ্ধ ও বালক, শ্বেত ও কৃষ্ণ, সর্ববিধ মনুষ্যই দেখিয়াছিলাম। যাহারা আমাদিগকে ছেদন করিতে পর্বতপার্শ্বে গমন করিয়াছিল, তাহারা শ্রমজীবী, কঠোর পরিশ্রমে পটু, পুরুষভাষী, বহুভাষী ও বহুভোজী। শকটে প্রস্তুত আসিতেছে শুনিয়া যাহারা নগরপ্রান্তে আমাদিগকে দেখিতে গিয়াছিল, তাহারা অধিকাংশই শ্রমজীবী, তবে তাহাদিগের মধ্যে দুই একজনকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহারা যেন অপর কোন জগতের মনুষ্য, তাহাদিগের সুদীর্ঘ বপু ও কোমল মুখকান্তি দেখিয়া মনে হইয়াছিল, যেন তাহারা কঠোর শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত নহে। তাহারা সুদৃশ্য বহুমূল্য পরিচ্ছদ ব্যবহার করে; তাহারা যে স্থান দিয়া চলিয়া যায়, সে স্থান সুগন্ধে পূর্ণ হইয়া উঠে; তাহাদিগের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ অথচ যেন আলস্যজড়িত। পরে জানিয়াছিলাম, তাহারা বিনাসপ্রিয় নাগরিক। নগর-প্রাকার অতিক্রমকালে আর এক শ্রেণীর মনুষ্য দেখিয়াছিলাম; তাহারা দীর্ঘকায়, সুদর্শন, কোমল অথচ কঠোর; তাহারা পরিচ্ছদের উপর লোহবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, কোমল হস্তে শাণিত লৌহ ধারণ করিয়াছিল, তাহাদিগের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও বলদীপ্ত। পরে জানিয়াছিলাম, তাহারা যুদ্ধব্যবসায়ী। পূর্বের যে শ্বেতকায় জাতি দেখিয়াছিলাম, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা যুদ্ধ করিত, তাহারাই দেবসেবা করিত, তাহারাই হলকর্ষণ করিত; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে বিনাসিতা ছিল না। বর্তমানকালে এ কথা তোমাদিগের নিকট শ্রুতিকঠোর হইবে। সহস্র সহস্র বর্ষকাল ব্যাপিয়া তোমরা জাতিভেদে—জাতি অনুসারে

কর্ণভেদে—অভ্যন্ত, স্তূতরাং এ কথা তোমরা হয় ত বিশ্বাস করিবে না। তোমাদিগের নিকটে তোমাদিগের প্রাচীন প্রথার অবশেষ যাহা কিছু আছে, তাহা হইতে তোমরা জানিয়া আসিতেছ যে, জাতিভেদ বহুকালের। কিন্তু আমি জাতিভেদ অপেক্ষা প্রাচীন, আমি মনুষ্যজাতি অপেক্ষা প্রাচীন, আমি সর্বজীব অপেক্ষা প্রাচীন,—আমার কথা বিশ্বাস করিও।

নগর কাহাকে বলে তাহা সেই দিন দেখিলাম। দেখিলাম তাহা মনুষ্যের অরণ্যবিশেষ। যতদিন পর্বতের পদপ্রান্তে পড়িয়া ছিলাম ততদিন দেখিয়াছি, জীব দেখিলে জীব হয় তাহার নিকট আসিয়া মিলিত হয়, নহে ত দূরে পলায়ন করে, হয় আলাপে প্রবৃত্ত হয়, নহে ত পরস্পরের প্রাণহরণের চেষ্টা করে। এত অল্পপরিসর স্থানের মধ্যে এত অধিক জীব পরস্পর বিবাদ না করিয়া, হিংসা না করিয়া কিরূপে বাস করে, তাহা আমার নিকট অতীব বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু শুনিয়াছি, বিবাদ ও হিংসার প্রকারভেদ হইয়াছে; যে স্থানে জীবের অস্তিত্ব আছে, বিবাদ ও হিংসা এখনও সে স্থানে বিদ্যমান আছে। যখন নগর-প্রাকার অতিক্রম করিয়া নগরমধ্যে গমন করিতেছিলাম, তখন দেখিতেছিলাম, জনস্রোত নানাপথ হইতে আসিয়া একত্র মিলিত হইতেছে। পরস্পর অভিভাষণ না করিয়া, এমন কি পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাতও না করিয়া যে যাহার গন্তব্যপথে চলিয়া যাইতেছে। প্রথম দিন নগর দেখিয়া ইহা আমার নিকট একান্ত বিস্ময়কর বোধ হইয়াছিল। রাজপথের উভয় পার্শ্বে সুসজ্জিত বিপণীশ্রেণী, অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা, বিপুল পণ্যের সমাবেশ প্রথম দেখিয়া বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম। বিপণীর উপরে গবাক্ষপথে শকটশ্রেণী-দশ নলোলুপা অবগুষ্ঠনশূন্য্য অন্তঃপুরিকাগণকেও দেখিয়াছিলাম। ইহার পূর্বে কখনও এত অধিক স্ত্রীলোকের একত্র সমাবেশ দেখি নাই। সে দিন কত অলঙ্কার, কত বস্ত্র, কত বেশবৈচিত্র্য দেখিয়াছি তাহা আর কি বলিব। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যজাতির প্রথম নগর দেখিয়া যেরূপ আনন্দ হইয়াছিল, সেরূপ আনন্দ আর কখনও উপভোগ করিব কি না সন্দেহ।

ভারতবর্ষ

এস্. ওয়াজেদ আলি

[এস্. ওয়াজেদ আলি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর হুগলী জেলায় তাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আলিগড় হইতে বি.এ. পরীক্ষা পাশ করিয়া যুরোপে গমন করেন এবং কেন্দ্রি জ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া বি.এ. অনার্স পরীক্ষা পাশ করেন। পরে ইনি ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র সমূহে ইনি নিয়মিতভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া লাহিত্য-সেবা করিয়া আসিতেছেন। ইহার গল্প-পুস্তক ‘গুন্দস্তা,’ ‘মাস্তকের দরবার,’ ‘দরবেশের দোয়া’ প্রভৃতি সমাদর লাভ করিয়াছে।]

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্ব একবার আমি কলকাতায় এসেছিলাম। তখন আমার বয়স দশ-এগার বৎসর হবে। আমাদের বাসার নিকটে ছিল একটি মুদিখানা। তার পাশ দিয়ে আমাদের যাওয়া-আসা করতে হতো। সেই মুদিখানায় একটি বৃদ্ধ গদীতে বসে’ বিপুলকায় একটি বই নিয়ে সাপ-খেলানো সুরে কি পড়তো। বৃদ্ধের মাথায় ছিল মস্ত এক টাক, চার পাশে তার ধপধপে শাদা চুল। নাকের উপর মস্ত এক চাঁদির চশমা। গভীর শ্রুৎশ্রুশ্রু মুখ। বেশ বিস্ত্র লোকের মত চেহারা। একটি মাঝারি বয়সের লোক এক এক বার বৃদ্ধের কাছে এসে বসে’ পাঠ শুনতো, আবার বৃদ্ধের এলে গিয়ে তাদের দেখা-শুনা করতো। আমারই বয়সী একটি ছেলে, খালি গায়ে বুড়োর কাছে সর্ব্বদা বসে’ থাকতো। আর তার পাশে থাকতো দু’টি মেয়ে। বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তারা সেই পাঠ শুনতো। তাদের মুখের ভাব দেখে’ মনে হতো, বিষয়টি তারা বিশেষ-ভাবেই উপভোগ করছে।

বুড়ো কি পড়ছে জানবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হলো। বাসা থেকে বেরিয়ে মুদিখানার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমি শুনতে লাগলাম। রামচন্দ্র কি করে’ কপিসেনার সাহায্যে সমুদ্রের উপর সেতু বেঁধে’ লঙ্কাদ্বীপে পৌঁছেছিলেন, তাই ছিল পাঠের বিষয়। সেই অপূর্ব্ব ক্রিয়াকাণ্ডের কথা শুনে’ ছেলেদের মুখ আনন্দ, আগ্রহ, আর উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। আমি যখন সেই

বণ না শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতুম, তখন কেউ না কেউ এসে' আমায় ডেকে নিয়ে যেতো। সেতু বাঁধা হচ্ছিল, তাই আমি জেনেছিলাম। রামচন্দ্র সেতু পার হয়েছিলেন কি না, আর পার হয়েই বা কি করেছিলেন, তা তখন জানতে পারিনি।

দু'চার দিন পরে আমি দেশে ফিরে' গেলুম। তারপর কোথা থেকে যে কোথা গেলুম, তার ঠিকানা নেই। পরিবর্তনের কত শ্রোত আমার জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেল। সেই বৃদ্ধ আর তার সন্তান-সন্ততির নিরীহ শান্ত জীবনের ছবিটি মনের কোন গুপ্ত কোণে হারিয়ে গেল। তাদের অস্তিত্বের কথা আমি ভুলে' গেলুম। এমন কত শত জিনিষ রোজ আমরা ভুলে' যাচ্ছি।

এই সেদিন দৈবক্রমে বেড়াতে বেড়াতে আবার সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ঘর-বাড়ী সব বদলে গিয়েছে। আগে যেখানে ঘর ছিল, এখন সেখানে বড় বড় ম্যানশন (mansions) মাথা তুলে' দাঁড়িয়েছে। আগে দু'চারটে রিকশা আর ঘোড়ার গাড়ীই সে পথ দিয়ে যেতো ; এখন বড় বড় মোটর অনবরত যাওয়া-আসা করছে। আগে মিট মিট করে' গ্যাসের বাতি জ্বলতো ; এখন ইলেকট্রিক আলো স্থানটিকে দিনের মত উজ্জ্বল করে' রেখেছে। আমি কালের অবশ্যতাবী পরিবর্তনের কথা ভাবছি, এমন সময়ে হঠাৎ আমার চোখ পড়লো সেই পুরানো মুদিখানাটির উপর। সেখানে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। জিনিষপত্র ঠিক আগের মত সাজানো রয়েছে। চাল থেকে এখনও কেরোসিনের একটি বাতি ঝুলছে। বোধ হয় পঁচিশ বছর আগের সেই বাতিটি।

আমি কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেলুম ভিতরকার দৃশ্য দেখে'। পঁচিশ বছর আগে যে বৃদ্ধকে দেখেছিলাম, ঠিক তারই মত একটি বৃদ্ধ, গদীর উপর বসে', মোটা একটি বই নিয়ে সাপ-খেলায়ো সুরে কি পড়ছিল। পঁচিশ বছর আগে সেই মধ্যবয়স্ক লোকের মতই একটি মধ্যবয়স্ক লোক এক এক বার এসে সেই পাঠ শুনছিল আর আবশ্যিক-মত খদ্দেরদের দেখা-শুনা করছিল। ঠিক সেই আগের ছেনোটের মত একটি ছেলে, খালি গায়ে বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে বসেছিল। তার পাশে বসেছিল—সেই আগেকার মেয়েদের মত দেখতে, দু'টি মেয়ে।

কোন মায়ামন্ত্র-বলে সেই স্বপ্নের অতীত আবার ফিরে' এলো নাকি ?

আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম।—বৃদ্ধ পড়ছিল রামচন্দ্রের সেই সেতু-বন্ধনের কথা—পঁচিশ বছর আগে যা শুনেছিলুম।

আমি আর থাকতে পারলুম না ; সোজা বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বললুম, “মশায়, মাপ করবেন। ঠিক পঁচিশ বছর পূর্বে আমি এই ছেলেদের সামনে আপনাকে এই বই পড়তে দেখেছি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এরা কি আর বাড়েনি, আর আপনার মধ্যেও কি কোন পরিবর্তন হয়নি? রামচন্দ্র কি এখনও সেই সেতু-বন্ধনের কাজে ব্যস্ত আছেন?”

বৃদ্ধ তার চোখ দু'টি তুলে আমার দিকে একবার চাইলে। নাকের উপর থেকে চশমা খুলে' ধুতির খুঁট দিয়ে গ্লাস দু'টিকে ভাল করে' পুঁছে আবার সেটিকে নাকের উপর চড়ালে। ধীর গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক এক বার ভাল করে' দেখে' নিলে; তারপর বিগ্নয়ের স্বরে বললে, “পঁচিশ বছর আগে আপনি এখান দিয়ে গিয়েছিলেন?” আমি বললুম, “আজ্ঞে হাঁ।” বৃদ্ধ বললে, “তা হ'লে আপনি আমার স্বর্গীয় পিতা মহাশয়কে এই রামায়ণ পড়তে দেখেছেন। আমার ছেলে-মেয়েরা তাঁর কাছে বসে' পাঠ শুনতো। ছেলেটি এখন ঐ বড় হয়েছে। ওর বয়স আপনার মতই হবে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। ভগবানের ইচ্ছায় তারা স্বামিপত্র নিয়ে ঘরকন্না করছে। এই ছেলেটি হচ্ছে আমার নাতি, আর এই মেয়ে দু'টি আমার নাতনী,—আমার ঐ ছেলের সন্তান।” বৃদ্ধের হাতের বইটির দিকে ইঙ্গিত করে' বললুম, “এ বইটি কবেকার?” গ্লিত আস্যে বৃদ্ধ বললে, “এ হচ্ছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ। আমার ঠাকুরদাদা বটতলায় এটি কিনেছিলেন। সে অনেক দিনের কথা; আমার তখন জন্ম হয়নি।”—বৃদ্ধকে অভিবাদন করে' দোকান ত্যাগ করলুম। মনে হলো, আমি দিব্য-চক্ষ পেয়েছি। প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুঁত একটা ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে' উঠলো।—সেই tradition সমানে চলেছে, তার কোথাও পরিবর্তন ঘটেনি।

সুন্দরবনে

শেখ হবিবর রহমান

[শেখ হবিবর রহমান যশোহর জিলার একটি পল্লীগামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনেই ইহার কয়েকখানি কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইনি মহাকবি শেখ সাদীর পুণ্ডিত ও লিঙ্গা ও বুদ্ধা নামক কারগী গুপ্তায়ের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং কবিতা, কাব্য-গুপ্ত, ছোট-গল্প, উপন্যাস, ইতিহাস, জীবনী, সমণ-কাহিনী, শিশুপাঠ্য-গুপ্ত প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন।]

রাত্রিটা আমাদিগকে বাধ্য হইয়া এই স্থানেই কাটাইতে হইবে। একপ ভয়ঙ্কর স্থান নাকি সমগ্র সুন্দরবনে আর নাই। উত্তর-পূর্ব দিকে ভীষণ বন, নিরতিশয় নিবিড়। ইহার যে-কোন স্থানে অনায়াসে ব্যাঘ্র লুকাইয়া থাকিতে পারে। পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠের মধ্যে মধ্যে কাশবন। স্থানে স্থানে চিবি; স্থানে স্থানে গর্ভ। এই সমস্ত কাশবনে ও গর্ভে ব্যাঘ্র থাকিতে অত্যন্ত ভালবাসে। শুনিলাম ইহারা সৌখিন বাবুদের মত অবসর-সময়ে এই মাঠে আসিয়া হাওয়া খায়, খেলা করে। স্থানটি খেলার উপযুক্তই বটে। সবুজ দুর্বাদলে আবৃত বিস্তীর্ণ সমতলভূমি বনের পাশ দিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিরাজমান। দুর্বাদল জমাট বাঁধিয়া গালিচার মত পুরু ও কোমল হইয়া আছে। পা রাখিলে দিবা আরাম অনুভব হয়।

আজ আর কেহই ডিক্রিতে শুইতে সাহসী হইল না। দশটি প্রাণী আমরা এই পান্থীর মধ্যে সমস্ত দরজা-জানালা অর্গলবদ্ধ করিয়া শঙ্কার সহিত রাত্রি কাটাইলাম। বাহিরে নোকার ছাদে হারিকেন বেশ জোরে ঝলিতে লাগিল—সাধারণের বিশ্বাস যে, আলোর নিকটে বাঘ আসিতে ভয় পায়। বন্দুকটি সুসজ্জিত ছিল। সমস্ত দিন অনাহারজনিত অবসন্নদেহে আমরা সন্ধ্যার সময়েই শুইয়াছিলাম। ব্যাঘ্র-সম্বন্ধে নানা চিন্তায় মন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়াও বাঘের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। কি এক বিভীষিকায় যেন আমাদের সমগ্র নোকা ছাইয়া রহিল। শুনিলাম, যে স্থানে আমাদের নোকাখানি অবস্থিত ছিল, সেই স্থান দিয়া ব্যাঘ্রগণ দুর্বার চাট্টির মাঠে গমনাগমন করে। বাঘের

ভয়ে মন আড়ষ্ট—চারিদিক্ নিখুম, নীরব। কচিৎ দুই-একটি হরিণ অরণ্যের মধ্যে চীৎকার করিতেছিল।

আমি কখন ধুমাইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না। অদ্যকার রাত্রি যেন আর পোহাইতে চাহে না। রাত্রিতে কয়েকবার নিদ্রাভঙ্গ হইল। অবশেষে রজনী-প্রভাতে সকলে গাত্রোখান করিলাম। হিসাব করিয়া দেখা গেল, আমরা সকলেই শরীরে বর্তমান আছি; রাত্রিতে কেহই ব্যাথকবলিত হই নাই। তবে আমাদের একজন কার্যবশে রাত্রিতে নৌকার বাহিরে গিয়া বসিয়াছিল; আর একটু হইলেই তাহাকে কাজী সাহেবের হাতে গুলী খাইতে হইত। শিকারী-নৌকার নিয়ম, রাত্রিতে বাহিরে যাইতে হইলে শিকারীদিগকে জানাইয়া যাইতে হয়; নতুবা বাহিরে কিছু দেখিলেই সন্দেহবশে তাহাকে গুলি করা বিচিত্র নহে। এখানে শিকারীগণ অতি সাবধানে সর্বদা বন্দুকে টোটা পুরিয়া অবস্থিতি করেন।

প্রাতে ভ্রমণের জন্য আমরা বাহির হইলাম। আমাদের শিকারীযুগল তখন শিকারে গিয়াছিলেন। নৌকার দরজায় তালাচাবি বন্ধ করিয়া রাখা হইল। এই বিজন বনভূমিতে দস্যুতন্ত্রের কোন ভয় ছিল না, কিন্তু বাদরেরা নৌকার মধ্যে অনধিকার-প্রবেশ করিয়া কোনরূপ বাদরামী না করে, সেই জন্যই আমাদের এই সাবধানতা। সমুদ্রে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ইহাই “দুর্ব্বার চটির মাঠ”। তাহারই মধ্য দিয়া আমরা চলিলাম। স্থানে স্থানে হরিণ চলিবার সঙ্কীর্ণ পথ। হরিণগণ মানুষের মত সর্বদা একই পথে গমনাগমন করে। এই পথকে “প’ট” বলে। প’টগুলি গ্রাম্য হাটুরিয়া রাস্তার মত আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—দেখিতে বড়ই সুন্দর। প্রথমেই আমরা ফুলঝুরির বাওড়ে প্রবেশ করিলাম। ইহা অধিক বড় নহে, একটি মধ্যমাকার দীর্ঘিকার ন্যায়। জল শুকাইয়া গিয়াছে—মধ্যে ছোট ছোট গর্ত, তাহাতে অল্প অল্প জল আছে। জলের নাম জীবন কেন, তাহা এই সামান্য নগণ্য জলাশয়ের চারিদিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে। এই সুদূর সুন্দরবনে সমুদ্রোপকূলে এই জলটুকু সহস্র সহস্র লোকের জীবনরক্ষার কারণস্বরূপ হইয়া আছে। এ অঞ্চলে সুপেয় পানীয় জল পাইবার আর উপায় নাই। এদিকের সমুদ্রযাত্রী ও জঙ্গলের যাবতীয় লোক এই স্থান হইতে জল গ্রহণ করে। ইহার জল এত কম যে, অধিক দিন

অনাবৃষ্টি হইলে বা অধিক পরিমাণে গৃহীত হইলে হয়ত ইহা শুকাইয়া যাইতে পারে ; তাহা হইলে সহস্র সহস্র লোকের জীবন বিপন্ন হইবার আশঙ্কা। বাওড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি তালবৃক্ষ। এ অঞ্চলে আর কোথায়ও তাল বা ঐ জাতীয় বৃক্ষ নাই। সমুদ্রকূলে দুর্ব্বার চটির মাঠের পার্শ্বে ফুলঝুরির বাওড়ের দক্ষিণ তীরে এই তালবৃক্ষটি চতুঃপার্শ্বে বহুদূর হইতে দৃষ্ট হয়, যেন সে যুগ যুগ কাল এক পায়ে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই নির্জন নিস্তব্ধ প্রান্তরে যোগনিমগ্ন সাধকের ন্যায় কি এক মহাধ্যানে নিরত আছে, আর ইন্দ্রিতে তৃষ্ণার্ত শ্রমক্লান্ত নানব-সাধারণকে এই সুখের সলিলপূর্ণ জলাশয়ের সন্ধান বলিয়া দিতেছে।

আমরা ফুলঝুরির বাওড় বামদিকে রাখিয়া কাশবনের মধ্য দিয়া দক্ষিণদিকে অগ্ন অগ্ন অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রতিমুহূর্ত্তে বাঘের ভয়। হয়ত এই শীতের প্রভাতে শ্রীমান্ এই প্রান্তরের কোথাও শুইয়া দিবা আরামে রৌদ্রসেবন করিতেছেন—এই সুখপ্রভাতে তাহার আরামের বিঘ্ন করা তিনি কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না। আমাদের সঙ্গে এখন বন্দুক নাই,—কাহারও হাতে দা, কাহারও হাতে লাঠি ; আমি একটি ছাতা লইয়া এই অভিযানের সহগামী। কাজী সাহেব আমাদের সেনাপতি। বর্ণিত তালগাছটির পার্শ্বে গেলেই দিগন্তবিস্তৃত বঙ্গোপসাগর আমাদের নয়নসমক্ষে ভাসিয়া উঠিল। তখন আমাদের পদনিম্নে বালুকাতুমি ; তাহার মধ্যে চরণযুগল ডুবিয়া যাইতেছিল। মরুভূমি কখনও দেখি নাই ; কিন্তু ইহা তাহারই একটি ক্ষুদ্র নমুনা বলিয়া মনে হইল। কোথায়ও বা উচ্চ উচ্চ বালুকার চিবি ; কোথায়ও বা গর্ত্ত ; বালুকাসমুদ্র এইভাবে যেন চেউ খেলিতে খেলিতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

আমরা ধীরে ধীরে সমুদ্রের সনীপবর্তী হইলাম। তখন জোয়ার আসিতেছিল। জোয়ারের সময়ে বিনা বাতাসেই সমুদ্রে তুফান উঠে। তুফানের সঙ্গে সঙ্গে জল লাফাইয়া লাফাইয়া উপরে উঠিতে থাকে। এই তুফানের প্রকৃতি স্বতন্ত্র, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জলরাশি প্রবল উচ্ছ্বাসের সহিত গর্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, প্রতি ছয় সেকেণ্ড অন্তর এক-একটি করিয়া তরঙ্গ প্রধাবিত হইয়া বেলাভূমিতে আছাড় খাইয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। দেখিয়া মনে হইল, যেন প্রকৃতির একদল প্রবল সৈন্য বিশ্ব জয় করিবার জন্য সমর-উৎসাহে মাতোয়ারা হইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে মার মার

১) শব্দে অগ্রসর হইতেছে। ইহার সম্মুখে পড়িলে বৃষ্টি পাষণ-প্রাচীরও চূর্ণ হইয়া যায়। এই জোয়ারের তরঙ্গ একটি দেখিবার জিনিষ, উপভোগের সামগ্রী। দূরদূরান্তর হইতে ইহার গর্জন শুনিতে পাওয়া যায়। বায়ুপ্রবাহ না থাকা সত্ত্বেও আমরা নৌকা হইতে এই গর্জন শুনিতে পাইয়াছিলাম। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া পড়িতেছিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ের মধ্যেও এক আবেগ-তরঙ্গ খেলিতেছিল। দক্ষিণে অনন্ত সমুদ্র প্রশান্তভাবে দিগন্ত-বিস্তৃত; মধ্যে দুই-একটি পাখী উড়িতেছিল। চারিদিক কি গন্তীর ভাবোদ্দীপক।

আমরা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সমুদ্রের তীর দিয়া ভ্রমণ করিতেছিলাম, আর জোয়ারের জল কি ভাবে ক্রমশঃ উপরে উঠিয়া আসিতেছিল, তাহা লক্ষ্য করিতেছিলাম। দূরদূরান্তর হইতে কত কি জিনিষ সমুদ্রতীরে আসিয়া লাগিয়াছে। দেখিলাম, বাঙ্গালার বিষম উৎপাত কচুরিপানা তীরে লাগিয়া শুকাইয়া আছে। হতভাগাদের কোন প্রতাপ এখানে খাটে নাই। বোধ হয় নোনা জল খাইয়া তাহারা হজম করিতে পারে নাই, তাই অকালে “কচুরি-লীলা” শেষ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

বিকালে আমরা আবার সমুদ্রতীর-ভ্রমণে বাহির হইলাম। সকলেরই হাতে এক একখানি লাঠি বা দা। বাঘ আসিলে ইহা লইয়াই যুদ্ধ করিতে হইবে। যথাপূর্ব্ব কাছী সাহেব আমাদের দলের সেনাপতি। দেখিলাম, একদল লোক ফুলঝুরির বাওড় হইতে জল লইয়া নৌকা বোঝাই করিয়া সমুদ্রপথে মাণিকদা'র দিকে চলিয়া গেল। এই বিশাল বারিনিধি তাহার আশ্রিত মানবগণকে একবিন্দু পানীয় জল দিতেও অক্ষম। নৌকাখানি ধীরে ধীরে দূরসমুদ্রে মিশিয়া গেল। আমরা তখন সম্মুখের অনন্ত শোভা দেখিতেছিলাম; কিন্তু মন ছিল পিছনের দিকে। কি জানি, কখন শাদ্দুলরাজ ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়েন।

ওদিকে পশ্চিম গগন রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। আকাশ নির্মল; একখণ্ড সামান্য মেঘও কোন স্থানে দৃষ্ট হইতেছে না। দেখিতে দেখিতে কনক-তপন অস্তাচল-সমীপবর্তী হইল। আর একটু পরেই সূর্যাস্ত। এ সুবর্ণ স্রোযোগ কিছুতেই ত্যাগ করিতে সম্মত হইলাম না।

আমরা সকলে বড় বড় লাঠি হস্তে সূর্যাস্ত দেখিবার জন্য সেই সমুদ্রতীরে

পশ্চিমাভিমুখী হইয়া উর্দ্ধনেত্রে দণ্ডায়মান ; কেহ কেহ পিছন ফিরিয়া, সতর্ক প্রহরীর ন্যায়, বাধ আসে কিনা তাহা দেখিতেছিলেন। মুখে যাহাই বলি না কেন, জীবনের মমতা আমাদের কাহারও কম ছিল না ; বিশেষতঃ জীবিত অবস্থায় বাধ তাহার বড় বড় দাঁত দিয়া এই তাজা শরীরটাকে কামড়াইয়া কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া খাইবে, ইহা করনা করাও অগহ্য। সুতরাং আমরাও এক-একবার বাঘ-মহারাজের শুভাগমন-সম্ভাবনায় ভয়-কণ্টকিত হইতেছিলাম। এমন দোটাণা অবস্থায় প্রণাস্তভাবে সৌন্দর্য্যের উপভোগ সম্ভবপর নহে। সত্য কথা বলিতে কি, তখন বাঘের করুনাই আমাদের মনে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ছিল। চন্দ্রে যেমন গ্রহণ লাগে, ঠিক সেইভাবে সহসা সূর্য্যের নিম্নপার্শ্ব যেন সাগরজলে আবৃত হইয়া গেল। তারপর ধীরে ধীরে উহা নিম্নে সলিলের অন্তরালে একটু একটু করিয়া অদৃশ্য হইতে লাগিল। সেই কনক-প্রতিমা কে যেন নির্দয়ভাবে অতল সাগরে ডুবাইয়া দিয়া জগতের সমস্ত পদাথের নশ্বরতা নীরবকণ্ঠে বিশ্বের কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঘোষণা করিতে লাগিল। আমি তখন স্থির-ধীরভাবে পৃথিবীর স্থলভাগের এক প্রান্তসীমায়—সেই বঙ্গোপসাগরের তীরের একটি উচ্চ স্থানে—দণ্ডায়মান। পশ্চাতে মুক্ত প্রান্তর ও বহুদূর-প্রসারিত সুন্দরবন ; সম্মুখে অনন্ত সাগর। আকাশের সুদূর পশ্চিম প্রান্তে যেন দিগন্তবিস্তৃত আগুনের খেলা। হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া মুক্ত-বিশ্বের এই সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত ভরিয়া আলিঙ্গন করিলাম। এই বিশাল সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির এই অনন্ত মাধুর্য্য প্রাণের কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া লইলাম। যে অনন্ত সম্পৎ, যে অতুলনীয় বৈভব আজ এখানে এই মুহূর্ত্তে লাভ করিলাম, জগতে তাহার তুলনা নাই—চিরদিন তাহা আমার হৃদয় সঞ্চারিত রাখিবে, মন নূতন নূতন মাধুরীতে পূর্ণ করিয়া রাখিবে।

অপুর পাঠশালা

বহুভূতভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাস ঘনোহর জেলার অন্তর্গত বারাকপুর গ্রামে। ১৩০৬ সালে (১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে) কাঁচড়াপাড়ার নিকটে মুরাতিপুর গ্রামে ষাভুলালয়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বি.এ. পাশ করিয়া ইনি প্রথমে ভাগলপুরে কোন জমিদারীর ম্যানেজার হন, তাহার পর হইতে ইনি শিক্ষকতায় নিযুক্ত আছেন। 'পথের পাচালী,' 'অপরাজিত,' 'আরণ্যক,' 'আদর্শ হিন্দু হোটেল,' 'দৃষ্টিপ্রদীপ,' 'মেঘমল্লার' প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইনি বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন।]

পৌষ মাসের দিন। অপু সকালে লেপ মুড়ি দিয়া রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়া ছিল, মা আসিয়া ডাকিল—“অপু, ওঠো শিগ্গির ক’রে, আজ তুমি যে পাঠশালায় পড়তে যাবে। কেমন সব বই আনা হবে তোমার জন্যে, শেলেট্। হ্যাঁ ওঠো, মুখ ধুয়ে নাও, উনি তোমায় সঙ্গে নিয়ে পাঠশালায় দিয়ে আসবেন।”

পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু সদ্যোনিদ্রোষিত চোখ দুটি তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ধারণা ছিল যে, যাহারা দুষ্ট ছেলে, মায়ের কথা শোনে না, ভাইবোনদের সঙ্গে মারামারি করে, তাহাদেরই শুধু পাঠশালায় পাঠানো হইয়া থাকে। কিন্তু সে তো কোনোদিন ওরূপ করে না, তবে সে কেন পাঠশালায় যাইবে?

খানিক পরে সর্বজয়া পুনরায় আসিয়া বলিল—“ওঠো, অপু, মুখ ধুয়ে নাও, তোমায় অনেক ক’রে মুড়ি বেঁধে দেবো এখন, পাঠশালায় ব’সে ব’সে খেও এখন, ওঠো লক্ষ্মী মাণিক।” মায়ের কথার উত্তরে সে অবিশ্বাসের সুরে বলিল—“ইঃ।” পরে সে মায়ের দিকে চাহিয়া জ্বিত বাহির করিয়া চোখ বুজিয়া এক প্রকার মুখভঙ্গী করিয়া রহিল, উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না।

কিন্তু অবশেষে বাবা আসিয়া পড়াতে অপর বেশী জারিজুরি খাটিল না, যাইতে হইল। মায়ের প্রতি অভিমানে তাহার চোখে জল আসিতেছিল, ধাবার বাঁধিয়া দিবার সময়ে বলিল—“আমি কখনো আর বাড়ী আস্চিনে দেখো।”

“ঘাট ঘাট, বাড়ী আস্বিনে কি। ওকথা বলতে নেই, ছিঃ”—পরে তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইয়া সর্ব্বজ্ঞয়া বলিল—“খুব বিদ্যা হোক, ভাল ক’রে লেখাপড়া শিখো, কোনো ভয় নেই; ওগো, তুমি গুরুমশায়কে ব’লে দিও যেন ওকে কিছু বলে না।”

পাঠশালার পেঁচাইয়া দিয়া হরিহর বলিল—“ছুটি হবার সময়ে আমি আবার এসে তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাবো অপু, ব’সে ব’সে লেখো, গুরুমশায়ের কথা শুনো, দুষ্টুমি ক’রো না যেন।” খানিকটা পরে পিছন ফিরিয়া অপু চাহিয়া দেখিল, বাবা ক্রমে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অকুল সমুদ্র। সে অনেকক্ষণ মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। পরে ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, গুরুমহাশয় দোকানের মাচার বসিয়া দাঁড়িতে নৈকব লবণ ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন, কয়েকটি বড় বড় ছেলে আপন আপন চাটাইএ বসিয়া নানারূপ কু-স্বর করিয়া কি পড়িতেছে ও ভয়ানক দুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোট ছেলে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া আপন মনে পাততাড়ির তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে। আর একটি বড় ছেলে, তাহার গালে একটা বড় আঁচিল, সে দোকানের মাচার নীচে চাহিয়া কি লক্ষ্য করিতেছে। তাহার সামনে দুজন ছেলে বসিয়া শ্লেটে একটা ঘর আঁকিয়া কি করিতেছিল। একজন চুপিচুপি বলিতেছিল, “আমি এই চ্যারা দিলাম”—অন্য ছেলোটী বলিতেছিল, “এই আমার গোলা”—সঙ্গে সঙ্গে তার শ্লেটে আঁক পড়িতেছিল এবং সে মাঝে মাঝে আড়চোখে বিক্রয়-রত গুরুমহাশয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। অপু নিজের শ্লেটে বড় বড় করিয়া বানান লিখিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে, ঠিক জানা যায় না, গুরুমহাশয় হঠাৎ বলিলেন—“এই ফণে, শেলেটে ওসব কি হচ্ছে রে?” সম্মুখের এই ছেলেদুটি অমানি শ্লেটখানা চাপা দিয়া ফেলিল; কিন্তু গুরুমহাশয়ের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানো বড় শক্ত, তিনি বলিলেন—“এই সতে, ফণের শেলেটটা নিয়ে আয় তো।” তাহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে বড় আঁচিলওয়ালা ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেটখানা উঠাইয়া লইয়া গিয়া দোকানের মাচার উপর হাজির করিল।

“হুঁ, এসব কি খেলা হচ্ছে শেলেটে?—সতে, ধ’রে নিয়ে আয় তো দুজনকে! কান ধ’রে নিয়ে আয়।”

যে ভাবে বড় ছেনেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেট লইয়া গেল, এবং যে ভাবে বিষণ্ণমুখে লামনের ছেনেদুটি পায়ে পায়ে গুরুমহাশয়ের কাছে যাইতেছিল, তাহাতে হঠাৎ অপুর বড় হাসি পাইল, সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া সে আবার ফিক্‌ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গুরুমহাশয় বলিলেন—“হাসে কে? হাস্‌চো কেন খোকা, এটা কি নাট্যশালা? অঁা, এটা নাট্যশালা নাকি?”

নাট্যশালা কি অপু তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

“সতে, একখানা খান ইট নিয়ে আর তো তেঁতুনতলা থেকে, বেশ বড় দেখে।”

অপু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার গলা পর্য্যন্ত কাঠ হইয়া গেল, কিন্তু ইট আনীত হইলে সে দেখিল, ইটের ব্যবস্থা তাহার জন্য নহে, ঐ ছেনেদুটির জন্য। বয়স্‌ অন্ন বলিয়াই হউক বা নতুন ভিত্তি ছাত্র বলিয়াই হউক, গুরুমহাশয় সে যাত্রা তাহাকে রেহাই দিলেন।

পাঠশালা বসিত বৈকালে। সবশুদ্ধ আট দশটি ছেনেমেয়ে পড়িতে আসে। সকলেই বাড়ী হইতে ছোট ছোট মাদুর আনিয়া পাতিয়া বসে, অপূর মাদুর নাই, সে বাড়ী হইতে একখানা জীর্ণ কার্পেটের আসন আনে। যে ঘরটার পাঠশালা হয়, তার কোনো দিকে বেড়া বা দেওয়াল কিছুই নাই, চারি ধার খোলা, ঘরের মধ্যে সারি দিয়া ছাত্রগণ বসে। পাঠশালা-ঘরের চারিপাশে বন, পিছন দিকে গুরুমহাশয়ের পৈতৃক আমলের বাগান। অপরাহ্নের তাজা, গরম রৌদ্র বাতাবী-লেবু, গাব ও পেয়ারাতলী আম গাছটার ফাঁক দিয়া পাঠশালা-ঘরের বাঁশের ধুঁটির পায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। নিকটে অন্য কোনোদিকে কোনো বাড়ী নাই, শুধু বন ও বাগান, একধারে একটা সরু পথ।

আট দশটা ছেনেমেয়ের মধ্যে সকলেই বেজায় দুলিয়া ও নানারূপ সুর করিয়া পড়া মুখস্থ করে; মাঝে মাঝে গুরুমহাশয়ের গলা শুনা যায়—“এই ক্যাব্লা, ওর শেনেটের দিকে চেয়ে কি দেখ্‌চিস্? কান মলে ছিড়ে দেবো একেবারে। নুটু, তোর কবার নেতি ভিজুতে হবে? ফের যদি দেখি নেতি ভিজুতে উঠেচিস্—”

গুরুমহাশয় একটা ঝুঁটি হেলান দিয়া একখানা তালপাতার চাটাইএর উপর বসিয়া থাকেন। মাথার তেলে বাঁশের ঝুঁটির হেলান-দেওয়া অংশটা পাকিয়া গিয়াছে। বিকাল বেলা প্রায়ই গ্রামের দীনু পালিত কি রাজু রায় তাঁহার সহিত গল্প করিতে আসেন। পড়াশুনার চেয়ে এই গল্প শোনা অপূর অনেক বেশী ভাল লাগিত। রাজু রায় মহাশয় প্রথম যৌবনে বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস স্মরণ করিয়া কি করিয়া আঘাড়ুর হাটে তামাকের দোকান খুলিয়াছিলেন সে গল্প করিতেন। অপু অবাক হইয়া শুনিত। বেশ কেমন নিজের ছোট্ট দোকানের ঝাঁপটা তুলিয়া বসিয়া দা দিয়া তামাক কাটা, তারপর রাত্রে নদীতে যাওয়া, ছোট্ট হাঁড়িতে মাছের ঝোল ভাত রাঁধিয়া খাওয়া, হয় মাঝে মাঝে তাদের সেই ছেঁড়া মহাভারতখানা, কি বাবার সেই দাশুরায়ের পাঁচালীখানা মাটির প্রদীপের সামনে খুলিয়া বসিয়া বসিয়া পড়া। বাহিরে অন্ধকার বর্ষারাত্রে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে, কেহ কোথাও নাই, পিছনের ডোবায় ব্যাঙ ডাকিতেছে—কি সুন্দর!—বড় হইলে সে তামাকের দোকান করিবে।

এই গল্প-গুজব এক এক দিন আবার ভাব ও কল্পনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠিত—গ্রামের ও-পাড়ার রাজকৃষ্ণ সান্যাল মহাশয় যে দিন আসিতেন। যে কোনো গল্প হউক, যত সামান্যই হউক না কেন, সেটি সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল অসাধারণ। সান্যাল মহাশয় দেশভ্রমণ-বাতিকগ্রস্ত ছিলেন। কোথায় দ্বারকা, কোথায় সাবিত্রী পাহাড়, কোথায় চন্দ্রনাথ—তাহা আবার একা দেখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না, প্রতিবারেই স্ত্রীপুত্র লইয়া যাইতেন এবং খরচপত্র করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া ফিরিতেন।

একটা মোটা লাঠি হাতে তিনি লম্বা পা ফেলিয়া পাঠশালায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন—“এই প্রসন্ন, কি রকম আছে? বেশ জাল পেতে বসেচো যে। কটা মাছি পড়লো?” নাম্তা মুখস্থ-রত অপু অমনি অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সান্যাল মহাশয় যেখানে তালপাতার চাটাই টানিয়া বসিয়াছেন, সেদিকে হাতখানেক জমি উৎসাহে আগাইয়া বসিত। শ্লেট, বই মুড়িয়া একপাশে রাখিয়া দিত—যেন আজ ছুটি হইয়া গিয়াছে, আর পড়াশুনার দরকার নাই; সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাগর ও উৎসুক চোখদুটি গল্পের প্রত্যেকটি কথা যেন দুভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহে গিলিত।

কুঠির মাঠের পথে যে জায়গাটাকে এখন ‘নালতাকুড়ির জোল’ বলে, ঐখানে আগে—অনেক কাল আগে—গ্রামের মতি হাজুরার ভাই চন্দ্র হাজুরা বনের গাছ কাটিতে গিয়াছিল। বর্ষাকাল—এখানে ওখানে বৃষ্টির জলের তোড়ে মাটি ধসিয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ চন্দ্র হাজুরা দেখিল এক জায়গায় যেন একটা পিতলের হাঁড়ির কাণামত মাটির মধ্য হইতে একটুখানি বাহির হইয়া আছে। তখনই সে খুড়িয়া তাহা বাহির করিল। বাড়ী আনিয়া দেখে এক হাঁড়ি সেকেলে আমলের টাকা। তাই পাইয়া চন্দ্র হাজুরা দিনকত বাবুগিরি করিয়া বেড়াইল।—এসব সানু্যাল মহাশয়ের নিজের চোখে দেখা।

এক একদিন রেলভ্রমণের গল্প উঠিত। কোথায় সাবিত্রী পাহাড় আছে, তাহাতে উঠিতে তাঁহার স্ত্রীর কি রকম কষ্ট হইয়াছিল। গয়ায় পিও দিতে গিয়া পাণ্ডার সঙ্গে হাতাহাতি হইবার উপক্রম। কোথাকার এক জায়গায় একটা খুব ভাল খাবার পাওয়া যায়, সানু্যাল মহাশয় নাম বলিলেন—পঁাড়া। নামটা শুনিয়া অপূর ভারী হাসি পাইয়াছিল।—বড় হইলে সে “পঁাড়া” কিনিয়া খাইবে।

কোন্ দেশে সানু্যাল মহাশয় একজন ফকিরকে দেখিয়াছিলেন, সে এক অশথ-তলায় থাকিত। এক ছিলিম গাঁজা পাইলে সে খুসি হইয়া বলিত—“আচ্ছা কোন্ ফল তোমরা খাইতে চাও, বল।” পরে ঈপ্সিত ফলের নাম করিলে সে সম্মুখের যে কোনো একটা গাছ দেখাইয়া বলিত—“যাও ওখানে গিয়া লইয়া আইস।” লোকে গিয়া দেখিত, হয়ত আম গাছে বেদানা ফলিয়া আছে, কিংবা পেয়ারা গাছে কলার কাঁদি ঝুলিয়া আছে।

রাজু রায় বলিতেন—“ও সব মস্তর তস্তরের খেলা আর কি। সে বার আমার এক মামা—”

দানু পালিত কথা চাপা দিয়া বলিতেন—“মস্তরের কথা যখন ওঠালে, তখন একটা গল্প বলি শোনো। গল্প নয়, আমার স্বচক্ষে দেখা। বেলেডাঙ্গার বুধো গাড়োয়ানকে তোমরা দেখেচো কেউ? রাজু না দেখে থাকো রাজকৃষ্ণ ভায়া তো খুব দেখেচো। কাঠের দড়ি বাঁধা এক ধরণের খড়ম পায়ে দিয়ে বুড়ো বরাবর নিতে কামারের দোকানে লাঙ্গলের ফাল পোড়াতে আসতো।

একশ বছর বয়সে মারা যায়, মারাও গিয়েছে আজ পঁচিশ বছরের ওপর। জ্যোয়ান বয়সেও আমরা তার সঙ্গে হাতের কজির জোরে পেরে উঠতাম না। একবার—অনেক কালের কথা—আমার তখন সবে হয়েছে উনিশ কুড়ি বয়েস, চাকদা' থেকে গঙ্গাচান ক'রে গরুর গাড়ী ক'রে ফিরছি। বুধো গাড়োয়ানের গাড়ী—গাড়ীতে আমি, আমার খুড়ীমা, আর অনন্ত মুখোর ভাইপো রাম। কানসোনার মাঠের কাছে প্রায় বেলা গেল, তখন ওসব দিকে কি রকম ভয়ভীত ছিন তা রাজকৃষ্ণ ভায়া জানো নিশ্চয়। একে মাঠের রাস্তা, সঙ্গে মেয়েমানুষের দল, কিছু টাকাকড়িও আছে—বড্ড ভাবনা হোল। আজকাল যেখানে নতুন গাঁ খানা বসেচে—ওই বরাবর এসে হোল কি জানো? জন চারেক ঘণ্ডামার্ক-গোছের মিশ্র কানো লোক এসে গাড়ীর পেছন দিকের বাঁশ দুদিক থেকে ধরে। এদিকে জুন, ওদিকে দুজন। দেখে তো মশাই আমাদের মুখে আর রা-টা নেই। কোনো রকমে গাড়ীর মধ্যে ব'সে আছি, এদিকে তারাও গাড়ীর বাঁশ ধ'রে সঙ্গেই আস্চে, সঙ্গেই আস্চে, সঙ্গেই আগ্চে। বুধো গাড়োয়ান দেখি পিটু পিটু ক'রে পেছন দিকে চাইচে। ইসারা ক'রে আমাদের কথা বলতে বারণ ক'রে দিলে। এদিকে গাড়ী একেবারে নবাবগঞ্জ থানার কাছাকাছি এসে প'ড়ল। বাজার দেখা যাচ্ছে, তখন সেই লোক ক'জন বলে—‘ওস্তাদজী, আমাদের ঘাট হয়েছে, আমরা বুঝতে পারিনি, ছেড়ে দাও।’ বুধো গাড়োয়ান বলে—‘সে হবে না ব্যাটারা। আজ সব থানায় নিয়ে গিয়ে বাঁধিয়ে দোব।’ অনেক কাকুতি-মিনতির পর বুধো বলে—‘আচ্ছা যা ছেড়ে দিলাম এবার, কিন্তু কখনো এরকম আর করিস্নি।’ তবে তারা বুধো গাড়োয়ানের পায়ের ধলো নিয়ে চ'লে গেল। আমার স্বচক্ষে দেখা। ওই যে ওরা বাঁশ এসে ধরেচে, মস্তরের চোটে অমনি ধরেই র'য়েচে—আর ছাড়াবার সাধ্য নেই—চলেচে গাড়ীর সঙ্গে। একেবারে পেরেক আঁটা হ'য়ে গিয়েচে। তা বুঝলে বাপু? মস্তর তস্তরের কথা—”

গর বলিতে বলিতে বেলা যাইত। পাঠশালার চারিপাশের বনজঙ্গলে অপরাহ্নের রাঙা রৌদ্র বাঁকা ভাবে আসিয়া পড়িত। কাঁটাল গাছের, জগ্গা-ডুমুর গাছের ডালে ঝোলা গুলফলতার গায়ে টনটুনি পাখী মুখ উঁচু করিয়া বসিয়া দোল খাইত। পাঠশালা-ঘরে বনের লতাপাতার গন্ধের সঙ্গে লতাপাতার চাটাই,

ছেঁড়াখোঁড়া বই-দপ্তর, পাঠশালার মাটির নেজে ও কড়া দা-কাটা তামাকের ধোঁয়া, সবশুদ্ধ মিলিয়া এক আটল গন্ধের সৃষ্টি করিত।

সে গ্রামের ছায়াভরা মাটির পথে একটি মুগ্ধ গ্রাম্যবালকের ছবি আছে। বই-দপ্তর বগলে লইয়া সে তাহার দিদির পিছনে পিছনে সাজিমাটি দিয়া কাচা, সেলাই করা কাপড় পরিয়া পাঠশালা হইতে ফিরিতেছে, তাহার ছোট মাথাটির অমন রেশমের মত নরম, চিক্কণ, সুখ-স্পর্শ চুলগুলি তাহার মা যত্ন করিয়া আঁচড়াইয়া দিয়াছে—তাহার ডাগর ডাগর সুন্দর চোখদুটিতে কেনন যেন অবাক ধরণের চাহনি, যেন তাহারা এ কোন্ অদ্ভুত জগতে নতুন চোখ মেলিয়া চাহিয়া চাহিয়া দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে। গাছপালার ঘেরা এইটুকুই কেবল তার পরিচিত দেশ—এখানেই মা রোজ হাতে করিয়া ধাওয়ায়, চুল আঁচড়াইয়া দেয়, দিদি কাপড় পরাইয়া দেয়; এই গণ্ডীটুকু ছাড়াইলেই তাহার চারিধার ঘিরিয়া অপরিচয়ের অকূল জলধি। তাহার শিশু-মন থৈ পায় না।

একদিন পাঠশালায় এমন একটি ঘটনা হইয়াছিল, যাহা তাহার জীবনের একটি নতুন অভিজ্ঞতা।

সেদিন বৈকালে পাঠশালায় অন্য কেহ উপস্থিত না থাকায় কোন গল্প-গুজব হইল না, পড়াশুনা হইতেছিল—সে পড়িতেছিল ‘শিশুবোধক’—এমন সময়ে গুরুমহাশয় বলিলেন—“দেখি, শেলেট নেও, শ্রুতিলিখন লেখো—”

মুখে মুখে বলিয়া গেলেও অপু বুঝিয়াছিল গুরুমহাশয় নিজের কথা বলিতেছেন না, মুখস্থ বলিতেছেন,—সে যেমন দাণ্ডারায়ের পাঁচালী ছড়া মুখস্থ বলে, তেমনি।

শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হইল অনেকগুলি অমন সুন্দর কথা একসঙ্গে পর পর সে কখনো শোনে নাই। ও সকল কথার অর্থ সে বুঝিতেছিল না, কিন্তু অজানা শব্দ ও ললিত পদের ধ্বনি, ঝঙ্কার জড়ানো এক অপরিচিত শব্দ-সজ্জীত, অনভ্যস্ত শিশু-কর্ণে অপূর্ব ঠেকিল এবং সব কথার অর্থ না বোঝার দরুণই কুহেলি-ঘেরা অস্পষ্ট শব্দ-সমষ্টির পিছন হইতে একটা অপূর্ব দেশের ছবি বার বার উঁকি মারিতেছিল।

বড় হইয়া স্কুলে পড়িবার সময়ে সে বাহির করিয়াছিল ছেনেবেলাকার এই মখস্থ শ্রুতিলিখন কোথায় আছে—

“এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রশ্রবণ গিরি। ইহার শিখরদেশ আকাশ-পথে সতত-সমীর-সঞ্চরমান জলধর-পটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত....অধিত্যকা প্রদেশ ঘন-সন্নিবিষ্ট বনপাদপ-সমূহে সমাচ্ছন্ন থাকিতে স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়....পাদদেশে প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া....।”

সে ঠিক বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না, কিন্তু সে জানে—তাহার মনে হয়, অনেক সময়েই মনে হয়। সেই যে সে বছর-দুই আগে কুঠির মাঠে সরস্বতী পূজার দিন নীলকণ্ঠ পাখী দেখিতে গিয়াছিল, সেদিন মাঠের ধার বাহিয়া একটা পথকে দূরে কোথায় যাইতে দেখিয়াছিল। পথটার দুধারে কত কি অচেনা পাখী, অচেনা গাছপালা, অচেনা বনঝোপ। সে জানিত পথটা গিয়াছে রামায়ণ-মহাভারতের দেশে।

শ্রুতিলিখন শুনিতে শুনিতে সেই দুই বছর আগে দেখা পথটার কথাই তাহার মনে হইয়া গেল।

ঐ পথের ওধারে অনেক দূরে কোথায় সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রশ্রবণ পর্বত। সেই স্বপ্নলোকের ছবি তাহাকে অবাক করিয়া দিল। কতদূরে সেই প্রশ্রবণ গিরির উন্নত শিখর?—সে বড় হইলে যাইয়া দেখিবে।

কিন্তু সে বেতসীকণ্টকিত তট, সে বিচিত্রপুলিনা গোদাবরী, সে শ্যামল জনস্থান, নীল মেঘমালায় ঘেরা সে অপূর্ব শৈলপ্রস্থ, রামায়ণে বর্ণিত কোনো দেশে ছিল না। কেবল অতীত দিনের কোনো পাখী-ডাকা গ্রাম্য সন্ধ্যায় এক ক্ষমতি গ্রাম্যবালকের অপরিণত শিশু-কল্পনার দেশে তাহারা ছিল বাস্তব, একেবারে ঝাটি, অতি সুপরিচিত।

—

সাদ্যাহা

মাতৃস্নেহ

যাদবেন্দ্র

যাদবেন্দ্র জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বীরভূম জেলার শিউড়ীর নিকটবর্তী হরিশপুর গ্রামে ইহার বাস ছিল। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে ঝাংসল্য রসের কবিতা রচনা করিয়া ইনি ব্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

“ আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
 পরাণের পরাণ নীলমণি ।
 নিকটে রাখিও ধেনু, পুরিও মোহন বেণু,
 ঘরে ব’সে আমি যেন শুনি ॥
 বলাই ধাইবে আগে, আর শিশু বামভাগে,
 শ্রীদাম স্মদাম সব পাছে
 তুমি তার মাঝে ধাইও, সঙ্গ-ছাড়া না হইও,
 মাঠে বড় রিপু’-ভয় আছে ॥
 ক্ষুধা পেলে চাঞা ধাইও, পথ পানে চাহি’ যাইও—
 অতিশয় তৃণাকুর পথে ।
 কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইও কানু,—
 হাত তুলি’ দেহ মোর মাথে ॥
 থাকিও তরুর ছায়, মিনতি করিছে মায়,
 রবি যেন না লাগয়ে গায় ।
 তুষা হ’লে চেয়ো বারি, বলাই ধরিবে ঝারি,
 না নামিও যেন যমুনায় ।
 যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও, বাধা পানই^১ হাতে থুইও,
 বুঝিয়া যোগাবে রাজ্য পায় ॥”

গুরুভক্তি

কাশীরাম দাস

[বর্তমান জেলার অন্তর্গত সিদ্ধি গ্রামে কাশীরাম দাস জন্মগৃহণ করেন। ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন; ইহাদের পদবী ছিল “দেব”। শুনা যায়, কথকের মুখে মূল মহাভারত শুনিয়া ইনি বাদালা পদ্যে মহাভারত রচনা করেন; কিন্তু এবিষয়ে মতবৈধ আছে। কাশীরাম সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। ইহার মহাভারত গত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে অপরিণীম শ্রদ্ধার সহিত পঠিত হইয়া আসিতেছে।]

অবন্তীনগরে দ্বিজ ছিল একজন ।
 তাঁর স্থানে শিষ্যগণ করে অধ্যয়ন ॥
 এক শিষ্যে দ্বিজ গাভী কৈল সমর্পণ ।
 গুরু-আজ্ঞা পেয়ে তারে করেন রক্ষণ ॥
 কতদিনে বলে গুরু, “কহ শিষ্যবর ।
 বড় পুষ্ট দেখি যে তোমার কলেবর ॥
 কিবা খাও, কোথা পাও, কহ সত্য বাণী ।”
 শুনিয়া বলেন শিষ্য করি’ ষোড়পাণি ॥
 “গাভীগণ-দোহনান্তে পিয়ে বৎসগণ ।
 পশ্চাতে খাই যে আমি করিয়া দোহন ॥”
 গুরু বলে, “এত দিনে সব জানা গেল ।
 এই হেতু বৎসগণ দুর্বল হইল ॥
 আর কতু তুমি না করিহ হেন কাজ ।
 গাভী দুহি’ খাও তুমি—নাহি ভয় লাজ ?”
 গুরু-আজ্ঞা শুনি দ্বিজ গেল গাভী লৈয়া ।
 কত দিনে পুনঃ বিপ্র কহিল ডাকিয়া ॥
 “উচিত কহিতে শিষ্য, না হইও রুষ্ট ।
 পুনশ্চ তোমারে বড় দেখি হুটপুট ॥

গাভী-দুগ্ধ পুনঃ বুঝি তুমি কর পান ?”
 শিষ্য বলে, “ গোসাশ্রি, করহ অবধান ॥
 যেই দিন হইতে তুমি করিলা বারণ ।
 ভিক্ষা করি' নিত্য করি উদর-পূরণ ॥”
 গুরু বলে, “ ভিক্ষা করি' পূরহ উদরে ।
 এবে ভিক্ষা করি' সব আনি দিও মোরে ॥”
 এত শুনি' গাভী ল'য়ে গেল দ্বিজবর ।
 পুনঃ দ্বিজাগিল কত দিবস-অন্তর ॥
 “ কহ শিষ্য, বড় পুষ্ট দেখি তব কায় ।
 কি খাইয়া আছ এবে কহিবা আনায় ?”
 শিষ্য বলে, “ গাভী রাখি অরণ্য-ভিতর ।
 রক্ষক রাখিয়া আমি যাই যে নগর ॥
 দিবসেতে যত ভিক্ষা দিই তব ঘরে ।
 সন্ধ্যাতে মাগিয়া ভিক্ষা ভরি যে উদরে ॥”
 হাসিয়া বলিল গুরু, “ এ কোন্ বিচার ?
 শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা রাত্রে তুমি কর আপনার ॥
 রাত্রি-দিবা যত পাও আনি' দিও মোরে ।”
 এত শুনি' গাভী ল'য়ে গেল বন ঘোরে ॥
 ক্ষুধায় আকুল তনু ভ্রমে বনে বন ।
 অর্কের কোমল পত্র করয়ে ভক্ষণ ॥
 বড়ই দুর্বল হৈল শীঘ্র হইল কায় ।
 দেখিতে না পায় তবু গোধন চরায় ॥
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখ দৈবের লিখন ।
 নিরুদক কূপ-মধ্যে পড়িল ব্রাহ্মণ ॥
 সমস্ত দিবস গেল হৈল সন্ধ্যাকাল ।
 গহেতে আইল যত গোধনের পাল ॥
 শিষ্যে না দেখিয়া গুরু দুঃখিত অন্তর ।
 অনুঘণে গেল দ্বিজ অরণ্য-ভিতর ॥

“কোথা গেলে উপমন্যু ?” ডাকে দ্বিজবর ।
 উপমন্যু বলে, “আমি কুপের ভিতর ॥”
 গুরু বলে, “কুপ-মধ্যে পড়িল কিমতে ?”
 উপমন্যু বলে, “চক্ষে না পাই দেখিতে ॥
 অর্কপত্র খাইয়া নয়ন অন্ধ হইল ।”
 শুনিয়া আচার্য্য তবে উপদেশ কৈল ॥
 “দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার দুইজন ।
 শীঘ্র কর দ্বিজবর তাঁদের স্মরণ ॥”
 এত শুনি দ্বিজ বহু শুবন করিল ।
 ততক্ষণে দুই চক্ষু নির্মল হইল ॥
 কপ হৈতে উঠিয়া ধরিল গুরুপদ ।
 সম্বলি হইয়া গুরু কৈল আশীর্ব্বাদ ॥
 “চারি বেদ যত শাস্ত্র জ্ঞানহ সকলে ।
 যাহ দ্বিজ নিজ গৃহে পরম কুশলে ॥”
 আত্মা পেয়ে গেল দ্বিজ আশ্লাদিত মনে ।
 সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান হৈল গুরুর বচনে ॥

কালকেতু

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

[মুকুন্দরাম ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান জেলার দামুন্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি বেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামের রাজা বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের শিক্ষক ও সভাকবি ছিলেন এবং রাজসম্মান-স্বরূপ ‘কবিকঙ্কণ’ উপাধি লাভ করেন । ইনি ‘চণ্ডী-মঙ্গল’ গ্রন্থ রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন ।]

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু ;
 জিনিয়া মাতঙ্গ-গতি, যেন নব রতি-পতি
 সবার লোচন-সুখ-হেতু ।

নাক মুখ চক্ষু কান, কুন্দে যেন নিরমাণ,
 দুই বাহ লোহার শাবল ;
 গুণশীল রূপ বাড়ি, যেন সে শালের কোঁড়া,
 জিনি' শ্যাম-চামর কুন্তল ।
 বিচিত্র কপাল-তটী, গলায় জালের কাঁঠি,
 কর-যুগে লোহার শিকলী ;
 ক শোভে বাঘ-নখে, অঙ্গে রাক্ষা ধুলি মাখে,
 তনু-মাঝে শোভিছে ত্রিবলী ।
 কপাট-বিশাল বুক, জিনি' ইন্দীবর মুখ,
 আকণ-দীঘল বিলোচন ;
 গতি জিনি' গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ,
 মোতি-পাঁতি জিনিয়া দশন ।
 দুই চক্ষু জিনি' নাটা,^১ ঘুরে যেন কুঁচ-ভাঁটা,^২
 কানে শোভে স্ফটিক-কুণ্ডল,
 পরিধান বীর-ধড়ি,^৩ মাথায় জালের দড়ি
 শিশু-মাঝে যেমন মণ্ডল ।
 লইয়া ফাউড়া^৪ ডেল। যার সঙ্গে করে খেলা,
 তার হয় জীবন-সংশয়,—
 যে জনে আঁকড়ি' ধরে পাড়য়ে ধরনী 'পরে ;
 ভয়ে কেহ নিকটে না রয় ।

১ নাটা—একপুকার রক্তাভ কৃষ্ণবর্ণ ফল, আকারে চোখের মত ।

২ কুঁচ-ভাঁটা—কুঁচ বা গুপ্তা ফলের মত লাল ও কাল রঙের ভাঁটা বা গোলা ।

৩ ধড়ি—ধটী, ছোট মাপের কাপড় ; বীর বা মালের মত মাল-কোঁচা করিয়া পরা ।

৪ ফাউড়া—ফাড়া (বা পাবড়া), ছোট লাঠি বা ডাণ্ডা ।

সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, তাড়িয়া শশাঙ্ক* ধরে,
দূরে গেলে ছুয়ায়* কুকুরে,
বিহঙ্গ বাঁটুলে বিদ্ধে, লতায় জড়িয়া বান্ধে,
কান্ধে তার বীর আইসে ঘরে ।

মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

[চম্বিশ-পরগণার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া গ্রামে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। সাত বৎসর বয়ঃক্রম কালেই ইনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন এবং যৌবনের প্রারম্ভেই সখের ও পেশাদারী কবির দলের গান রচনা করিয়া যশস্বী হন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'সংবাদ-প্রভাকর' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির করিতে আরম্ভ করেন। এই সংবাদপত্র বাতীত 'সংবাদ-রত্নমালা,' 'পাণ্ডুপীড়ন' এবং 'সাদুরঞ্জন' নামক আর তিনখানি সংবাদপত্র ইনি সম্পাদন করিয়াছিলেন। 'প্রবোধ-প্রভাকর' এবং 'হিত-প্রভাকর' নামক দুইখানি কবিতাপুস্তক ইনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া 'বোধেন্দুবিকাশ,' 'কলি-নাটক,' 'শকুন্তলা' প্রভৃতি কয়েকখানি নাটকও ইনি রচনা করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ৪৭ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়।]

জান না কি জীব তুমি, জননী জনম-ভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে ;
ধাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে ।
ভূমিতে করিয়া বাস, ঘূমেতে পূরাও আশ,
জাগিলে না দিবা-বিভাবরী,
কত কাল হরিয়াছে, এই ধরা ধরিয়াছে,
জননী-জঠর পরিহরি ।

[illegible]

স্বদেশের শাস্ত্রমতে, চল সত্য ধর্ম-পথে,
 স্মৃধে কর জ্ঞান-আলোচন,
 টুট কর মাতৃভাষা, পুরাও মায়ের অশা
 দেশে কর বিদ্যা-বিতরণ ।

মেঘনাদ ও বিভীষণ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৫এ জানুয়ারী মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন । ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন এবং অনতিকাল পরেই খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়া 'মাইকেল' নাম গ্রহণ করেন । ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করিয়া বিশপ্‌স কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন । ইহার চার বৎসর পরে ইনি মাদ্রাজে গমন করিয়া তথাকার নানা ইংরেজী সংবাদপত্রের লেখক ও সম্পাদকের কার্য্য করেন । অতঃপর ইনি মাদ্রাজে প্লেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন । ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন । মাদ্রাজে থাকিতেই ইনি 'ক্যাপ্‌টিভ নেভি' নামক ইংরেজী কাব্য লিখিয়া কবি-পুতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন । কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ইনি সংস্কৃত 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং তৎপরে 'শশিষ্ঠা' নাটক প্রণয়ন করেন । অনন্তর একনিষ্ঠভাবে মাতৃভাষার চর্চা আরম্ভ করিয়া ইনি 'তিলোত্তমা-গল্প কাব্য,' 'পদ্মাবতী নাটক,' 'বীরভদ্রনা কাব্য,' 'ব্রজভদ্রনা কাব্য,' 'কৃষ্ণকুমারী নাটক,' 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রভৃতি প্রণয়ন করেন । মধুসূদন বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক; 'ব্রজভদ্রনা কাব্য' ছাড়া ইহার প্রায় সমস্ত কাব্যই অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত । ইহার রচিত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' বঙ্গভাষায় বিলাতী সনেটের অনুকরণে লিখিত ।

ইউরোপে যাইয়া মধুসূদন ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবসায় আরম্ভ করেন । ইহার শেষজীবন দারিদ্র্য, ব্যাধি ও মানসিক অশান্তির ইতিহাস । ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ইহার মৃত্যু হয় । ইহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'মেঘনাদবধ কাব্য'ই সর্বশ্রেষ্ঠ । ইনি ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগপ্রবর্তক কবি ।]

“এতক্ষণে”—অরিন্দম কহিলা বিধাদে,—

“জানিনু, কেমনে আসি’ লক্ষ্যণ পশিল

রক্ষণপূরে । হায়, তাত, উচিত কি তব

এ কাজ ?—নিকষা সতী তোমার জননী ।—

সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ।—শূলীশমুনিভ
কুন্তকর্ণ ।—স্নাত-পুত্র বাসব-বিজয়ী ।
নিজগৃহ-পথ, তাত, দেখাও তঙ্করে ?—
চণ্ডালে বসিও আনি' রাজার আলয়ে ?
কিস্ত নাহি গন্তি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুলা । ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,—
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে ;—
লঙ্কার কলঙ্ক আছি ভঙ্কিব আহবে ।”

উত্তরিলে বিভীষণ,—“ বখা এ সাধনা,
ধীমান্ । রাঘব-দাস আমি ; কি প্রকারে
তঁাহার বিপক্ষ কাঙ্ক্ষ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ ?” উত্তরিলে কাতরে রাবণি,—
“ হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে ।
রাঘবের দাস তুমি ?—কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা' দাসেরে ।
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাপুর ললাটে ;
পড়ি' কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধুলায় ? হে রক্ষোবধি, ভুলিলে কেমনে—
কে তুমি ? জনম তব কোন মহাকূলে ?—
কে বা সে অধম রাম ? স্বচছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে ;
যায় কি সে কড়ু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবাল-দলের ধাম ?—মৃগেন্দ্র-কেশরী
কবে, হে বীর-কেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্র-ভাবে ? অস্ত্র দাস, বিজ্ঞতম তুমি ;
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে ।
ক্ষুদ্র-মতি নব, শূর, লক্ষ্যণ ; নহিলে
অস্ত্রহীন বোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে ?

কহ, মহারথি, এ কি মহারথি-প্রথা ?
 নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি' না হাসিবে
 এ কথা । ছাড়হ পথ ; আসিব ফিরিয়া
 এখনি । দেখিব আজি কোন্ দেব-বলে,
 বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি ।
 দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
 রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের । কি দেখি'
 ডরিবে এ দাস হেন দুর্বল মানবে ?
 নিকুণ্ডিলা-যজ্ঞাগারে প্রগল্ভে পশিল
 দম্ভী ; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি' নরাধমে ;
 তব জন্মাপুরে, তাত, পদার্পণ করে
 বনবাসী !—হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
 বমে দুরাচার দৈত্য । প্রফুল্ল-কমলে
 কীট-বাস !—কহ, তাত, সহিব কেমনে
 হেন অপমান আমি—ভ্রাতৃ-পুত্র তব ?—
 তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে ?”

মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
 মলিন-বদন লাজে, উত্তরিল। রথী
 রাবণ-অনুজ, লক্ষ্য' রাবণ-আয়ুজে,—
 “ নহি দোষী আমি, বৎস ; বৃথা ভৎস মোরে
 তুমি । নিজ কর্ত্ত-দোষে, হায়, মজাইলা
 এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি ।
 বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে
 পাপ-পূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি
 বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কাল-সলিলে ।
 রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
 তেঁই আমি । পর-দোষে কে চাহে মজিতে ?”

রুঘিলা বাগব-ত্রাস । গন্তীরে যেমতি
 নিশীথে অস্বরে মস্ত্রে জীমূতেন্দ্র, কোপি'
 কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—“ ধর্মপথগামী,
 হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
 তুমি ;—কোন্ ধর্ম-মতে, কহ দাসে, শুনি,
 জ্ঞাতিহ, ভ্রাতৃহ, জাতি,—এ সকলে দিলা
 জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
 পরজন, গুণহীন স্বজন,—তথাপি
 নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পবঃ সদা ।
 এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে ?
 কিন্তু বৃথা গস্ত্রি তোমা । হেন সহবাসে,
 হে পিতৃবা, বর্বরতা কেন না শিখিবে ?—
 গতি যা'র নীচ সহ, নীচ সে দুর্গতি !”

দেশপ্রেম

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

[রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার বাকুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ।
 ইহার পিতার নাম রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় । ইনি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ‘পদ্মিনী-উপাখ্যান,’
 ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ‘কর্কদেবী’ এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ‘শূরসুন্দরী’ নামে তিনখানি কাব্য প্রকাশ
 করেন । ইনি ‘কুমারসম্ভব’ কাব্যের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন । ইহার স্বদেশপ্ৰীতি
 ও বীরবীর পুণঃসা-মূলক রচনানিচয় এককালে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে সমাদৃত হইত ।]

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
 কে বাঁচিতে চায় ?—
 দাসত্ব-শৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে,
 কে পরিবে পায় ?

কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
 নরকের প্রায় ;
 দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
 স্বর্গ-সুখ তায় ।
 এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
 মানসে উদয়,
 নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,
 বিলম্ব কি সয় ।
 অই শুন, অই শুন, ভেরীর আওয়াজ হে,
 ভেরীর আওয়াজ,—
 সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,
 সাজ সাজ সাজ ।
 আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতানার হে,
 রাজপুতানার
 সর্বদা বহিয়া ঝরে রুধিরের ধার হে,
 রুধিরের ধার ।
 সাথ ক জীবন আর বাহুবল তার হে,
 বাহুবল তার,
 আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
 দেশের উদ্ধার ।

বাল্মীকির কবিত্বলাভ

বিহারীলাল চক্রবর্তী

[বিহারীলাল চক্রবর্তী ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার নিমতলা পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন ।
 বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্য অপূর্ব সুন্দর সুমিষ্ট গীতি-কবিতা । ইহা বঙ্গাব্দ ১২৮১
 শালে 'আর্য্যদর্শন' পত্রে প্রকাশিত হয় ; ইহাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা । ইহার পূর্বে বঙ্গাব্দ

ভাষায় এই শ্রেণীর কাব্য আর পুণীত হয় নাই। পরে 'বঙ্গসুন্দরী,' 'লাধের আসন,' 'বহু-বিয়োগ,' 'প্রেমপুর্বাধিনী,' 'নিগর্গ সুন্দরী,' 'মায়াদেবী' ও বহু গদ্যীত রচনা করিয়া, ইনি ৭৭ অর্জন করিয়া গিয়াছেন। বাক্সালা ১৩০১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে কবির বিহারীলাল দেহত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনায় ইহার পুতাব দেখিতে পাওয়া যায়।]

অধরে অরুণোদয়, তলে দুলে দুলে বয়
তমসা তটিনী-রাণী কুলকুল-স্বনে ;
নিরখি' লোচন-লোভা পুলিন-বিপিন-শোভা,
ব্রমেন বাল্মীকি মুনি ভাবভোলা মনে ।
শাখি-শাখে মন-সুখে ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চী মুখে মুখে
কতই আদর করে বসি' দু'জনায় ;
হানিল শবরে বাণ, নাশিল ক্রোঞ্চের প্রাণ,
রুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায় ।
ক্রৌঞ্চী, প্রিয় সহচরে ঘেরে' ঘেরে' শোক করে,
অরণ্য পুরিল তার কাতর ক্রন্দনে—
চক্ষে করি' দরশন, জড়িম-জড়িত-মন
করুণ-হৃদয় মুনি বিশ্বলের প্রায় ;
সহসা ললাট-ভাগে, জ্যোতির্গয়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজ্জলী যেন নীল নবধনে ।
কিরণ-মণ্ডলে বসি' জ্যোতির্গয়ী সুরূপসী,
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে
নামিলেন ধীর ধীর, দাঁড়ালেন হ'য়ে স্থির,
মৃগুনেত্রে বাল্মীকির মুখপানে চেয়ে ।
করুণ-ক্রন্দন-রোল, উত উত উতরোল,
চমকি' বিশ্বলা বালা চাহিলেন ফিরে ;
হেরিলেন রক্তমাখা মৃত ক্রৌঞ্চ ভগ্ন-পাখা,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ক্রৌঞ্চী উড়ে ঘিরে' ঘিরে' ।

একবার সে ক্রোড়ীরে আরবার বাল্মীকিরে
 নেহারেন ফিরে' ফিরে' যেন উন্মাদিনী ;
 কাতরা করুণাভরে গা'ন স করুণ স্বরে,
 ধীরে ধীরে বাজে করে বীণা বিঘাদিনী ।
 সে শৌর্ক-সঙ্গীত-কথা শুনে কাঁদে তরু-লতা,
 তমসা আকুল হ'য়ে কাঁদে উভরায় ;
 নিরবি' নন্দিনীচছবি গদগদ আদি কবি
 অন্তরে করুণা-সিদ্ধ উথলিয়া ধায় ।

পরশমণি

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[ছগলী খেলার গুলিটা গ্রামে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। ছাত্রাবস্থায় বহু কষ্ট করিয়া ইহাকে লেখাপড়া শিখিতে হইয়াছিল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন; ইহার পরে বি.এন্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি এক বৎসর মুনসেফের কার্য করেন। তৎপরে হাইকোর্টের উকীল হইয়া ইনি দীর্ঘকাল সরকারী উকীলের কার্য করেন। হেমচন্দ্রের পুতুত অর্থাগম হইত, কিন্তু ইনি সক্রমী লোক ছিলেন না; এ জন্য, বার্ষিক্যে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়াতে, ইনি দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত হন। তখন ইহাকে গভর্নমেন্টের সামান্য বৃত্তি ও সাধারণের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। পঠদশাতেই ইনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন; ঐ সময়ে ইহার 'চিন্তাতরঙ্গিনী' লিখিত হয়। তৎপরে 'ভারত-সঙ্গীত' পুতুতি কবিতা প্রকাশের পর ইহার যথ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই সময়ে ইহার 'কবিতাবলী,' 'ছায়াময়ী,' 'আশাকানন,' 'দশমহাবিদ্যা' পুতুতি কাব্য প্রকাশিত হয়। 'ত্রৈলোক্য' কাব্য ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।]

১

কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন ?

অই যে অবনীতলে,

পরশ-মাণিক অলে

বিধাতা-নির্মিত চারু মানব-নয়ন ।

পরশমণির সনে, লৌহ অঙ্গ-পরশনে
 সে লৌহ কাঞ্চন হয় প্রবাদ বচন,—
 এ মণি পরশে যায় মাণিক ঝলসে তার,
 বরিষে কিরণ-ধারা নিখিল ভুবন।
 কবির করিত নিধি, মানবে দিয়াছে বিধি,
 ইহারি পরশ-গুণে মানব-বদন
 দেবতুল্য রূপ ধরি' আছে ধরা আলো করি',—
 মাটির অঙ্গেতে মাখা সোনার কিরণ।

২

পরশ-মাণিক যদি অলীক হইত,
 কোথা বা এ শশধর, কোথা বা ভানুর কর,
 কোথা বা নক্ষত্র-শোভা গগনে ফুটিত ?
 কে রাখিত চিত্র ক'রে চাঁদের জ্যোৎস্না ধ'রে
 তরঙ্গে মেঘের অঙ্গে সুখেতে মাখায়ে ?
 কেবা এই সুশীতল বিনল গঙ্গার জল
 ভারত-ভূষণ করি রাখিত ছড়ায়ে ?
 কে দেখাত তরুকুল, নানা রঙ্গে নানা ফুল,
 মরাল হরিণ মৃগে পৃথিবী শোভিয়া ?
 ইন্দ্রধনু-আলো তুলে' সাজায়ে বিহঙ্গ-কুলে,
 কে রাখিত শিখিপুচ্ছে শশাঙ্ক আঁকিয়া ?

৩

দিয়াছে বিধাতা যাই এ পরশমণি,
 স্বর্গের উপমা-স্থল হয়েছে এ মহীতল,
 সুখের আকর তাই হয়েছে ধরণী।
 কি আছে ধরণী-অঙ্গে, নয়ন-মণির সঙ্গে
 না হয় মানব-চিত্তে আনন্দদায়িনী ?

নদী-জলে মীন খেলে, বিটপীতে পাতা হেলে,
 চরেতে বানুকা ফুটে, ভূগেতে হিমালী ।
 পক্ষি-পাখা উড়ে যায়, পিপীলি শ্রেণীতে ধায়,
 কঙ্করে তুষার পড়ে, ঝিনুকে চিকণী ।
 তাতেও আনন্দ হয়— অরণ্য কুঞ্জাটিময়,
 অনন্ত বিদ্যুৎলতা, তমিষা রজনী ।

৪

ইহাই পরশমণি পৃথিবী-ভিতরে ;
 ইহারি পরশ বলে সখায় সখার গলে
 পরায় প্রেমের হার প্রফুল্ল অন্তরে,
 শিখায়ে প্রেমের বেদ ষুচায় মনের ভেদ,
 প্রণয় আহ্নিক করে সুখের সাগরে ।
 ধন্য এই ধরাতল । প্রেম-ভোগবতী-জল
 পবিত্র করেছে যারে খুলিয়া নির্ঝরে,
 যুগল নক্ষত্র দুটি যে স্থানে বেড়ায় ছুটি',
 সখাকূপে মনসুখে পৃথিবী উপরে ।
 কোন্ পুণ্যে হেন নিধি মানবে পায় রে বিধি ।—
 গেল চ'লে চিরদিন এই আশা ধ'রে ।

৫

অপূর্ব মানিক এই পরশ-কাকন ।
 স্নেহ-রূপ কত ফুল ফুটায় মণি অতুল,
 ইহার পরশে ধরা আনন্দ-কানন—
 জননী বদন-ইন্দু, মরি, কি করুণা-সিদ্ধু ।
 দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন,
 শত শনি-রশ্মি মাখা, চারু ইন্দীবর আঁকা
 পুজের অধর-ওষ্ঠ নলিন-আনন ;

[illegible]

ଲକ୍ଷ୍ମଣ-ବର୍ଜନ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

[কলিকাতা বাগবাজারে বসুপাড়ায় ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্ম হয়। গৃহে অধ্যয়ন করিয়া ইনি ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ ব্যাপ্তি লাভ করেন। তরুণ বয়সে নগেন্দ্রনাথ বসুপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর প্রভৃতি বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া ইনি বাগবাজারে 'সম্ভার একাদশী']

নাটক অভিনয় করেন। ক্রমশঃ ইনি রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-কৌশলের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং “বঙ্গদেশের গ্যারিক” বলিয়া পরিচিত হন। ইঁহার রচিত প্রায় ৭০ খানি নাটক আছে ; তন্মধ্যে ‘বিলম্বজল,’ ‘পুষ্কর,’ ‘অশোক,’ ‘বুদ্ধদেব,’ ‘শঙ্করাচার্য্য,’ ‘পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস,’ ‘পাণ্ডবগৌরব,’ ‘চৈতন্যলীলা,’ ‘জ্ঞানা,’ ‘দক্ষযজ্ঞ,’ ‘কালাপাহাড়,’ ‘বলিদান,’ ‘শান্তি কি শান্তি,’ ‘চণ্ড,’ ‘পূর্ণচন্দ্র,’ ‘হারানিধি,’ ‘বিষাদ,’ ‘মুকুলমুগ্ধরা,’ ‘সিরাহুন্দোলা,’ ‘বীরকাসিম,’ ‘ছত্রপতি শিবাঙ্গী,’ ‘গৃহলক্ষ্মী,’ ‘ম্যাকবেথ’ প্রভৃতি নাটকে ইনি ইঁহার প্রতিভার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহার ফলে ইনি বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ; নাট্যজগতে ইঁহার প্রতিভা ও পুঁজির চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

রামচন্দ্র । ধরি' দেহ দুখ-সুখ সহিনু সকলি ।
 মেদ-অস্থি-নির্মিত এ কলেবর,
 রোগ-শোকাগার অন্য দেহ সম,
 মর্মে বাজে সম ব্যথা,
 কিন্তু প্রেমে জয় রিপু মম ;—
 তাপপূর্ণ দেহ সুখাগার প্রেমে ।
 শিখিলাম প্রেম-খেলা,
 প্রেমাকর জনক-জননী-কোলে ;
 বিতরিণু কণা মাত্র তা'র অনুজ্ঞে আমার,
 পাইলাম প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই—
 উৎসব-সঙ্কট-সাথী ।
 হে সুধীর,
 সেই প্রেমে তুমিও কিনিবে,
 অনুজ্ঞ লক্ষ্মণ তব ।
 বিলাইনু সে প্রেম সবারে,—
 গুরুজনে, ব্রাহ্মণ-চরণে,
 মিনতি শিখিনু ।
 পরদুঃখে শিখিলাম দুখ,
 তেঁই নহিনু বিমুখ তপোবনে,
 গঞ্জিল বিমানে যবে তাড়কা ভীষণা ।

বুঝিলাম প্রেমের প্রভাব,—
সে প্রেম-প্রভাবে, ধরিনু হৃদয়ে,
প্রেমময়ী জনকনন্দিনী,
বিজ্ঞান-সঙ্গিনী মম ।

- প্রেমে পিতৃসত্য-হেতু গমন গহনে,—
হারাইনু জানকীরে,
রে নিন্দুক, তবু না নিন্দিনু বিধি ।
সহেছ কি কভু,
রাজ্য ত্যজি' সীতাহারা শোক ?
প্রেমের সন্ধ্যাসী, প্রেমে কপিসেনা সাথী,
প্রেমে শিলা ভাসে জলে, ম'লে প্রাণ মেলে,
প্রেমে দশানন-জয়ী খ্যাতি,
প্রেমের শাসনে রামরাজ্য অবোধ্যায়,
প্রেম-হেতু সীতা ত্যজি—
লজ্জি' অলঙ্ঘ্য সাগর,
দুষ্কর সমর করিলাম যা'র লাগি' ।
রাম-রাজ্য আদর্শ জগতে ত্যাগ-গুণে ।
জানকী-বিরহ,—
পাষাণ বিদরে তাপে,—
আছি স্থির প্রেমের আশ্রয়ে ।
ভবার্ণ বে প্রেম ভেলা,—
পাবে দুঃখ এ শিক্ষা ভুলিলে ।
পুনঃ হের সত্য-পূর্ণ ভার,
লক্ষ্মণ-বর্জন যাচে বিধি-দাতা বিধি ।

[বশিষ্ঠের প্রবেশ]

পুরোহিত, প্রণমি চরণে,
যাচে বিধি লক্ষ্মণ-বর্জন ।

বশিষ্ঠ । বৎস । ধ্যানযোগে আছি অবগত ।

স্বাম । কহ হিতবাণী বিধান-সঙ্গত ।

বশিষ্ঠ । শিবময় হে সম্পদ-দাতা,
কোন্ বিধি অগোচর তব ?
কিন্তু যদি বাড়ি'লে হে মান,
যথাজ্ঞান নিবেদি চরণে,—
সত্যের সন্ধান রাখ লক্ষ্য-বর্জনে ।

স্বাম । হায় মুনিবর ।
বিলাস-বঞ্চিত, বাস গহন মাঝারে,
তপে শীর্ণ কলেবর তব,
কেমনে হে বুঝাব তোমায়
গৃহীর অন্তর-ব্যথা ।
জান না লক্ষ্যে তুমি,
তেঁই এ নিষ্ঠুর বাণী
কহ মোরে, মুনিবর ।
কিশোরে অনুজ মম বাল্য-ক্রীড়া ত্যজি'
নির্ভয়ে চলিল সাথে ।
তাড়কা-তাড়িত বনে
বুড়কে হেরিনু,
অটল-প্রতিজ্ঞা বীর-বালক শরীরে,—
না ছাড়িবে পাশ মন রাক্ষসী-সমরে ।
গঞ্জিলা তাড়কা সিংহনাদে,—
স্বাবর জঙ্গম কাঁপে ;—
যুঝি আমি প্রাণের লক্ষ্য হেতু ।
প্রলয়-ঝলকে উঠিল গঞ্জিয়া বাণ,
পড়িল রাক্ষসী, সুমেরুশিখর যেন,
টলিল ডুবন ভারে ;—
অটল প্রাণের ভাই পাশে ।

রাজ্য-হারা, চলিলাম বনবাসে,
 সত্যায়,—শূন্যময় ধরা,
 পাছে ছায়া-সম ভাই মম ।
 জ্বলনী কাঁদিছে—না চায় ফিরিয়া ভাই
 না সত্তাঘে রূপ্যমানা প্রেয়সীরে,
 ঘন মুখ চায়, আঁধি ভেসে যায়,—
 ভয়, পাছে নাহি করি সাধী ।
 ধনুধারী প্রহরী আমার,
 অনাহারে অনিদ্রায় বঞ্চিত বিপিনে,
 চতুর্দশ বিজন বংসর ।
 কতু না সুখিনু আমি,
 খাইল কি না খাইল ভাই ;
 তবু শক্তিশেল পাতি' নিজ বুকে ।
 জাগি মহী তলে মহীরাজ-ঘরে,
 পাণে শুয়ে ভাই মম ।
 পাণে ছত্র করে অযোধ্যার সিংহাসনে,—
 জ্ঞানকী-বর্জনে লক্ষ্যণ সারথি রথে ।—
 আহা শক্তিধর ! লইল করক মাথা পাতি',
 ভ্রাতৃপ্রেমে গুণধাম ।
 কোথা পার এ দোসর, কোথা ভাসাইব,
 কেমনে বাঁধিব প্রাণ ?—
 ন্যায়বান্ কে ক'বে আনারে,
 কে আর হইবে জ্যোষ্ঠ-অনুগামী ভবে ?
 বশিষ্ঠ । তব ন্যায়-স্রোত বহে অন্তরে অন্তরে,—
 যেবা তব চরণ সেবিবে,
 তোমারে বুঝিবে,
 কি তার তাহার, প্রভু,
 সত্য-হেতু ত্যজিতে তোমায় ?

ত্রেতাযুগে সত্য লোপ একপদ,
 তবু সত্যশ্রয়ী মানব-সম্পদ
 দেখা'বে বর্জন-গুণে ;
 এ সম্পদে চাহ চির-অনুগত জনে
 বঞ্চিত হে দয়াময় ?
 এ'ক ন্যায় তব ন্যায়বান্ ?
 গৌরব বাড়াতে গতি যা'র তব পদে,
 হে বিপুল-গৌরব ।
 বিপুল গৌরব দান হে অনজে তব ।

-রাম । শূল—শূল—শূল, হে শঙ্কর ।—
 পিনাক ভুবন-ক্ষয় ।
 কোদণ্ডে না হবে, কোদণ্ড নারিবে
 বিধিতে কঠিন প্রাণ ।—
 কহ, নর, নহি ন্যায়বান্ ?—
 বিক্রি প্রাণ তোর তরে ।
 রে লক্ষ্মণ । এ দেহে না পাব তোরে আর ।

বীরের শোক

নবীনচন্দ্র সেন

[চট্টগ্রামের নওয়াপাড়া গ্রামে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন ।
 ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বি.এ. পাশ করিয়া ইনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন । 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য
 লিখিয়া ইনি তদানীন্তন কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হন । ইহার রচনা সত্বন,
 অনাড়ম্বর ও কবিত্বময় । 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য ব্যতীত ইনি 'অবকাশ-রত্নিনী,' 'মঙ্গলমতী,'

‘কুরুক্ষেত্র,’ ‘বৈবতক,’ ‘পুভাস,’ ‘অমিতাভ,’ ‘অমৃতভ,’ ‘শুশু,’ ‘ভানুমতী,’ ‘আমার
জীবন’ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৩এ জানুয়ারী ইংরাজ মৃত্যু
ঘটিল।]

উত্তীর্ণ সমর-ক্ষেত্র। নক্ষত্রের বেগে
চলিতে লাগিল রথ। দেখিলা অদূরে
দুই জনে নিরানন্দ পাণ্ডব-শিবির
আভাহীন, শোভাহীন, বিজয়া-প্রদোষে
যেন শূন্য পূজাগৃহ নিরানন্দময়।
আকুল হৃদয়ে পার্থ কহিলা,—“কেশব।
বাঞ্ছে না মঙ্গলতুরী, দুন্দুভি, পটহ;
নীরব রজ্জ্ব বীণা। নাশি’ সংশপ্তকে
আসিতেছি,—কই, নাহি গায় বন্দিগণ
অগ্রগরি’ স্তুতিপূর্ণ মঙ্গল-সঙ্গীত।
পুরনারীগণ নাহি গবাক্ষ-দুয়ারে
দাঁড়াইয়া শিবিরের দেয় ছলুধ্বনি,
করে পুষ্প বরিষণ। কই, পুত্রগণ
কই, অভিমন্যু কই আসে না ছুটিয়া,
প্রীতি-পূর্ণ মুখে করি’ প্রীতি-সম্ভাষণ।
নারায়ণ।”—অর্জুনের ভিজিল নয়ন,—
“পাণ্ডব-শিবির দেখ শূন্য নিরঞ্জন।”

চক্রব্যাহ মহাক্ষেত্র দেখিলা বিস্ময়ে
শোভিছে অদূরে মহাদর্গের মতন,
শবের প্রাচীরে উচ্চ। জন-শ্রোত বেগে
ছুটিয়াছে এক শ্রোতে সেই দুর্গ-পানে;—
ছুটিল বিদ্যাংবেগে রথ সেই দিকে।
কহিলা কেশব,—“পার্থ। চক্রব্যাহ করি’
আজি যুদ্ধিলেন দ্রোণ, সেই চক্রব্যাহ
হইয়াছে শব-ব্যাহ দেখ কি ভীষণ।

স্তরে স্তরে পড়ি শব—অশু, গজ, নর—
 রথের উপরে রথ, শব তদুপর,
 দুর্ভেদ্য প্রাচীর-মত শোভিছে কেমন ।
 কোন্ বীরমণি আজি জগত-বিস্ময়
 এ অক্ষয় কীৰ্ত্তিমালা পরিল গলায় ।
 দেখিয়াছি বহু দৃক, করিয়াছি রণ
 আজীবন, এ বীরত্ব দেখিনি কখন ।"—
 আর চলিল না রথ ; পড়িলা ভূতলে
 লক্ষ দিয়া দুই জন ; করিয়া লজ্জন
 উদ্ধ শ্বাসে সে প্রাচীর, ছুটিলা সত্রাসে,—
 হাহারবে সৈন্যগণ উঠিল কাঁদিয়া ।

দেখিলেন কুরুক্ষেত্র শোকের সাগর ।
 শব-চক্র মহাবেলা ; প্রশস্ত প্রাঙ্গণ
 ব্যাপিয়া পাণ্ডব-সৈন্য, উন্মির মতন
 উদ্বেলিত মহাশোকে, কাঁদে অধোমুখে,—
 গুণহীন ধনু, পৃষ্ঠে শরহীন তুণ ।
 রথি-মহারথিগণ বসিয়া ভূতলে
 কাঁদিতেছে অধোমুখে, যেন আভাহীন
 সিন্ধু রত্নরাজি পড়ি' রত্নাকর-তলে ।
 বাণ-বিদ্ধ-মীন-মত পাণ্ডব সকল
 করিতেছে গড়াগড়ি পড়িয়া ভূতলে
 মুচিহ্নত বিরাটপতি—সুস্তিত প্রাঙ্গণ—
 কেন্দ্র-স্থলে অভিমন্যু শরের শয্যায়,—
 সিদ্ধকাম মহাশিশু ক্ষত-কলেবর,
 রক্তজবা-সমাবৃত, সঙ্গিত বদন
 মায়ের পবিত্র অঙ্কে করিয়া স্থাপিত,
 —সন্ধ্যাকাশে যেন স্থির নক্ষত্র উজ্জ্বল—
 নিদ্রা যাইতেছে সুখে । বক্ষে সুলোচনা

মুচ্ছিতা ; মুচ্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা,
 সহকার-সহ-ছিন্ন ব্রততীর মত ।
 কেবল দুইটি নেত্র শুক, বিস্ফারিত,
 এই মহা শোকক্ষেত্রে ; কেবল অচল
 এই মহা শোকক্ষেত্রে একটী হৃদয় ;--
 সেই নেত্র, সেই বুক, মাতা স্নতদ্বার ।
 চাপি' মৃত-পুত্র-মুখ মাগের হৃদয়ে
 দুই করে, বিস্ফারিত নেত্রে প্রীতিময়,
 যোগস্থা জননী চাহি' আকাশের পানে,--
 আদর্শ বীরত্ব বক্ষে, প্রীতির প্রতিমা ।--
 নীরব বিস্তৃত ক্ষেত্র । থাকিয়া থাকিয়া
 কেবল কাঁপিয়া ধীরে মাগের অধর
 গাইতেছে কৃষ্ণ-নাম । মুচ্ছিত অর্জুন
 পড়িতে, ধরিল। কৃষ্ণ বাহু প্রসারিয়া ।
 উচ্ছ্বাসে কহিল। কৃষ্ণ,--“ অর্জুন । অর্জুন ।
 আমরা বীরের জাতি, বীর-ধর্ম রণ ।
 অযোগ্য এ শোক তব । এই বীরক্ষেত্র
 করিও না কলঙ্কিত করিয়া বর্ষণ
 এক বিন্দু শোক-অশ্রু । বীরধর্ম তুমি,
 বীর-শোক অশ্রু নহে, অসির ঝঙ্কার ।”

বর্ষা

রাজকৃষ্ণ রায়

[১২৫৬ সালে (১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে) রাজকৃষ্ণ রায় জন্মগ্রহণ করেন । ইনি পঁচাত্তর
 গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন । ইহার কৃত সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের সুললিত পদ্যানুবাদ এবং
 'ভারতকোষ' নামে পৌরাণিক অভিধান ইহার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক । শুণ্ড 'অবসর

‘মরোজিনী’ পুঁতি কবিতা-গ্রন্থ নহে, নাট্য-গ্রন্থও ইহার অনেক আছে। ‘বানন-ভিকা,’ ‘পুল্লাদ-চরিত্র,’ ‘নরমেধ-যজ্ঞ,’ ‘লৌহ-কারাগার,’ ‘বনবীর,’ ‘অনলে বিজলী,’ ‘লয়লা-বজনু,’ ‘বেন্জীর বদ্রেমুনীর,’ ‘চতুরালী’ পুঁতি নাট্য-গ্রন্থ এবং ‘হিরণ্যায়ী,’ ‘কিরণ্যায়ী,’ ‘অদ্ভুত ডাকাত’ পুঁতি উপন্যাস লিখিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছিলেন। হাস্য-রসাত্মক রচনায়ও ইনি স্ননিপুণ ছিলেন। পারস্য ভাষায় ইহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৩০০ সালে (১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) ইহার মৃত্যু হয়।]

অনন্তর রামচন্দ্র করি’ সম্বোধন
কহিলেন লক্ষ্মণেরে,—“অনুজ লক্ষ্মণ !
বর্ষাকাল উপস্থিত এই ত এক্ষণে ;
বসুধা নূতন হৈল বর্ষা-পরশনে :

“পর্বতপ্রমাণ মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ ;
শীতল হ’য়েছে জলে গ্রীষ্মের বাতাস ।
মৃদুমন্দ হইয়াছে বায়ু অতিশয়,
কপূর-দলের মত শীতলতাময় ।

“অর্জুন কেতকী ফুল ফুটেছে ভূধরে ।
অভিষিক্ত হইতেছে বৃষ্টিবারিধারে ।
পর্বতের মেঘরূপ অসিত অজিন,
ধারারূপ যজ্ঞসূত্র অতি সমীচীন ;

“গুহারূপ মুখখান হ’তেছে ধ্বনিত,
পাঠশীল বিপ্র-সম হয় অনুমিত ।
বিদ্যুৎ-কনক-কশা প্রহারে গগন
অশ্রু-সম মেঘরবে করি’ছে গর্জন ।

“ওই দেখ, কুটজ-কুসুম গিরিচূড়ে
বিকশিত হ’য়ে আছে, পরিমল উড়ে ।
পৃথিবীর উন্মায় আবৃত যেন হ’য়ে,
কুটজ-কুসুম তুট বর্ষা পরশিয়ে ।

“কোথাও নাহিক ধূলি ; সমীর শীতল ;
 গ্রীষ্মের উত্তাপ-দোষ নহেক প্রবল ।
 সমর-যাত্রায় ক্ষান্ত এবে রাজগণ ;
 প্রবাসীরা নিজ দেশে করি'ছে গমন । *

“এক্ষণে মানস-সরোবর-বাস-তরে
 চক্রবাক চলিয়াছে প্রিয়া সঙ্গে ক'রে ।
 এক্ষণে কর্দ্দমে পণ হইয়াছে পথ,
 এই সে কারণে নাহি চলে যান-রথ ।

“কোথাও আকাশ বেশ, কোথা মেঘাবৃত,
 শৈল-বন্ধ-সিন্ধু-সম হয় অনুমিত ।
 গিরি-নদী ধরবেগ এবে অতিশয়,
 প্রবাহে ভাসি'ছে সর্জ কদম্ব-নিচয় ।

“ধাতুযোগে রক্তবর্ণ হইয়াছে জল,
 কেকারব করিতেছে ময়ূর সকল ।
 ভূঙ্গ-সম অম্বুফল ওই রসান্বিত,
 বায়ুবেগে আগ্র ভূমে হ'তেছে পতিত ।

“বিদ্যুৎ-স্বরূপ ধ্বজা, বকশ্রেণী-হার,
 ধরি' শোভে মেঘ ওই গিরিগৃহাকার ।
 রণস্থির-করি-সম গরজে গভীর,
 ঝর ঝর করি' তাহে ঝরিতেছে নীর ।

* “যে সকল নদীতে অন্যান্য ঋতু-ভোগ-কালে নৌচালনোপযোগী জল থাকে না, এক্ষণে
 বর্ষার অনুগ্রহে তৎসমুদয়ে যথেষ্ট জল ; সুতরাং প্রবাসিগণের স্বদেশে যাইবার বিশেষ সুবিধা
 ঘটে ।”—রাজকুমার রায়ের টিপ্পনী ।

“ময়ূরীর সনে স্নেহে নাচি’ছে ময়ূর ;
চাতক চাতকী সনে ডাকি’ছে মধুর ।
জলভারে পূর্ণ হ’য়ে জলধরগণ
গিরির অত্যাচচ চুড়ে ঠেকি’ ঘন ঘন
চলিয়া যেতেছে করি’ গভীর গর্জন ।

“বক-শ্রেণী ঘন-মেঘে আসক্তি-আবেশে
সানন্দে উড্ডীন হ’য়ে বিশাল আকাশে,
পবন-চালিত পদ্মমালার মতন
শোভা পাইতেছে কিবা, দেখ, রে লক্ষ্মণ ।”

শেষ

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

[১২৬৬ সালে (১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে) নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন । শিশু-পাঠ্য
সাহিত্য-রচনায় ইনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন ; ইহার ‘শিশু-রঞ্জন রামায়ণ,’
‘ছবির ছড়া,’ ‘ছেলে-খেলা,’ ‘রং-চং’ প্রভৃতি পুস্তক এই কথার প্রমাণ । বক্তিমচন্দ্র ইহাকে
অত্যন্ত স্নেহ করিতেন ; তাঁহার ‘প্রচার’ পত্রে নবকৃষ্ণের রচনা নিম্নমিতরূপে প্রকাশিত হইত ।
১৩৪৬ সালে ইহার মৃত্যু হয় ।]

গোকূলে মূ ফুরায়ে গেল, আঁধার আজি কুণ্ডবন,
(আর) গাহে না পাখী, ফুটে না কলি, নাহিক অলি গুণ্ডরণ ।
দুলাতে মৃদু লতিকা বনে, খেলিতে নব-কলিকা সনে,
মধুরতর নাহি সে আর সমীর-ধীর-সঞ্চরণ ।
কাননে ঢালি’ জোছনারাশি ভাসে না চাঁদ গোকূলে আসি’,
নাহি সে হাসি প্রমোদ-রাশি, নাহি সে সুখ-সঙ্গিলন ।
জলদে শশী-মাধুরী ঢাকা, বিষাদ যেন সকলে মাখা,
শ্রীহীন তরু, শ্রীহীন লতা, শ্রীহীন চারু পুষ্পবন ।

অমিয় স্বর-লহরে মাখি' স্তব্ধ করি' পশু-পাখী,
 মধুরভাষী আর সে বাঁশী গাহে না গীত সম্মোহন।
 যমুনা-পানে চাহিলে ফিরে, কপোল ভাসে নয়ন-নীরে,
 পরাণে শুধু উছলি' উঠে সুনীল জলে সম্ভরণ।
 নিবিড় বনে তমান-ছায়, কোকিল-বধু গীত না গায়,
 সারিকা-স্তব্ধ বিরস-মুখ বিগত প্রেম-সম্ভাষণ।
 অধীর ব্রজ-বালকদল, না খায় ধেনু তৃণ কি জন,
 গজল আঁখি উরধ-মুখে করিছে কি যে অনুরোধ।
 প্রেমিক কে সে মধুরভাষী বধিয়ে গেল গোকুলবাসী
 ব্রজে কি আর বাঁশরী তার গা'বে না গীত সম্ভাবন?
 অধীর প্রাণে বিষম ক্রেশ, কেমনে করি এ দুঃখ শেষ—
 বিনে শ্রীহরি কেমনে করি নয়ন-বারি সংবরণ।

ধৈর্য্য ধর

গোবিন্দচন্দ্র দাস

[গোবিন্দচন্দ্র দাস ঢাকা জেলার ডাওয়ালের অন্তর্গত জয়দেবপুর গ্রামে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে
 অনুগ্রহণ করেন। ইহার জীবন দারুণ দারিদ্র্য, অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করিয়া অতিবাহিত
 হয়। ইনি অধিক লেখাপড়া লিখিবার সুযোগ পান নাই। ইনি অত্যন্ত স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন।
 ইহার রচনার মধ্যে একটি নিতীক আত্মপ্রকাশ ছিল—ইনি যাহা ভাবিতেন, তাহা লিখিতে বিধা-
 বোধ করিতেন না। 'প্রেম ও ফুল,' 'কুতূহল,' 'অগুরু,' 'কস্তুরী,' 'চন্দন,' 'ফুলেরণু,'
 'বৈজয়ন্তী' প্রভৃতি কবিতাপুস্তক প্রকাশ করিয়া ইনি অশেষ যশ অর্জন করেন।]

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
 শত দিকে শত দুঃখ আসুক—আসুক
 এ সংসার কর্মশালা,
 জলন্ত কালান্ত-আলা,
 কলঙ্ক দহিতে হবে থাকে যতটুক।

অযুত আঘাতে নিত্য
গড়িতে হইবে চিত্র,
যুদ্ধ-জয়েচতুক ;
দিতে হবে বজ্র-শাপ,
উজ্জ্বল করিতে প্রাণ,

তবে সে উজ্জ্বল হবে মুখ ।

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
অনন্ত বিপদ দাও—আনিবে, আসুক !
করু করি বাহ-পথ,
থাক শত জয়দ্রথ,

অমরের প্রিয় সে যে সনর-কৌতুক ;
সে অনন্ত কুরু-গৈনা,
ভীকর দৌর্ব্বল্য-দৈনা,
ডরে না জমুক !

সাগর-তরঙ্গ ঠেলি',
তিমিঙ্গিল করে কেনি,
কূপে কাঁপে কূপের মণ্ডুক ।

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
শিরোপরি শত বজ্র গজিবে—গর্জুক !

রহ হিমাদ্রির মত,
হইও না অবনত,
পতঙ্গের পদাঘাতে তৃণ অধোমুখ ।

হ'লে হও খণ্ড খণ্ড,
স্রষ্ট করি' লও ভণ্ড
ব্রহ্মাও কাঁপুক ।

গভীর গৌরব-ভরা,
মহাদস্তে ভেঙ্গে পড়া—

কি আনন্দ ! কি প্রচণ্ড সুখ ।

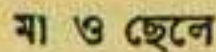
ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
 অনন্ত মরণ যদি আসিবে—আশুক ।
 স্থাপ' তুমি জয়স্তম্ভ,
 কর' আশ্র-অবলম্ব,
 দাও অস্ত্র মেদ মজ্জা, লাগে যতটুক ।
 শত সূর্য্য করি' গুঁড়া,
 গড়' সে উজ্জ্বল চুড়া—
 দেবতা দেখুক ।
 বাধা-বিশ্ব ঠেলি' পদে,
 সিংহ ফিরে বীরমদে,
 আশ্রগুপ্ত সভয়ে শঙ্কুক ।

মা ও ছেলে

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

[১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই আগষ্ট ইহার জন্ম এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই আগষ্ট ইহার মৃত্যু হয় । ইনি কলিকাতা বহুবাজারের সুপ্রসিদ্ধ অক্ষুর দত্তের বংশীয় নরেশচন্দ্র দত্তের পত্নী ছিলেন । ইনি বহু কবিতা লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন । ইহার 'অশ্রুকাণা,' 'ভারত-কুসুম,' 'শিখা,' 'অর্ধ্য,' 'সিঁদু-গাথা,' 'আভাষ,' 'সন্ন্যাসিনী,' 'কবিতাহার' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বাঙ্গালার মহিলা-কবিদিগের মধ্যে ইনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন ।]

ফুটফুটে জ্যোছনায় ধব্ধবে আঙ্গিনায়
 একখানি মাদুর পাতিয়ে,
 ছেনোট গুয়ায়ে কাছে ছননী শুইয়া আছে
 গৃহকাজে অবসর পেয়ে' ।



পূজারিণী

(অবদানশতক)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নৃপতি বিদ্বিসার ।
 নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইয়া
 পাদ-নখ-কণা তাঁর,
 স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদ-কাননে,
 তাহারি উপরে রচিলা যতনে
 অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ—
 শিল্প-শোভার সার ।

সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি'
 রাজবধু রাজবালা
 আগিতেন ফুল সাজায়ে ডালায়,
 স্তূপ-পদমূলে সোনার খালায়
 আপনার হাতে দিতেন জালায়ে
 কনক প্রদীপমালা ।

অজ্ঞাতশত্রু রাজ্য হ'ল যবে
 পিতার আসনে আসি',
 পিতার ধর্ম শোণিতের ঘোতে
 মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হ'তে,
 মঁপিল যন্ত্র-অনল-আলোতে
 বৌদ্ধ-শাস্ত্ররাশি ।

কহিলা ডাকিয়া অজ্ঞাতশত্রু
 রাজপুরনারী সবে,—
 “বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
 কিছু নাই ভবে পূজা করিবার,—
 এই ক’টি কথা জেনো মনে সার—
 ভুলিলে বিপদ হবে।”

সে দিন শারদ দিবা-অবসান,—
 শ্রীমতী নামে সে দাসী
 পুণ্য-শীতল সলিলে নাহিয়া,
 পদ্ম-প্রদীপ থালায় বাহিয়া,
 রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া
 নীরবে দাঁড়াল আসি’।

শিহরি’ সভয়ে মহিষী কহিলা,—
 “এ কথা নাহি কি মনে,
 অজ্ঞাতশত্রু করেছে রটনা—
 স্তুপে যে করিবে অর্ঘ্য-রচনা
 শূলের উপরে মরিবে সে জনা
 অথবা নির্বাসনে।”

সেথা হ’তে ফিরি’ গেল চলি’ ধীরি
 বৃন্দ অমিতার ঘরে।
 সমুখে রাখিয়া স্বর্ণ-মুকর
 বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,
 আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদর
 সিঁথির সীমার ’পরে।

শ্রীমতীরে হেরি' বাঁকি' গেল রেখা,
 কাঁপি' গেল তার হাত,—
 কহিল,—“অবোধ, কি সাহস-বলে
 এনেছিস পূজা, এখনি যা চলে’,
 কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তা হ’লে
 বিষম বিপৎপাত।”

অস্ত-রবির রশ্মি-আভায়
 খোলা জানালার ধারে
 কুমারী শুক্ল বসি' একাকিনী,
 পড়িতে নিরত কাব্য-কাহিনী,
 চমকি' উঠিল শুনি' কিক্কিনী,
 চাহিয়া দেখিল দ্বারে।

শ্রীমতীরে হেরি' পুঁথি রাখি' ভুমে
 দ্রুতপদে গেল কাছে।
 কহে সাবধানে তার কানে কানে,—
 “রাজার আদেশ আজি কে না জানে,
 এমনি ক’রে কি মরণের পানে
 ছুটিয়া চলিতে আছে?”

দ্বার হ’তে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী
 লইয়া অর্ঘ্য-খালি।
 “হে পুরবাসিনী।”—সবে ডাকি কয়,—
 “হয়েছে প্রভুর পূজার সময়।”—
 শুনি' ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়,
 কেহ দেয় তাতে গালি।

দিবসের শেষ আলোক মিলা'ল
নগর-সৌধ 'পরে ।
পথ জনহীন আঁধারে বিলীন,
কলকোলাহল হ'য়ে এল ক্ষীণ,
আরতিঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন
রাজ-দেবালয় ঘরে ।

শারদ নিশির স্বচ্ছ তিমিরে
অগণ্য তারা জলে ।
সিংহদুয়ারে বাজিল বিঘাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
“মন্ত্রণাসভা হ'ল সমাধান ”
—হারী ফুকরিয়া বলে ।

এমন সময়ে হেরিলা চমকি'
প্রাসাদে প্রহরী যত—
রাজার বিজন কানন-মাঝারে
স্তূপ পদমূলে গহন আঁধারে
অলিতেছে কেন, যেন গারে গারে
প্রদীপমালার যত ।

মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক
তখনি ছুটিয়া আসি'
শুধা'ল,—“কে তই ওরে দুর্গতি,
মরিবার তরে করিস্ আরতি ?”
মধুরকণ্ঠে শুনিল,—“শ্রীমতী,
আমি বুকের দাসী ।”

সেদিন শুভ্র পাষণ-ফলকে

পড়িল রক্ত-লিখা ।

সে দিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে

প্রাসাদ-কাননে নীরবে নিভূতে

স্তূপ-পদমূলে নিবিল চকিতে

শেষ-আরতির শিখা ।

দুর্ভাগা দেশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যা'দের করেছ অপমান

অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান ।

মানুষের অধিকারে

বঞ্চিত করেছ যা'রে

সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,

অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান ।

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে,

ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে ।

বিধাতার রুদ্ধরোমে

দুভিক্ষের দ্বারে ব'সে

ভাগ ক'রে খেতে হবে সকলের সাথে অনুপান ।

অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান ।

তোমার আসন হ'তে যেথায় তা'দের দিলে ঠেলে,

সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে ।

চরণে দলিত হ'য়ে

ধূলায় সে যায় ব'য়ে,

সেই নিম্নে নেমে এস, নহিলে নাহি রে পরিত্রাণ ।

অপমানে হ'তে হবে আজি তোরে সবার সমান ।

যা'রে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে ।
পশ্চাতে রেখেছ যা'রে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে ।

অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকছ যা'রে,
তোমার মঙ্গল চাকি' গড়িছে সে ধোর ব্যবধান ।
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান ।
শতেক শতাব্দী ধ'রে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার ।

তবু নত করি' আঁখি, দেখিবারে পাও না কি—
নেমেছে ধুলার তলে হীন পতিতের ভগবান ?
অপমানে হ'তে হবে সেথা তোরে সবার সমান ।
দেখিতে পাও না তমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি' দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে ।
সবারে না যদি ডাক, এখনো সরিয়া থাক,
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিত্তভঙ্গো সবার সমান ।

ভারত-তীর্থ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে আগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে ।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে ।

ধ্যান-গম্ভীর এই যে ভূধর,
নদী-জপমালা-ধৃত প্রাস্তর,
হেথায় নিত্য হের পবিত্র ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে ।

কেহ নাহি জানে—কা'র আস্থানে কত মানুষের ধারা
দরবার শ্রোতে এলো কোথা হ'তে, সমুদ্রে হ'ল হারা ।
হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য, হেথায় দ্রাবিড়, চীন,
শক, হুন-দল, পাঠান, মোগল—এক দেহে হ'ল লীন ।
পশ্চিম-আজি ঝুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, নিলাবে নিলিবে, যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে ।

রণধারা বাহি' জয়গান গাহি' উন্মাদ কলরবে—
ভেদি' মরুপথ গিরি-পর্বত যা'রা এসেছিল সবে,
তা'রা নোর মাঝে সবাই বিরাজে,—কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তা'র বিচিত্র সুর ।
হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো,
ধ্বনি করি' দূরে আছে যা'রা আজো,
নাশিবে, তা'রাও আসিবে, দাঁড়াবে ধিরে,—
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে ।

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওঙ্কারধ্বনি
হৃদয়তপ্তে একের মগ্নে উঠেছিল রণরপি' ।
তপস্যা-বলে একের অনলে বহরে আহতি দিয়া
বিভেদ তুলিল, জাগায়ে তুলিল একাট্টি বিরাট্টি হিয়া ।
সেই সাধনার—সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খেলো আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত গিরে,—
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে ।

সেই হোমানলে হের আজি অলে দুখের রক্তশিখা,
হবে তা' সহিতে, মর্মে দহিতে,—আছে সে ভাগ্যে লিখা ।
এ দুখ বহন করো মোর মন, শোনো রে একের ডাক ।
যত লাজ ভয় করো করো জয়, অপমান দূরে যাক্ ।

দুঃসহ ব্যথা হ'য়ে অবসান,
অন্য লভিবে কি বিশাল প্রাণ ।
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে,
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে ।

এসো হে আৰ্য্য, এসো অনাৰ্য্য, হিন্দু, মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রীষ্টান,
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন ধরো হাত সবাকার ;
এস হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার ।
মা'র অভিষেকে এসো এসো স্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থ-নীরে
আজি ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে ।

হিমাচলে

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

[ইনি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন । ইনি প্রবৃত্তিস্ব- ও গবেষণা-
বুলক অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধ বাঙ্গালা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় লিখিয়া যশ অর্জন করিয়াছিলেন ।
ইনি ওড়িয়া ভাষাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন । ' ভারতী,' ' প্রবাসী ' পুত্রুতি উচ্চাঙ্গের পত্রিকাসমূহে
ইহার অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে । ইনি কলিকাতা বিশুবিদ্যালয়ে
অধ্যাপক ছিলেন । বধ্যপ্রদেশের সম্বলপুরে ওকালতী ব্যবসায় করিয়া ইনি প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ

করিয়াছিলেন, কিন্তু চক্ষু-হারা হইয়া ইহাকে ওকালতী ছাড়িয়া দিতে হয়। অল্প অবসাতেও ইনি অবিশ্রাস্তরূপে সাহিত্যের সেবা করিতেন। 'জীবন-বাণী,' 'কালিদাস,' 'ধেরীগাথা,' 'হৈয়ালি,' 'ছিটে-ফোটা,' 'যজ্ঞভঙ্গ্য,' 'খেলাধুলা,' 'কচিরা,' 'Elements of Social Anthropology,' 'Aborigines of Central India,' 'Orissa in the Making,' 'History of the Bengali Language' প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার রচিত। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে ডিসেম্বর ইহার ত্যজ্য হয়।]

অলে শৈলে সূর্য্য-কিরণ-বিস্ব--
 দলিত ছিন্ন কুজ্জ্বাট
 যেন তবারে ধবলগিরির শৃঙ্গ--
 ধেয়ান-মগ্ন ধূর্জটি।
 ঐ সানুর সোপান-মালার উর্দ্ধে
 শৃঙ্গ-চরণ-রঞ্জিকা,
 শোভে অত্র-সুঘমা, যেন রে শুদ্ধা
 গৌরকান্তি অম্বিকা।
 তথা অর্ক-ধূসর ভূধর-খণ্ড
 দাঁড়ারে প্রান্তে গৌরবে,--
 যেন নন্দীর মত রুদ্ধপ্রহরী
 দলিছে চরণে রৌরবে ;
 সেথা স্তব্ধ চপল বাসনা মানসে,
 হত লালসার উগ্রতা,
 রাজে মোন মুক্ত শঙ্কর-পদে
 তাপসীর চারু শুভ্রতা।

মা

রজনীকান্ত সেন

[পাবনা জেলার ভাঙ্গাবাড়ী গায়ে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রজনীকান্ত সেনের জন্ম হয়। বঙ্গদেশে কবিতা এবং গান রচনা করিয়া বাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, রজনীকান্ত তাঁহাদের অন্যতম। ইনি

রাজসাহীতে ওকালতী করিতেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার রচিত 'বাণী' ও 'কল্যাণী' এই দুইখানি গানের বই বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে।]

স্নেহ-বিহ্বল, করুণা-ছলছল,
শিয়রে জাগে কা'র আঁখি রে।

মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী-সুধা
এনেছে, অশরণ লাগি' রে।

শ্রান্ত অবিরত যামিনী জাগরণে,
অবশ ক'শ তনু মলিন অনশনে,
আত্মহারা, সদা বিমুখী নিজ সুখে,
তপ্ত তনু মম করুণা-ভরা বুকে
টানিয়া লয় তুলি', যাতনা-তাপ তুলি',
বদন-পানে চেয়ে থাকি রে।

করুণে বরষিছে মধুর সাধনা,
শান্ত করি' মম গভীর যন্ত্রণা ;
স্নেহ-অঞ্চলে মুছায়ে আঁখিজল
ব্যথিত মস্তক চুষে অবিরল,
চরণ-ধূলি সাথে, আশীষ রাখে মাথে,
সুপ্ত হৃদি উঠে জাগি' রে।

আপনি মঙ্গলা, মাতৃরূপে আসি',
শিয়রে দিল দেখা পুণ্য-স্নেহ-রাশি,
বক্ষে ধরি' চির-পীযুষ-নিঝ'র,
নিরাশ্রয়-শিশু-অসীম-নির্ভর।
নমো নমো নমঃ, জননি দেবি মম।
অচলা মতি পদে মাগি রে।

জীবন-সোপান

অক্ষয়কুমার বড়াল

কলিকাতা চোরবাগানে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার বড়ালের জন্ম হয়। ইহাদের আদি নিবাস ফরাসভাঙ্গা। 'প্ৰদীপ,' 'কনকাজলি,' 'ভুল' 'এষা,' 'শখ,' প্ৰভৃতি কয়েকখানি কবিতাগ্ৰন্থ প্ৰণয়ন করিয়া ইনি প্ৰতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

গৃহচূড়ে নর যথা সোপান বাহিয়া

উঠে ধীরে ধীরে,

এ জগতে নিরন্তর

বাহি' শোকদুঃখ-স্তর

উঠে কি মানব-আশা তোমার মন্দিরে ?

পদে পদে পরাজয়, অতি অসহায়,

অদৃষ্ট নির্গম।

এই অশ্রু, এই শ্বাস

করে কি জড়তা নাশ ?

দেয় কি নবীন আশ, নবীন উদ্যম ?

এই দর্প, অহঙ্কার, কু-চক্র, কু-আশা—

এ কি আরাধনা ?

এই কাম, এই ক্রোধ

দিতেছে কি আশ্রবোধ ?

লোভে ক্ষোভে হ'তেছে কি তোমার ধারণা ?

জগৎ-ভিতর দিয়া জগতের জীব

বুঝে কি তোমায় ?

এই পড়ে, এই উঠে,

এই হাহাকারে ছুটে,

পাপে অনুতাপে লভে দেব-মহিমায় ?

প্ৰবীণ জনক যথা শিশু-ক্রীড়া হেরি'

হাসিয়া আকুল,—

অমনি কি দেহ-শেষে

আমিও উঠিব হেসে,

গুন্নি' নর-জনমের সুখ-দুঃখ-ভুল ?

জগতের পাপতাপ জগতেই শেষ ?

কহ দয়ানয় ।

উঠিয়া পর্বতচূড়

ধরণীতে হেরি' দূরে—

পথের ত দুঃখ-ক্লেশ স্নান মনে হয় ।

আশার স্বপন

কামিনী রায়

[' আনো ও ছায়া ' লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যে কামিনী রায় পভূত যশ অর্জন করিয়াছিলেন । ইনি বিখ্যাত সাহিত্যিক চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা এবং গিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের পত্নী । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইহাকে " জগদ্ধারিণী স্বর্ণ-পদক " পুরস্কার দিয়া ইহার কবি-প্রতিভাকে সম্মানিত করেন । ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক-গমন করেন ।]

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
শুনে যা আমার আশার কথা,
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে
প্রাণের তবুও ঘুচেছে ব্যথা ।

এই নিবিড় নীরব আঁধারের তলে,
ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে,
কি জানি কখন কি মোহন বলে,
ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িণু তথা ।
আমি শুনিণু জাহ্নবী যমুনার তীরে
পণ্য দেবস্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
কৃষ্ণা-গোদাবরী-নর্মদা-কাবেরী-
পঞ্চনদকূলে একই প্রথা ।

আর দেখিনু যতেক ভারত-সন্তান,
 একতায় বলী, জ্ঞানে গরীয়ান্,
 আগিছে যেন গো তেজো মূর্তিমান্,
 অতীত স্মদিনে আগিত যথা ।
 ঘরে ভারত-রমণী সাজাইছে ডালি,
 বীরশিশুকুল দেয় করতালি,
 মিলি' যত বালা গা'থি' জয়মালা,
 গাহিছে উল্লাসে বিজয়-গাথা ।

সাধক

মানকুমারী বসু

[যে সকল মহিলা-কবি কবি-পুতিভায় আপনাদিগকে বাদলা গাহিত্যক্ষেত্রে সুপুতিষ্ঠিত
 করিয়াছেন, মানকুমারী বসু তাঁহাদের অন্যতম । ইনি মাইকেল মধুসূদনের বাতুপুত্রী (ষোষ্ঠ-
 তাভের পৌত্রী) । ইহার বাড়ী যশোহর সাগরদাঁড়ি গ্রামে । ১২৭১ সালে ১৩ই মাঘ
 (জানুয়ারি, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) ইহার জন্ম, এবং ১৩৫০ সালে ৯ই পৌষ (২৫এ ডিসেম্বর,
 ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) ইহার মৃত্যু হয় । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইহাকে “ জগত্তারিণী স্বর্ণ-
 পদক ” এবং “ ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণ-পদক ” পরস্কার দিয়া ইহার কবি-পতিভাকে সম্মানিত
 করেন ।]

১

আমি চাই মহতের মহৎ পরাণ,
 মুকুতা-মাণিক্য-নিধি
 আমারে দিও না বিধি ।
 চাহিনে এ জগতের রাজস্ব সম্মান ;
 বাঙ্কিত পরাণ পেলে',
 প্রাণটুকু দিয়া চলে',
 মেগে' নেব মনুষ্যস্ব—শ্রেষ্ঠ উপাদান,
 প্রাণের সাধক আমি, সাধনীয় প্রাণ ।

২

আমি চাই শিশু হেন উলঙ্গ পরাণ,
 মুখে মাখা সরলতা,
 কয় না সাজানো কথা,
 জানে না যোগাতে মন করি' নানা ভাণ ;
 প্রাণ খোলা মন খোলা,
 আপনি আপনা ভোলা,
 তা'র স্নেহ-প্রীতি সব-ই হৃদয়ের টান ।
 আমি চাই স্বরগের উলঙ্গ পরাণ ।

৩

আমি চাই মনোহর সুন্দর পরাণ,
 পবিত্র—উষার রবি,
 কোমল—ফুলের ছবি,
 মধুর—বসন্ত-বায়ু, পাপিয়ার গান ;
 আনন্দে—শারদ ইন্দু,
 গাম্ভীর্যে—অতল সিদ্ধু,
 পণ—বরষার বিল ভরা কানেকান,
 আমি চাই মনোহর সুন্দর পরাণ ।

৪

আমি চাই বীরত্বের তেজস্বী পরাণ,
 পায়ে ঠেলে তোষামোদ,
 নীচতার অনুরোধ,
 তা'র ব্রত—সত্য-রক্ষা, সত্যানুসন্ধান ;
 চাহে না নিজের ইষ্ট,
 অতুল কর্তব্যনিষ্ঠ,
 ধরা প্রতিকূল হ'লে নহে কম্পমান ;

জীবন-সংগ্রামে নিত্য
বিজয়ী তাহার চিত্ত,
অনন্তে উড়িছে তা'র বিজয়-নিশান
আমি চাই বীরত্বের তেজস্বী পরাণ।

৫

আমি চাই বিশ্বোদর উদার পরাণ,
জ্ঞান সত্য নীতি পূজে,
দলাদলি নাহি বুঝে
সে জানে সকলে এক মায়ে-ই সম্মান ;
মরমে মহত্ব পূর্ণ,
হীনতা করেছে চূর্ণ,
হৃদয়ের ভাব সব উদার মহান্ ;
ন্যায় তরে প্রিয়ভাগী,
প্রীতিতে পরানুরাগী,
সমাদরে রাখে জ্ঞানী-গুণীর সম্মান ;
অনুতপ্ত অশ্রুধার
কখন সহে না তা'র,
অনুতাপী পাপী পেনে' পুণ্য করে দান ;
বিশ্বের উন্নতি আশা,
বিশ্বময় ভালবাসা,
বিশ্বের মঙ্গল সাধে করি' আত্মদান ;
মরতে সে দেবোপম,
উপাস্য নমস্য মম,
বসুধা কৃতাৰ্থ তা'রে কোলে দিয়ে স্থান ।
আমি সাধি সাধনা—সে দেবতার প্রাণ ।

কাল বৈশাখী

প্রিয়ংবদা দেবী

[ইনি বিচারপতি শ্যাম আন্ততোষ চৌধুরীর ভগিনী মহিলা-কবি পুণ্যনুময়ী দেবীর কন্যা ।
'বেণু' পত্রীতি কাব্যগুণ লিখিয়া ইনি খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন ।]

নটরাজ । সাজিলে কি তাওব নর্তনে ?
আন্দোলিয়া ক্রমদল, গভীর গর্জনে
বাজাইয়া প্রলয়-পিলাক ঝটিকার ?
ওড়ে ধূলি, ঘোরে পত্র ছিন্ন-লতিকার—
প্রাণপণ আগ্রহের একান্ত বন্ধন ;
জ্বালামুখী বিদ্যুতের অসহ্য দহন,
পাংশু পুণ্ড্রীভূত মেঘে আচ্ছন্ন অম্বর ।
ভয়াব্ব বসুধা-বক্ষে কাঁপিছে ভূধর ।
উঠিতেছে পড়িতেছে উত্তাল স্পন্দনে
সিঙ্কু-বক্ষে লক্ষ উগ্ৰি ব্যাকুল ক্রন্দনে
তোমার চরণ বোটি' ভুজঙ্গের মত
উদ্যত অশ্ব-শাখা জটা-সমুদ্রত ।
জাগিছে দিশান-কোণে রক্ত ভয়ঙ্কর,—
তোমার ললাট-দীপ্তি, ওগো দিগম্বর ।

আমরা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[রবীন্দ্রনাথের পরে কবিতা রচনা করিয়া যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম ।
অভিনব বিবিধ ছন্দে রচিত ইহার কবিতাবলী রসিক-চিস্তকে মুগ্ধ করিয়াছে । ইনি বিখ্যাত
সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র । 'বেণু ও বীণা,' 'কুহ ও কেকা,' 'অন্ন-আবীর,'

‘বেলাশেষের গান,’ ‘হাস্তিকা,’ ‘তীর্থ-সনিল,’ ‘তীর্থ-রেণু’ পুঁজুতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে পুঁজুত যশ অর্জন করিয়া গিয়াছেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।]

মুক্তবেণীর গদ্য যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে,
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই তীথে — বরদ বঙ্গে ;
বাম হাতে যা’র কমলার ফুল, ডাহিনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোল-ভরা যা’র কনক-ধান্য, বুক-ভরা যা’র স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ-ভঙ্গে,—
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই বাঙ্কিত-ভূমি বঙ্গে ।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি ।
আমাদের সেনা যুদ্ধ ক’রেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দশানন-জয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে ।
আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়,
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয় ।
এক হাতে মোরা মগেরে কুখেছি, মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ-প্রতাপের ছকুনে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে ।

জ্ঞানের নিধান আদি বিদ্বান্ কপিল সাংখ্যাকার—
এই বাঙলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার ।
বাঙ্গালী অতীশ লজ্জিল গিরি তুমারে ভয়ঙ্কর,
আলিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙ্গালী দীপঙ্কর ।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষ-শাতন করি’
বাঙ্গালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি’
বাঙলার রবি জয়দেব কবি কান্ত-কোমল পদে
করেছে সুরতি সংস্কৃতির কাঞ্চন-কোকনদে ।

ভালবাসি, কাছে ডাকি, নামও সব জেনে রাখি,
 দেখাশোনা হয় নিতি নিতি,
 শাসন-তর্জন করি, শিখাই প্রহর ধরি',
 থাকেনাক, হায়, কোন স্মৃতি ।

ক' দিনের এই দেখা ? সাগর-সৈকতে রেখা
 নূতন তরঙ্গে মুছে যায় ।
 ছোট ছোট দাগ পা'র ঘুচে' হয় একাকার,
 নব নব পদ-তাড়নায় ।

জানে না কে কোথা যাবে, জোটে হেথা, নাহি ভাবে
 পাঠশালা,—যেন পান্থশালা,
 দু' দিন একত্রে মাতে মেলে মেশে, ব'সে গাঁথে
 নীতি-হার আর কথা-মালা ।

রাজপথে দেখা হ'লে কেহ যদি গুরু ব'লে
 হাত তুলে' করে নমস্কার,
 বলি তবে হাসি-মুখে,— “ বেঁচে থাক, রও স্মুখে
 কি করিছ কাজ-কারবার ? ”

ভাবিতে ভাবিতে যাই— কি নাম ? মনে ত নাই,
 ছাত্র ছিল কতদিন আগে ;
 সেখি স্মৃতি ধরি' টানি', কৈশোরের মুখখানি
 মনে মোর জাগে কি না জাগে ।

ঘন ঘন আনাগোনা কতদিন দেখা-শোনা,
 তবু কেন মনে নাহি থাকে ?
 ' ব্যক্তি ' ডুবে যায় ' দলে ', মালিকা পরিলে গলে-
 প্রতি ফুলে কে বা মনে রাখে ?

এ জীবনে ভেঙে গ'ড়ে শ্যামল সরস ক'রে
ছাত্রধারা ব'হে চ'লে যায়,
ফেনিলতা উচ্ছলতা হ'য়ে যায় তুচ্ছ কথা,
কলরব সকলি মিলায় ।

স্বচ্ছতায় শুধু হেরি আমার জীবন ঘেরি'
জাগে শুধু ম্লান মুখগুলি ;
কনহাস্য মহোৎসব আর ভুলে' যাই সব,
ম্লান মুখ কখনো না ভুলি ।

কেহ বা কুধায় ম্লান, কেহ রোগে গ্রিয়মাণ,
শ্রমে কা'রো চাহনি করুণ,
কেহ বা বেত্রের ডরে বন্দী হ'য়ে রয় ঘরে,
নেত্র কা'রো তন্দ্রায় অরুণ ।

কেহ বা জানালা-পাশে চে'য়ে রয় নীলাকাশে
যেন বন্ধ পিঙ্গরের পাখী,
আকাশে হেরিয়া ষুড়ি মন তার যায় উড়ি',
বিমাদের ছায়াখানি রাখি' ।

স্মুরিয়া খেলার মাঠ কেউ ভুলে হায় পাঠ,
বুদ্ধিতে বা কা'রো না কুলায়,
কেহ স্মারে গেহ-কোণ, স্নেহ-ভরা ভাই বোন,—
ঘড়ি পানে ঘন ঘন চায় ।

ডাকিছে উদার বায়ু ল'য়ে স্বাস্থ্য ল'য়ে আয়ু,
ডাক শোনে ব'সে রুদ্ধ ঘরে,
হাতে মসী মুখে মসী, মেঘে ঢাকা শিশু-শশী—
প্রতিবিম্বে যোর স্মৃতি ভরে ।

২

সমাধির 'পরে তব আজি বৃষ্টিধোত নীলাকাশ
হাসে স্মৃতি হাসি,
প্রভাতের মুক্ত আলো তা'রে ঘেরি' করিছে উচ্ছ্বাস
ঢালি' সুধারাশি ।
শরতের পূর্ণ। রাতে তোমার আকাশ চন্দ্রাতপ
কিরণ-উজ্জ্বল,
উন্মুক্ত অম্বরতলে উঠিতেছে সুগম্ভীর রব—
মানব-মঙ্গল ।

৩

তোমার হৃদয় ভরি' জেগেছিল যে মহাস্বপন,—
এ ভারত-ভূমি
এক ধর্ম, এক রাজ্য, এক জাতি, একনিষ্ঠ মন
বেঁধে দিবে তুমি ।
সমাজ-আচার-ভেদ ধর্ম-ভেদ ভুলে যাবে সবে,
রহিবে স্মরণ—
এক মহাদেশে বাস, চিরদিন একসাথে হবে
জীবন মরণ ।

৪

বিজিত-বিজ্ঞেতা-ভেদ ভুলেছিলে, হে মহৎ-প্রাণ,
হিংসা ভুলেছিলে,
তোমার মহৎ প্রেমে দূর করি' সর্ব্ব অসম্মান
কোলে টেনে নিলে ।
হিন্দু-মোসেমের ঘেঘ, রাজপুত-পাঠান-মোগল-
সংঘাত জিনিয়া,
মহা-ভারতের স্বপ্ন মেলি' স্থির আঁখি অচপল
দেখেছিল হিয়া ।

৫

হে সখাটি, জানে নাই ভয় কভু তোমার হৃদয়,
 নিয়ত সম্মুখে
 সন্দেহ-সংশয়-চিন্তা জয় করি' চলেছে নির্ভয়
 সব সুখে দুখে ।
 বিপদের দিনে বন্ধু দাঁড়াইল সরি' পার্শ্ব হ'তে—
 একান্ত একাকী
 আপন জীবনব্রত সাধিবারে চলিয়াছ পথে
 লক্ষ্য স্থির রাখি' ।

৬

কে এল তোমার সাথে, কে তোমারে ছেড়ে গেল চ'লে
 চাহ নাই ফিরে',
 আপন প্রাণের স্বপ্নে সকল জীবন তব অলে
 বিদারি' তিমিরে ।
 হৃদয়ের রক্ত দিয়া পলে পলে আঁকিয়াছ ছবি
 যে মহা-ভারত,
 আজিও সপ্নমত্রে দেখে শুধু, হে সখাটি-কবি,
 বিগীত জগৎ ।

৭

তোমার মহৎ হিয়া পুনর্ব্বার আশ্রুক ফিরিয়া
 আমাদের মাঝে,
 আশ্রয়-সর্বনাশ আমাদের রেখেছে ঘিরিয়া
 অপমানে লাজে ।
 কল্যাণের পথ মোরা হারাইয়া আঁধারের মাঝে
 ঘুরি দিশাহারা,
 আমাদের দেশ তাই হতাদরে অপমানে লাজে
 আমাদের কারা ।

৮

হে মহৎ, তব বাণী নিখিল ভারত ভরি' আজি

জাগ্রক আবার,

উঠুক মিলনমগ্ন সাম্যবাদে কষুকঠে বাজি'

টুটিয়া আঁধার।

হিংসা-ব্ধে মন্ত্রশাস্ত ভুজঙ্গের মত শঙ্কাভরে

হোক শাস্ত হোক,

আঁধারের প্রাণী যত ফিরে যাক আঁধার বিবরে,

নামুক আলোক।
